শরণাগতি

স্বামী সোমানন্দ

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
[redacted] ১৩৬৪ সন

প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদপট
শ্রীগণেশ বসু
হাওড়া-৪

ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯

মুদ্রক
আর. বি. মণ্ডল
ডি. বি. প্রিন্টার্স
৪ কৈলাস মুখার্জী লেন
কলকাতা-৬।

পরম পূজনীয়

শ্রীমৎ স্বামী জ্যোতিঃস্বরূপানন্দ মহারাজকে

শ্রদ্ধার্ঘ্য

ভূমিকা

॥ এক ॥

'শরণাগতি' বাসনাক্ষয় ও নির্বাসনারূপ মুক্তির সাধনা। কামনা ও বাসনাই সংসার ও সংসারবন্ধনের কারণ। জন্ম-মৃত্যুরূপ যাওয়া-আসার প্রবাহই সংসার এবং এর বিপরীত অসংসার বা বাসনার নিবৃত্তি। বাসনার ক্ষয় বা বাসনার নাশের নাম বাসনাকে নির্বাসনায় রূপান্তরিত করা। নাশ কোন জিনিসের হয় না, হয় রূপান্তরন বা Transformation. স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ মনের নাশের সম্বন্ধে বলেছেন : "You cannot kill the mind, but you can transform the mind. You can transform the mind or nescience into consciousness."

শরণাগতির অভ্যাস বা সাধনার নামই নির্বাসনায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া। স্বার্থবুদ্ধির বাসনা নিয়ে ভোগের পথে না গিয়ে ভোগের ইচ্ছা পরিত্যাগ করার নাম নির্বাসনা ও শরণাগতি। মানুষমাত্রেরই মনে জাগে শান্তি ও শোক-দুঃখের পারে যাওয়ার ইচ্ছা। আচার্য মধুসূদন সরস্বতী তাই বলেছেন—

অনাদিভবসন্তাননিরূঢ়ং দুঃখকারণম্।
দুস্ত্যজ শোকমোহাদি কেনোপায়েন হীয়তাম্॥

ত্যাগ করা কঠিন। শোক-মোহরূপ এই সংসারের পারে কিভাবে যাওয়া যায়—এই প্রশ্ন জাগে প্রতিটি মানুষেরই মনে। কিন্তু উপায় কি? উপায় একমাত্র নির্বাসনার ও শরণাগতির অভ্যাস। এই অভ্যাসই সাধনা,—যে সাধনা মানুষের মধ্যে সিদ্ধির আশীর্বাদ নিয়ে আসে প্রশান্তির আলোকে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন—'হিঙুচে শাকের মধ্যে নয়, মিছরি মিষ্টির মধ্যে নয়';—এর অর্থ হিঙুচে শাক হলেও ঔষধের কাজ করে এবং মিছরি মিষ্টি হলেও তাই। হিঙুচে ও মিছরি কফ বা সর্দি নষ্ট করে। তেমনি নির্বাসনার ও মুক্তির ইচ্ছা বাসনা হলেও ঐ ইচ্ছা বা বাসনা বন্ধনমুক্তির পরিবেশ ও আনন্দ বহন করে নিয়ে আসে। স্বার্থ বা একমাত্র নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির বাসনা যদি ঈশ্বরের দিকে নমিত বা অর্পিত হয় তাহলে তখন ঈশ্বরের প্রীতি-সম্পাদনের জন্যই হয় ইচ্ছা বা বাসনা এবং সেই ইচ্ছা বা বাসনার নামই স্বার্থবুদ্ধিশূন্য বাসনা বা নির্বাসনা। নির্বাসনা স্বার্থের সকল সংস্কার দূর করে, মনকে শান্ত, স্থির ও পরিশুদ্ধ করে, মন হয় তখন অ-মন,—'হ্যমনী ভবতি' বলেছেন গৌড়পাদ। তখনই আসে প্রশান্তি ও মুক্তি। অবিদ্যার আবরণ বিদ্যার ও মুক্তির বাসনায় রূপান্তরিত হয়। এই রূপান্তরণ সার্থক হয় একমাত্র শরণাগতিতে বা প্রপত্তিতে। আচার্য মধুসূদন সরস্বতী এই শরণাগতিকে বলেছেন

অনন্যভক্তিরূপ প্রেমাভক্তি ;—'তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে'। একভক্তি বলতে অনন্যভক্তি ও সর্বভাবে শরণাগতি। তিনি পুনরায় বলেছেন ঃ 'নিষ্কামকর্মানুষ্ঠানং মূলং মোক্ষস্য কারণম্';—নিষ্কাম বা ফলকামনাশূন্য কর্ম সার্থক হয় বুদ্ধিযোগে, কেননা মুক্তির ইচ্ছারূপ বুদ্ধিযোগই অবিদ্যা ও সংসার-বন্ধননাশের একমাত্র উপায়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণও বলেছেন যে, কর্মেই মানুষের অধিকার, ফলে নয়, কেননা ফলকামনার আশাই মানুষকে কৃপণ করে অর্থাৎ নিরাশ করে মুক্তিলাভ থেকে। তাই সকল কর্ম করার পিছনে থাকা প্রয়োজন ঈশ্বরের বা শ্রীভগবানের প্রতি একান্তভাবে শরণাগতির ভাব। শরণাগতিই মানুষকে এনে দেয় শান্তির ও মুক্তির উপলব্ধি।

॥ দুই ॥

আমি গ্রন্থকার স্বামী সোমানন্দ মহারাজ-লিখিত 'শরণাগতি'-গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি যতটুকু শুনেছি তাতে বিশেষ আনন্দিত হয়েছি, কেননা তিনি একান্ত কঠিন ও দুরূহ বিষয়টিকে সহজ-সরল ভাষায় ও প্রাঞ্জলভাবে যেভাবে আলোচনা করেছেন তাতে ক'রে কি সাধারণ ও কি অসাধারণ কোন শ্রেণীর মানুষের পক্ষেই শরণাগতি-তত্ত্বের অনুধাবন করা অসুবিধা হবে না, বরং সহায়কই হবে সকলের সকল দিক থেকে। শরণাগতিতত্ত্বের ও সাধনার বিষয়বস্তু ও আলোচনা সকল শাস্ত্রে বা গ্রন্থেই আছে ছড়ানো, সমন্বয়দৃষ্টিসম্পন্ন সাধক-গ্রন্থকার সযত্নে সেইগুলিকে সংগ্রহ ও একত্রিত ক'রে বিচার করেছেন তার মূল বিষয়বস্তু, তত্ত্ব, সাধনা ও উপকারিতা। এই সযত্নপরিশ্রমে গ্রন্থকারের ধৈর্য, প্রচেষ্টা ও শাস্ত্রজ্ঞানেরই পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা তাঁর যত্ন, প্রচেষ্টা ও সহজ-সরল ও হৃদয়গ্রাহী ক'রে বিষয়-প্রতিপাদনের তাই বিশেষ প্রশংসা করি।

॥ তিন ॥

'শরণাগতি'-গ্রন্থের সুষ্ঠু-বিশ্লেষণে গ্রন্থকার স্তরে স্তরে কৃপা, সমর্পণ, ইচ্ছাশক্তি ও ইচ্ছালয়, কর্তব্যাকর্তব্যনির্ণয় প্রভৃতি বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণ, শরণাগতির সাধনপর্যায়ে শাস্ত্রীয় ও মহাজনদের উক্তির সঙ্গে সঙ্গে আন্তরিক প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণরূপ কর্মের চরমপরিণতিকে সুপণ্ডিত গ্রন্থকার সার্থকভাবেই রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাছাড়া শরণাগতির দর্শন, আচরণ ও ফলশ্রুতির বিচারে ও বিশ্লেষণে গ্রন্থকারের প্রচেষ্টা ও দৃষ্টি বিশেষ প্রশংসনীয়। শরণাগতি সাধনার বস্তু, সুতরাং সাধনায় নিরলস প্রচেষ্টা না থাকলে তার তত্ত্বের সম্যক্ উপলব্ধি করা কঠিন।

॥ চার ॥

আচার্য মধুসূদন সরস্বতী 'ভক্তিরসায়ণ'-গ্রন্থের টীকায় চার রকম বৈরাগ্যের কথা বলেছেন শরণাগতির রূপকে সার্থক করার জন্য। সেই চারটি বৈরাগ্য হ'ল

যতমানসংজ্ঞা, ব্যতিরেকসংজ্ঞা, একেন্দ্রিয়সংজ্ঞা ও বিষয়বিতৃষ্ণার নিবৃত্তিরূপ বশীকারসংজ্ঞা। ঋষি পতঞ্জলি তাঁর পাতঞ্জলদর্শনে 'তৎ পরম্' প্রভৃতিসূত্রে আরও দু'রকম বৈরাগ্যের কথা বলেছেন,—যে দুটি হ'ল পরবৈরাগ্য ও অপরবৈরাগ্য। আচার্য মধুসূদন সরস্বতী গীতার 'গূঢ়ার্থদীপিকা'-টীকায় ঐ সকল রকম বৈরাগ্যের সারসংকলন ক'রে বলেছেন ঃ 'নিষ্কামকর্মানুষ্ঠানং মূলং মোক্ষস্য কীর্তিতম্',—মোক্ষ বা মুক্তি সম্পূর্ণ নিষ্কামকর্মসাপেক্ষ। ফলপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা-হীন নিষ্কামকর্মই একমাত্র মানুষকে সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত ক'রে মুক্তি বা শান্তি দিতে পারে। কিন্তু 'পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবসোঽপি সঃ',—মানুষ পূর্ব-জন্মের অভ্যাসের সংস্কার-বশে ফললাভের আশায়ই কর্ম করে, সেজন্য সংসার-বন্ধনে সে আবদ্ধ হয়। 'আত্মারামশ্চ মুনয়োর্নিগ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে,'—আত্মজ্ঞানতৃপ্ত স্থিতপ্রজ্ঞ মুনিরাও সেজন্য নিজেরা বন্ধনবিহীন হলেও অহৈতুকী ফলেচ্ছারহিত ভক্তিযোগের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই ফলেচ্ছাশূন্য ভক্তিযোগের নামই 'একভক্তি' ও 'শরণাগতি'। একভক্তিরূপ শরণাগতির অভাবেই ফলের কামনায় মানুষ কৃপণ অর্থাৎ মুক্তিলাভ থেকে বঞ্চিত হয়,—'কৃপণাঃ ফলহেতবঃ'। সেজন্য শ্রীকৃষ্ণ ফল-কামনাহীন কর্ম করতে বলেছেন,—'তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর'।

রসবাদী বৈষ্ণবাচার্য রূপগোস্বামীও তাঁর, 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'-গ্রন্থে অনুরূপ কথাই বলেছেন যে, সম্পূর্ণভাবে শরণাগতি-ছাড়া মুখ্যরসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-ভগবানকে লাভ করা যায় না। অদ্বৈতবেদান্তীদের দৃষ্টি একটু ভিন্ন গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যদের থেকে, কেননা অদ্বৈতবেদান্তীরা বলেন 'পরমানন্দ আত্মৈব রস ইত্যাহুঃ,'—অর্থাৎ 'সচ্চিদানন্দাত্মক-ব্রহ্মস্বরূপস্যাত্মনো রসরূপত্বশ্রবণাদিত্যর্থঃ'—বলেছেন মধুসূদন সরস্বতী। 'রসো বৈ সঃ' শব্দের অর্থ করেছেন রূপগোস্বামী 'শ্রীকৃষ্ণ এব রসঃ,—মুখ্যরসঃ'। কিন্তু সাধনে ও সিদ্ধির দৃষ্টিতে ও সিদ্ধান্তে উভয় দর্শনাচার্যই এক ও অভিন্ন ; কেননা পরিপূর্ণ প্রপত্তি বা শরণাগতি ছাড়া পরমসিদ্ধি মুক্তি লাভ করা অসম্ভব।

বিচারনিষ্ঠ গ্রন্থকার তাঁর এই গ্রন্থে সকল শাস্ত্রযুক্তি, বিচার ও সিদ্ধান্তের উপপাদন ক'রে শরণাগতি-সম্বন্ধে জানার ও সাধনার পথে সকল-কিছু বিষয়ের ও তত্ত্বেরই পরিচয় দিয়েছেন,—যা কর্মসাধনরত মানুষকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবে ব'লে বিশ্বাস করি। গ্রন্থকারের কল্যাণ-প্রচেষ্টা সার্থক হোক এই আমাদের কামনা। সুলিখিত এই গ্রন্থ, সকলের পরমকল্যাণই সাধন করবে একথা সত্য।

রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

কৈফিয়ত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পড়তে গেলে প্রায় প্রতি খণ্ডেই দেখা যাবে যে শ্রীশ্রীঠাকুর শরণাগতি সম্বন্ধে কিছু না কিছু বলেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বার বছর ধরে যে কঠোর সাধনা করেছেন তা প্রথম থেকেই শরণাগত হয়ে বা মায়ের আদেশ পেয়ে করেছেন। শরণাগতির ভাবটি তাঁর সারা জীবনে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে রয়েছে। অন্যান্য ধর্মসাধক, মহাপুরুষ ও মনীষীদের বাণীর মধ্যেও শরণাগতি সম্বন্ধে অনেক কথা পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ শরণাগতিকে সাধনার প্রধান অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

প্রায় সকল সাধকই উপদেশ দিয়ে থাকেন—'শরণাগত হয়ে থাক', 'প্রভুর ইচ্ছাতেই জগত চলছে, তাঁকে সব ভার দাও', 'ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছাতে নিজের ইচ্ছা মিলিয়ে দাও' —ইত্যাদি। এই সব বাক্য অনুধাবন করতে গিয়ে মনে হল—শরণাগতি তো শুধু সিদ্ধের অবস্থা নয়, সাধনার ফল নয়, শরণাগতির নিশ্চয়ই নিজস্ব সাধন-পদ্ধতি আছে।

একজন শ্রদ্ধেয় স্বামীজীকে এক সংকট সময়ে বলতে শুনেছিলুম, 'ঠাকুর, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।' কথাটির মর্ম তখন অনুধাবন করতে পারি নি। অনেক পরে তাঁর এই শরণাগত-ভাব সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে শরণাগতি বিষয়ে যখন বিভিন্ন শাস্ত্র, মনীষী, তপস্বী, দার্শনিক ও মহাপুরুষগণের বাণী ও উপদেশ সংগ্রহ করতে ইচ্ছা জাগল, তখন অবাক বিস্ময়ে দেখলুম যে শরণাগতি সম্বন্ধে অনেক তথ্য, তত্ত্ব, সাধন-রহস্য, ফলাফল বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে। কয়েকটি গ্রন্থে বা প্রবন্ধেও শরণাগতি সম্বন্ধে আলোচনা, সূত্র, সাধনোপদেশ পাওয়া গেল।

সব মতের, সব সম্প্রদায়ের, এমন কি সকল ধর্মের মর্মবাণী যেন শরণাগতি। শরণাগতির সাধন, শরণাগতের অবস্থা প্রভৃতি বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে মতামত সংগ্রহ করতে গিয়ে মনে হয়েছে, শরণাগতিতে যেন সকল ভাবধারাকে সমন্বিত করা যায়। শাস্ত্রবাক্য ও আপ্তবাক্যের সংগ্রহে একটি পৃথক শরণাগতি-শাস্ত্র যেন গড়ে উঠতে পারে। সেই দিক মনে রেখেই এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। বস্তুত এটি একটি সংকলন-গ্রন্থ রূপেই গ্রথিত হয়েছে।

শরণাগতি বিষয়টি বিশদভাবে বলতে গিয়ে তাকে কয়েকটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। অধ্যায়ের বিষয়বস্তু অনুসারে শাস্ত্রবাক্য বা মহাপুরুষদের বাণী ও উপদেশ বর্ণিত হয়েছে। এই অধ্যায়করণ বিষয়ে কোন শাস্ত্র বা মহাপুরুষ নির্দেশিত পথের সন্ধান পাওয়া যায় নি। শরণাগতি বিষয়টি সাধনোপযোগী করার আগ্রহে অধ্যায় রচনার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে মাত্র। উপযুক্ত অধিকারীর

হাতে পড়লে তা হয়তো আরও সুন্দর ও উপযোগী করে সাজিয়ে আরও পরিস্ফুট করে তোলা যেত।

যে সমস্ত পুস্তক থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, যথাস্থানে তার নাম উল্লেখ করা আছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীগুলো অধিকাংশই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। কয়েকজন বন্ধু ও সমচিন্তক শাস্ত্রবাক্যাদি সংগ্রহে সাহায্য করেছেন। কয়েকজন মহাত্মা ও তপস্বী সাধককে প্রশ্নাদি দ্বারা যে উত্তর পেয়েছি, তারও উল্লেখ আছে বটে, তবে সব ক্ষেত্রে তাঁদের নাম দেওয়া যায় নি। সকলের প্রতিই আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। অনেক ক্ষেত্রে মূল শাস্ত্রগ্রন্থ না পেয়ে তার অনুবাদ বা অপরের সংগ্রহ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত অধ্যাপক দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম মহারাজ বইটি রচনায় কয়েকটি মৌলিক উপদেশ দিয়েছেন এবং শাস্ত্রীয় বাণী সংগ্রহে সাহায্য করেছেন। পূজনীয় প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী ধীরেশানন্দ মহারাজ (রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, বারাণসী) বইটি দেখে কিছু মূল্যবান উপদেশ ও নির্দেশ দিয়েছেন, তাতে শরণাগতির বিষয়টি আরও পরিস্ফুট করে তোলায় সাহায্য হয়েছে। পণ্ডিত মনীষী সন্ন্যাসী স্বামী জ্যোতিঃস্বরূপানন্দ মহারাজের নিকট থেকে শরণাগতি সম্বন্ধে অনেক ব্যাখ্যা, উপদেশ ও নতুন তথ্য পেয়েছি। তাঁর নামে বইটি উৎসর্গ করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের প্রেসিডেন্ট পূজনীয় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ দয়া করে শরণাগতির ভূমিকা লিখে দিয়েছেন, এজন্যে বইটির মূল্য-মান অনেক বৃদ্ধি হয়েছে। এঁদের সকলকে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা, প্রণাম নিবেদন করছি।

নিজের উপকারে লাগবে বলেই পুস্তকাকারে গ্রথিত করার প্রয়াস—ফলে স্মরণ মননের সুযোগ ও তজ্জনিত আনন্দ লাভ। শরণাগতের আচরণ পরসংবেদ্য হলেও শরণাগতির অবস্থা লাভ স্বসংবেদ্য। শরণাগতির কোন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিগত সাধনপথ না থাকায় শরণাগত হয়ে থাকা যে কত কঠিন তা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করা যায়। তবে আশার কথা যে শরণাগতির সাধকের বিদ্বান, পণ্ডিত হবার শর্ত নেই, তাই সাধারণ সাধকও এই পথ সহজে গ্রহণ করতে পারেন। আর কিছু না হোক, নির্ভরতাজনিত দায়মুক্তির স্বস্তির নিশ্বাস ফেলার মত হালকা মেজাজ নিয়ে আনন্দে থাকা যায়, অথচ স্মরণ মনন থাকে। তবে একথা ঠিক যে অন্য পথে যেমন, এ পথেও তাঁর কৃপা ছাড়া শরণাগতির ভাবটি সম্পূর্ণ আসে না। আবার শরণাগতিতেই কৃপা লাভ হয়—একথাও মহাপুরুষগণ বলেছেন।

বিশ্বাস যে শাস্ত্রবাণী ও আপ্তবাক্য সংকলন হেতু পাঠকের বা সাধকের মনে শরণাগতি বিষয়ে সামান্য হলেও আলোকপাত হবে এবং এটুকু হলেও নিজেকে কৃতার্থ মনে করব।

মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
রিশড়া (হুগলী)
ফাল্গুন ১৩৩৯

স্বামী সোমানন্দ

সূচীপত্র

	ভূমিকা	ক
	কৈফিয়ত	ঙ
১	কৃপা ও শরণাগতি	১
২	সমর্পণ, ইচ্ছালয় ও কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয়	৭
৩	শাস্ত্রবাক্য ও আপ্তবাক্য	১৪
৪	শরণাগতির প্রকারভেদ	২৬
৫	ঈশ্বরেচ্ছা, কর্মবাদ ও স্বাধীন ইচ্ছা	৩৪
৬	শরণাগতির সাধন ঃ	৫১
	১। (ক) সমর্পণ—শাস্ত্রীয় উক্তি	৫৭
	(খ) সমর্পণ—মহাজনের উক্তি	৬৭
	(গ) সমর্পণে প্রার্থনা	৮৪
	(ঘ) সমর্পণ—বিবিধ	৯৪
	২। ইচ্ছালয়	১০৫
	৩। কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয়	১২৪
৭	শরণাগতির দর্শন	১৪২
৮	শরণাগতের আচরণ	১৫৬
৮	শরণাগতির মহিমা	১৬৫
১০	সাধনের সার সংক্ষেপ	১৮৩

১

কৃপা ও শরণাগতি

এ যুগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি শ্রেষ্ঠ বাণী, যত মত তত পথ। তিনি বলেছেন, 'নানা পথ ঈশ্বরের কাছে পৌঁছবার। মত পথ। যেমন কালীঘরে যেতে নানা পথ দিয়ে যাওয়া যায়। তবে কোনও পথ শুদ্ধ, কোনও পথ নোংরা। শুদ্ধ পথ দিয়ে যাওয়াই ভাল।'

ভগবান লাভের পথ অনন্ত হলেও মোটামুটি তাকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম, যোগ। গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রধানত এই চারটি পথের কথাই বলেছেন। এ যুগে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দ এই চার পথে ঈশ্বরলাভের উপায় নির্দেশ করেছেন। স্বামীজীর জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ ও রাজযোগের বই থেকে এ সব পথে সাধনার কথা পাওয়া যায়।

জ্ঞানের পথ বিচারের পথ। ঈশ্বর কী, আমি কে, আত্মা, ব্রহ্মের স্বরূপ কী ইত্যাদি বিচার করে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ বা ব্রহ্মাত্মৈক্যানুভূতি লাভ হয়। ফলে সাধকের মুক্তি বা মোক্ষ ফল লাভ হয়। সাধক তখন 'জীবন্মুক্ত' পদবাচ্য হন।

ভক্তিপথে ঈশ্বরকে স্রষ্টা ধাতা পাতা সর্বনিয়ন্তা বলা হয়। এই পথে সাধক ঈশ্বর-দর্শন বা ঈশ্বরে ভক্তিলাভের জন্যে ব্যাকুল হন এবং কোনো ভাব বা সম্বন্ধ আরোপ করে সাধন ভজন করেন। জপ পূজা পাঠ নাম প্রভৃতি অবলম্বন করে ঈশ্বরের ভজনা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথায়, 'এঁরা জানেন ঈশ্বরই একমাত্র কর্তা, আর সব অকর্তা। আমি ঈশ্বরের দাস। আমি যন্ত্র তিনি যন্ত্রী। তিনি যেমন করান তেমনি করি, যেমন বলান তেমনি বলি, তিনি যেমন চালান তেমনি চলি।'

কর্মপথের সাধকদের বলা হয় নিষ্কাম কর্মী। তাঁরা নিজের জন্য কর্ম করেন না, পরার্থে কর্ম করেন, কামনা বাসনা শূন্য হয়ে নিঃস্বার্থভাবে কর্ম করেন। তাঁরা কর্মের ফল ত্যাগ করে অর্থাৎ কোনো আশা আকাঙ্ক্ষা না রেখে কর্ম করেন। ফলে তাঁদের চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং শুদ্ধচিত্তে তাঁরা ঈশ্বরানুভূতি লাভ বা ঈশ্বর দর্শন করতে পারেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'নিষ্কাম কর্ম করতে করতে ঈশ্বরেতে ভক্তি ভালবাসা আসে। এইরূপ নিষ্কাম কর্ম করতে করতে ঈশ্বর লাভ হয়।' এঁরাও ক্রমে বুঝতে পারেন যে মানুষ নিজের ইচ্ছায় সব কিছু কর্ম করতে পারে না, বিরাটের ইচ্ছা বা ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সমস্ত কর্ম নির্বাহিত হয়।

যোগের পথে বা রাজযোগের পথে সাধক নিজের দেহের মধ্যে সুপ্ত শক্তির সন্ধান লাভ করেন এবং ক্রিয়া, প্রক্রিয়া বা ধ্যানাদি দ্বারা সেই শক্তিকে জাগ্রত করে পরমাত্মার সহিত যোগ সাধন করেন। জীবাত্মা ও পরমাত্মায় মিলন হয় এবং সাধক পরম সম্বোধি লাভ করেন।

জ্ঞানের পথ সাধারণত অদ্বৈতবাদীদের পথ। দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বা ভক্তিবাদিগণ ভক্তিপথের সাধক। কর্মযোগের সাধকদের মধ্যে জ্ঞান, ভক্তি উভয় মার্গের সাধক রয়েছেন, এমন কি নিরীশ্বরবাদীও আছেন। যোগমার্গীদের পথ অনেকটা জ্ঞানের পথ। তাই মোটামুটি দুটি পথ সাধনার ধারায় রয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়—জ্ঞানের পথ ও ভক্তির পথ। তবে একটি স্থানে এই দুটি পথও মিলিত হয়েছে বলে মনে হয়—সে স্থানটি হলো 'কৃপা'।

কঠোপনিষদ বলেছেন, 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ'—যে আত্মাকে সাধক প্রার্থনা করেন, তাঁরই অনুগ্রহে তিনি লভ্য বা অনুভূত হন। যে আত্মজ্ঞান লাভ করবার জন্যে সাধক সাধনা করে যাচ্ছেন, সেই আত্মা যদি কৃপা করেন তবেই তাঁকে লাভ করা যায়। তাঁর কৃপা না হলে, তাঁর বরণ না হলে সাধনা পূর্ণ হয় না।

আচার্য শংকর শারীরক ভাষ্যে লিখেছেন, 'পরমেশ্বর অনুগ্রহ করে যে জ্ঞানদান করেন, তা দ্বারাই মোক্ষসিদ্ধি হয়—মোক্ষলাভও তাঁর কৃপার

ওপর নির্ভর করে।' সায়নাচার্য তৈত্তিরীয়-আরণ্যক ভাষ্যে লিখেছেন, 'এক-মাত্র পরমেশ্বরের অনুগ্রহ হতেই মানুষের মনে অদ্বৈতজ্ঞান-লাভের বাসনা উদিত হয়—জ্ঞানলাভের ইচ্ছাটি তাঁর কৃপা ছাড়া উদিত হয় না।'* অবধূত গীতায়ও এরূপ বলা হয়েছে।

ভক্তিবাদীদের কথাও তাই। পুজো পাঠ জপ তপ যাই করি না কেন, তাঁর কৃপা অর্থাৎ ঈশ্বরের কৃপা না হলে কিছুই হয় না। তাঁর কৃপা ছাড়া এই পথে অগ্রসর হওয়াই যায় না। প্রথমে গুরু-কৃপা, তারপর ঈশ্বর-কৃপা। যে কৃপা লাভ করেছে সে ধন্য। কৃপা ঈশ্বরলাভের পথে সবচেয়ে বড় পাথেয়। ভক্তিবাদীদের নিকট কৃপার মূল্য অত্যন্ত বেশী। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'কিন্তু হাজার চেষ্টা কর, তাঁর কৃপা না হলে কিছু হয় না। তাঁর কৃপা না হলে তাঁর দর্শন হয় না।'

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে—'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে'—তিনি যখন কৃপাপরায়ণ হন তখন মানুষের পক্ষে মুক্তিলাভ সম্ভব হয়। তাই তাঁর অর্থাৎ মহামায়ার প্রসন্নতা লাভ করতে হবে।

স্বামী তুরীয়ানন্দ বলেছেন, 'ভগবান-লাভ ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করিতেছে, আমার জপ-তপের উপর নহে—এই বিশ্বাস, এই ধারণা হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকা একান্ত আবশ্যক।'

এই কৃপা কী করে লাভ করা যায়? কৃপা লাভ করার কোনো শর্ত আছে কি? এই কৃপা কে লাভ করতে পারে? কেউ বলেছেন, কৃ মানে কর, পা মানে পাবে—কিছু কর তবে পাবে। তার মানে কৃপা শর্তশূন্য নয়, শর্তাধীন। সাধন ভজন জপ তপ পূজা পাঠ ধ্যান ধারণা কিছু করতে হবে, তবেই এই কৃপা লাভ হতে পারে। কেউ বলেছেন, কৃপা শর্তশূন্য হওয়াই উচিত। কৃপা কথাটির মধ্যে কোনো রকম শর্তহীন ভাবই বুঝায়, নাহলে কৃপা হয় কেমন করে। কিছু করলে তবে যদি পাওয়া যায়, তাহলে তো তা অর্জন হয়—কৃপার ঠিক ঠিক অর্থ তা বুঝায় না। কৃপা অহেতুক হওয়াই উচিত।

---

* গীতা—স্বামী অপূর্বানন্দ

কৃপা সম্বন্ধে 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদে' স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'যারা কায়-মনোবাক্যে সর্বদা পবিত্র, যাদের অনুরাগ প্রবল, সদসৎ বিচারবান ও ধ্যান-ধারণায় রত, তাদের ওপরই ভগবানের কৃপা হয়। তবে ভগবান প্রকৃতির সকল নিয়মের বাইরে কোনো নিয়ম-নীতির বশীভূত নন।···তিনি দেশ-কালাতীত।···প্রকৃতির যা কিছু নিয়ম তিনিই করেছেন, হয়েছেন। আবার সে সকলের বাইরেও রয়েছেন। তিনি যাকে কৃপা করেন, সে তন্মুহূর্তে নিয়মের গণ্ডীর বাইরে চলে যায়। সেইজন্য কৃপার কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই। কৃপাটা হচ্ছে তাঁর খেয়াল।···'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এর একটি সুন্দর সমন্বয় করেছেন। তিনি বলেছেন, 'কৃপা বাতাস তো বইছেই, তুই পাল তুলে দে না।' তাতে এই বুঝা যায় যে ঈশ্বর অহেতুক কৃপাসিন্ধু। সর্বদা সর্বত্র তাঁর কৃপার বাতাস বয়ে চলেছে। সেই কৃপাকে আমাদের অন্তরে অনুভব করতে হবে। তা করতে হলে পালটি তুলে দিতে হবে, পালটি যদি ঠিক ঠিক তুলে দেওয়া যায়, তবে তাঁর কৃপা-বাতাসে ভর করে এ ভব-সিন্ধু অতিক্রম করা সম্ভব। কিন্তু পালটি উপযুক্ত হওয়া চাই, ছেঁড়া হলে চলবে না। খেলো হলে ছিঁড়ে যেতে পারে। এই পাল তোলা মানে সাধন ভজন, ভক্তিলাভের চেষ্টা।

স্বামী বিবেকানন্দ তখন বরানগর মঠে সাধন ভজন তপস্যায় মগ্ন। একদিন এক ভদ্রলোক তাঁকে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা মশায়, সাধন করলেই তাঁকে পাওয়া যাবে?'

বিবেকানন্দ—'তাঁর কৃপা। গীতায় বলছেন, 'তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।' তাঁর কৃপা না হলে সাধন ভজনে কিছু হয় না। তাই তাঁর শরণাগত হতে হয়। 'ত্বমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।' ···ঈশ্বর দয়ার সিন্ধু, তাঁর শরণাগত হয়ে থাক, তিনি কৃপা করবেন।'

শ্রীমা সারদা দেবী বলেছেন (মায়ের কথা), 'এত জপ করলামই বল, আর এত কাজ করলামই বল, কিছুই কিছু নয়। মহামায়া পথ ছেড়ে না দিলে কার কি সাধ্য? হে জীব, শরণাগত হও, শরণাগত হও। তবেই তিনি দয়া করে পথ ছেড়ে দেবেন।'

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীরামানুজের মতবাদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে —'শুধু মানবিক চেষ্টায় মুক্তিলাভ সম্ভব নয়। ঈশ্বরের কৃপা না হলে কিছুই হবে না।···যে ব্যক্তি ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেন, ঈশ্বর তাঁকে কৃপা করে দুঃখ-বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন।'*

স্বামী শিবানন্দ (মহাপুরুষ মহারাজ) বলেছেন (শিবানন্দ-বাণী ১ম)— 'শাস্ত্রে তো ভগবান লাভের উপায় সম্বন্ধে নানাভাবের উপদেশ রয়েছে। কিন্তু শেষ কথা হল শরণাগতি—শরণাগতি। শ্রীভগবানের চরণে আত্ম-নিবেদন করে, সর্বতোভাবে তাঁর শরণাগত হয়ে পড়ে থাকতে পারলে আর কোন ভাবনা নেই।···যত পূজা পাঠ জপ ধ্যান কঠোর সাধনা—সবই একমাত্র শরণাগতি আনার জন্য। সর্বোপরি চাই ভগবৎ-কৃপা। অনন্য মনে তাঁর ধ্যান চিন্তা ও প্রার্থনা করতে করতে তিনি কৃপা করে সেই দুর্লভ শরণাগতি দেন। ···এ সংসার যে অনিত্য এ বোধ তাঁর কৃপা ছাড়া হয় না। একমাত্র ভগবানের শরণাগতি ছাড়া এ মায়াজাল কাটাবার অন্য কোন উপায় তো নেই।'

স্বামী তুরীয়ানন্দ পত্রাবলীতে বলেছেন, 'তাঁহার শরণাগত হইলে অন্য কাহারও অপেক্ষা থাকে না, ভিতর হইতে নির্ভয় ভাব উদয় হয়। কারণ, তাঁহার কৃপা উপলব্ধি হয়, অসৎ চিন্তা হৃদয় হইতে চলিয়া যায়, সদা সদ্ভাবেরই স্ফুরণ হইয়া থাকে, অন্তর শান্তিময় হইয়া যায়—এ সকল স্বসংবেদ্য।'

স্বামী অভেদানন্দ বিভিন্ন সময়ে বলেছেন (মন ও মানুষ), 'আত্ম-সমর্পণের (self surrender) ভাবই ভগবদ্‌কৃপা লাভের সহজ পথ। নিজের কর্তৃত্বাভিমান মুছে দিয়ে ঈশ্বরই সব করাচ্ছেন একথা ভাবতে হয়। তিনিই যন্ত্রী, আমি যন্ত্র—এই রকম।'

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় ভগবান বলেছেন, 'এই ত্রিগুণাত্মিকা অলৌকিকী আমার মায়া নিতান্ত দুস্তরা। যাঁহারা একমাত্র আমারই শরণাগত হইয়া ভজনা করেন, তাঁহারাই কেবল এই সুদুস্তরা মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন।' ৭।১৪

ভগবান আরো বলেছেন, 'সর্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমারই শরণা-

* ভারতীয় দর্শন—ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী

গত হও। আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে নির্মুক্ত করিব।' ১৮।১৬
ঈশ্বরের এই অভয়-বাণী শরণাগতি সম্বন্ধে আমাদের বিশেষভাবে অবহিত করে। তাই শরণাগতি সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন মনে জাগে—'শরণাগত হয়ে থাকা' অর্থে কী বুঝায়? 'শরণাগতি' কি শুধু 'কৃপা' লাভের পন্থা, না ঈশ্বরানুভূতি লাভেরও একটি পথ? শরণাগতি কি সাধকের একটি 'লক্ষণ'? শরণাগতি কি বিভিন্ন পথের 'সাধনার ফলস্বরূপ'? শরণাগতির 'নিজস্ব সাধনা' আছে কি? শরণাগতের 'আচার আচরণ' কীরূপ? শরণাগতির 'দর্শন' কী? শরণাগতি কি একটি 'জীবন-দর্শন'?

যাঁরা ভক্তিবাদী তাঁরা জানেন যে ভক্তিশাস্ত্রে শরণাগতি বিষয়ে অনেক কথা আছে, উপদেশ নির্দেশ আছে। পুরাণাদি শাস্ত্রে শরণাগতি বিষয়ে অনেক কাহিনী আছে। কথায় কথায় অনেকেই বলে থাকেন—'সবই তাঁর ইচ্ছা', 'ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে', 'ভগবান যা করছেন মানুষের মঙ্গলের জন্যেই করছেন', 'ভগবানের দয়ায় এই কাজটি হল', 'ঈশ্বরের কৃপায় আমি এই পেলুম'···ইত্যাদি ইত্যাদি। কথাগুলো মুখে আমরা যেমন বলি, অন্তর দিয়ে কি তা বলে থাকি? কথাগুলো শুনতে ভালো লাগে, কিন্তু যিনি বলেন তিনি কি শরণাগত হয়ে বলেন? শরণাগতির যে বাস্তব দিক রয়েছে সে সম্বন্ধে অবহিত হয়ে কি তিনি বলেন, চলেন বা করেন? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা শুধু মৌখিক বলেই মনে হয়। যদি কখনো আন্তরিক বলেই ধরা যায়, কিন্তু সর্বদা সর্ব কাজে সে ভাবটি পরিলক্ষিত হয় না। তাই শরণাগতি সম্বন্ধে অনেক উপদেশ নির্দেশ থাকলেও সর্বদা সর্ব বিষয়ে সর্ব কার্যে সর্বত্র শরণাগত হয়ে থাকা অত্যন্ত কঠিন বলেই মনে হয়।

ওপরের প্রশ্নগুলো সামনে রেখে শরণাগতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারলে হয়তো শরণাগতি বিষয়ে একটু ধারণা হতে পারে। ভক্তিশাস্ত্র ও অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রে, মহাপুরুষ ও মনীষীদের বাক্যে, সাধু মহারাজদের জীবনে ও আচরণে শরণাগতি সম্বন্ধে যা জানা যায়, বুঝা যায় ও দেখা যায় তাতে শরণাগতির ধারণা পরিপুষ্ট হতে পারে এবং সে বিষয়ে বিশেষ শিক্ষালাভ হতে পারে।

২

সমর্পণ, ইচ্ছালয় ও কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয়

শ্রীরামকৃষ্ণদেব একটি গল্প বলতেন—একদিন নারায়ণ বৈকুণ্ঠে বসে আছেন, পাশে আছেন লক্ষ্মী দেবী। জগতের সব খোঁজ-খবর নেওয়া হচ্ছে, হঠাৎ নারায়ণ সিংহাসন থেকে উঠে 'আহা-হা' করতে করতে ছুটে বেরিয়ে গেলেন। একটু পরে আবার তিনি ফিরে এলেন। লক্ষ্মী ঠাকরুণ তো এ কাণ্ড দেখে অবাক। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এই গেলে, আবার ফিরে এলে কেন?

নারায়ণ বললেন, হ্যাঁ, আমার এক ভক্তের বড় বিপদ ঘটেছিল।

—তা ফিরে এলে কেন?

—আমার আর দরকার হলো না।

—কী রকম?

নারায়ণ তখন বললেন, দেখলুম আমার একটি ভক্ত আমার নাম-কীর্তন করতে করতে আত্মভোলা হয়ে পথ দিয়ে যাচ্ছিল। রাস্তার ধারে ধোপা যে কাপড় শুকুতে দিয়েছিল, তা সে দেখতে পায় নি—কয়েকটি কাপড় মাড়িয়ে ফেলেছিল। তাই দেখে ধোপা তাকে লাঠি নিয়ে মারতে এসেছিল। ভক্তের অবস্থা দেখে আমি তাকে রক্ষা করতে ছুটে গিয়েছিলুম। কিন্তু আর দরকার হলো না। ভক্ত নিজেই আত্মরক্ষা করবার জন্য একটি ঢিল কুড়িয়ে নিয়েছে। আমি তাই ফিরে এলুম।

লক্ষ্মী দেবী বুঝলেন, ভগবানের ওপর যে নির্ভর করে, ভগবান স্বয়ং তাকে রক্ষা করেন। আর নিজের ব্যবস্থা যে নিজেই করে নেয়, তিনি আর তার কথা ভাবেন না।

সন্তান যখন ছোট থাকে তখন মা-বাবা শিশুর সমস্ত ভার নেন। শিশুও

জানে, তার মা আছে, বাবা আছে। সব কিছুই তখন মা-বাবার ওপর নির্ভর। তার যখন যা প্রয়োজন মা-বাবাই ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। কিন্তু ছেলে যখন বড় হয়, রোজগার করতে শেখে তখন তার নিজের প্রয়োজন নিজেই মিটিয়ে নেয়—মা-বাবার জন্য সে আর অপেক্ষা করে না। মা-বাবাও তখন আর ছেলের জন্য চিন্তা করেন না। নাবালকের জন্যেই অছি দরকার, সাবালক হয়ে গেলে আর অছি দরকার হয় না।

তেমনি বিরাট এই বিশ্বজগতের নিয়ন্তা সর্বময় কর্তা যে ভগবান তাঁর তুলনায় মানুষ কত ক্ষুদ্র, কত শিশু। সেই অনন্ত জগতের তুলনায় মানুষ সামান্য অতি নগণ্য। অসীমের তুলনায় মানুষ তো কিছুই নয়। তাই মালিকের ওপর নির্ভর করা ছাড়া মানুষের কি সত্যিকার কোনো ক্ষমতা আছে নিজের অভিমান, অহংকার নিয়ে চলার ? অহংকার নিয়ে, সাবালকের বুদ্ধি নিয়ে চলতে গিয়ে মানুষ নিজের কর্মফল নিজেই ভোগ করে।

কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'নাবালকেরই অছি। ছেলেমানুষ নিজে বিষয় রক্ষা করতে পারে না, রাজা ভার লন। অহংকার ত্যাগ না করলে ঈশ্বর ভার লন না।'

এই নির্ভরের অপর নামই 'শরণাগতি'।

যাঁকে আমি দেখি নি, যাঁকে আমি জানি না, যাঁর সম্বন্ধে আমার ধারণা নেই —সেই ঈশ্বরের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে আমাকে থাকতে হবে, তবেই তা হবে শরণাগতি। মানুষ হিসাবে মা, বাবা, গুরুজন বা শ্রেষ্ঠজন অথবা ক্ষমতাশীল ব্যক্তিকে আমার সব দায়-দায়িত্ব দিয়ে দিতে পারি এবং বিশ্বাস করে সর্ব বিষয়ে নির্ভরও করতে পারি—কিন্তু বিশ্বনিয়ন্তারূপে, অন্তর্যামীরূপে যে ভগবান বিশ্বের ও আমার একমাত্র পরিচালক বলে যদিও আমি বিশ্বাস করি, তিনি কীভাবে আমার সমস্ত কর্ম সম্পাদন করে দেবেন —তার ধারণা মানুষ সহজে করতে পারে না। অথচ এই দৃঢ় ধারণা ও শ্রদ্ধা নিয়ে নির্ভর করে থাকার নামই হবে শরণাগতি। তাঁর ওপর নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করে দেওয়া—আত্মনিক্ষেপ বা আত্মসমর্পণই হবে শরণাগতি।

সাধক দেওয়ান গেয়েছেন—

সকলই তোমারই ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি॥

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'তাঁর ইচ্ছা না হলে গাছের পাতাটিও নড়ে না।' ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সব কিছু পরিচালিত হচ্ছে, তাঁর অভিপ্রায় অনুসারেই সূর্য উঠছে, কিরণ দিচ্ছে, জীবজগত সব চলছে—এক কথায় সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হচ্ছে। আবার দেখা যাচ্ছে—মানুষ মন বুদ্ধি সহায়ে ইচ্ছা বা সংকল্প করে কত কাজ করে যাচ্ছে। বিজ্ঞানের দিক থেকে তো কথাই নাই—মানুষ আজ এত উন্নত হয়েছে নিজেদের ইচ্ছা ও চেষ্টাকে পরিচালিত করেই। চাঁদে মানুষ যাচ্ছে, শুক্র মঙ্গল বৃহস্পতি গ্রহে যন্ত্রপাতি পাঠাচ্ছে—কত বিরাট বিরাট সব আবিষ্কার—সবই তো মানুষের বিদ্যায়, বুদ্ধিতে ও সংকল্পে সাধিত হচ্ছে। মানুষের এই যে ইচ্ছা আর ঈশ্বরের ইচ্ছা—এই দুই-এ সম্বন্ধ কি? মানুষ কি ইচ্ছা করলে সব কিছু করতে পারে না? অথচ বাহ্যত দেখা যাচ্ছে মানুষের ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে। তাহলে ঈশ্বরেচ্ছাই কি প্রবল?

স্বামী সারদানন্দ বলেছেন, '…আসল কথা এই, ইহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য এবং বর্তমানে প্রত্যেকটি দিন আমি এইরূপই অনুভব করিতেছি যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত আমরা কোন কাজই করতে পারি না, সে কাজ যতই ছোট বা সহজ হউক না কেন।…'

স্বামী তুরীয়ানন্দ বলেছেন, '…আরও গভীরভাবে এখন বুঝতে পারছি, তিনি সব করছেন। আমরা তাঁর হাতের যন্ত্র মাত্র। তাঁর ইচ্ছা না হলে আমরা কিছুই করতে পারি না।'

মহাপুরুষদের বা ঈশ্বর-দ্রষ্টাদের স্থির সিদ্ধান্ত যে বহির্জগতে ও অন্তর্জগতে যে সকল ঘটনা ঘটে বা পরিবর্তন দেখা যায়, সে সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছায় হয়ে থাকে। সকল কার্যের কারণ হচ্ছে ঈশ্বরের ইচ্ছা। অতএব মানুষের ইচ্ছা যে আমরা বাহ্যত দেখতে পাই, তা ঈশ্বরেরই ইচ্ছা, কিন্তু সাধারণ মানুষ তা জানে না বা বোঝে না। ফলে অহংকার অভিমান-

বশত ইচ্ছা সহকারে কর্ম করে বলে মানুষ নিজেই সেই কর্মের সুখ-দুঃখাদি ফল ভোগ করে। কিন্তু মানুষ যখন নিজের ইচ্ছাকে ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যে বিসর্জন করে দেয় অর্থাৎ নিজের পৃথক কোনো ইচ্ছা রাখে না, সবই ঈশ্বরের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে এবং সকল কাজে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে অনুভব করে, তখনই হয় তার শরণাগতি। আমার ইচ্ছা সবই ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করতে হবে—তবেই হবে তা সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ।

আমার নিজের কোনো ইচ্ছা আগ্রহ থাকবে না, কোনো সংকল্প থাকবে না, কোনো উদ্যোগ থাকবে না—আমার সব ইচ্ছা আগ্রহ প্রচেষ্টাকে বিরাটের ইচ্ছার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে হবে—তবেই হবে শরণাগতি। কথামৃতের 'শ্রীম'-এর ভাষায়—'আমায় ডাকাতে ধরে নিলে 'রামের ইচ্ছায়', আবার আমি তামাক খাচ্ছি 'রামের ইচ্ছায়', আমি ডাকাতি করছি 'রামের ইচ্ছায়,' আমি প্রার্থনা করছি, 'হে প্রভু, আমায় অসদ্বুদ্ধি দিও না—আমাকে দিয়ে ডাকাতি করিও না'—এও 'রামের ইচ্ছা'। সৎ ইচ্ছা, অসৎ ইচ্ছা তিনি দিয়েছেন।...'

শরণাগত হয়ে থাকার এই দুইটি দিক পাচ্ছি --(১) ঈশ্বরে সম্পূর্ণ নির্ভর করা, তিনিই সব কিছু করছেন, করাচ্ছেন এইটি অনুভব করার চেষ্টা করা এবং তাঁতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা। (২) তাঁর ইচ্ছাতে নিজের ইচ্ছাকে মিলিত করে দেওয়া। নিজের পৃথক ইচ্ছাকে লুপ্ত করে দিয়ে তাঁর ইচ্ছাকে সর্বদা অনুভব করা ও সেভাবে জীবনকে পরিচালিত করা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথায়—হাত পা ছেড়ে দিয়ে তালগাছের ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো সম্পূর্ণ ঈশ্বর-নির্ভরশীল হতে হবে। নিজের কোনো সংকল্প থাকবে না, উদ্যোগ থাকবে না – গীতার ভাষায় 'সর্বসংকল্প-সন্ন্যাসী', 'সর্বারম্ভপরিত্যাগী' হতে হবে।

তাহলে কি নিশ্চেষ্ট, পুরুষকারবিহীন, জড়পিণ্ডে পরিণত হতে হবে? —না, তাও নয়। পুরুষকার থাকবে, উদ্যম থাকবে, কর্মও করতে হবে—কিন্তু সেই সঙ্গে থাকবে সম্পূর্ণ নির্ভর, আত্মসমর্পণ, Total Resignation। সংকল্প ছাড়া, পরিকল্পনা ছাড়া কাজ হয় না—এ আমরা সকলেই

বুঝি। কিন্তু শরণাগতিতে কর্ম হবে সংকল্পশূন্য। যেমন স্বামী বিবেকানন্দ পত্রাবলীতে কয়েকবারই বলেছেন, 'আমি মতলব করে কোন কাজ করিনি।'

সাধারণ মানুষ অহংবোধে নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা পরিপূরণের জন্যে সংকল্প করে, উদ্যোগী হয়, কর্ম করে—কিন্তু তার বন্ধন বেড়ে চলে। যে শরণাগত তাকেও কর্ম করতে হয়, প্রচেষ্টা চালাতে হয়, স্বাভাবিক নিয়মে চলতে হয়—তবে তার আছে বিশেষ কর্ম-কৌশল বা কর্ম-রহস্য যাকে অবলম্বন করে তার শরণাগতি সফল ও সার্থক হয়ে ওঠে। তাতে তার বন্ধন শিথিল হতে থাকে—ক্রমে মুক্তি বা পরমপদ লাভ করতে পারে।

এই নির্ভরতা ও ইচ্ছা-লয় ছাড়াও শরণাগতির আর একটি দিক আছে।

স্বামী বিবেকানন্দ পরিব্রাজক অবস্থায় যখন মাদ্রাজ অঞ্চলে এলেন তখন তাঁর অনুরাগী যুবকগণ তাঁকে বিশ্বধর্ম সম্মেলনে আমেরিকা পাঠাবার প্রস্তাব দিলেন এবং সেজন্য যুবকগণ অর্থাদি সংগ্রহ করতে আরম্ভ করলেন। প্রথমে তিনি ততটা আগ্রহ দেখান নি, আবার যুবকদের নিষেধও করেন নি। যুবকরা উৎসাহভরে কিছু টাকা পয়সা সংগ্রহ করেছিল। কিন্তু কিছুদিন পর স্বামীজী তাদের জানালেন যে তাঁর আমেরিকা যাওয়া হবে না, তারা যেন সংগৃহীত অর্থ গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়।

যুবকগণ তাই করলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে তারা স্বামীজীকে ধরলেন যে ভারতের এই ধর্ম ও দর্শনের কথা বলার জন্যে তাঁকে বিশ্বধর্ম সম্মেলনে যেতেই হবে। তারা আবার অর্থসংগ্রহে লিপ্ত হলো। স্বামীজী নিজে কিছুই স্থির করতে পারছিলেন না যে তিনি কী করবেন। তবে একটি ঘটনায় স্বামীজী শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছ থেকে বিদেশ যাওয়ার অনুমোদন ইঙ্গিতে লাভ করলেন। স্বামীজী একদিন স্বপ্নে দেখলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সমুদ্রের ওপর দিয়ে অনেকদূর এগিয়ে চলেছেন এবং স্বামীজীকে ইঙ্গিতে আহ্বান করছেন, স্বামীজীও যেন তাঁকে অনুসরণ করেন। তবুও স্বামীজী মন-স্থির করতে পারছিলেন না।

তিনি মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় শ্রীশ্রীসারদা মায়ের নিকট এই অবস্থায় কী করা উচিত, তাঁর মতামত জানাতে ও অনুমতি দিতে চিঠি দিলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে বিদেশ যাওয়া, বিশেষ করে সমুদ্র পার হওয়ার ব্যাপারে হিন্দুদের মধ্যে যে নিষেধের বাধা তখন বর্তমান তার ফলে শ্রীশ্রীমায়ের অনুমতি পাওয়া যাবে না। কিন্তু কয়েকদিন পরেই মায়ের অনুমোদন, অনুমতি ও আশীর্বাদ এল।

এই দুইভাবে বিদেশ যাওয়ার অনুমোদন ও ইঙ্গিত পেয়ে স্বামীজী সিদ্ধান্ত করলেন যে তিনি আমেরিকা যাবেন। যুবকগণ তাঁর সিদ্ধান্ত জেনে আরও উৎসাহিত হয়ে উঠল। আর এই সময় রাজপুতানার খেতরির রাজা অজিত সিং-এর দূত জগমোহনও এসে হাজির হলেন, স্বামীজীকে আমেরিকা যাত্রাপথে খেতরি নিয়ে যাবার জন্যে।

এখানে আমরা দেখতে পাই, স্বামীজী আমেরিকা যাওয়ার ব্যাপারে একবার এগুচ্ছেন, একবার পেছুচ্ছেন—কর্তব্য নির্ণয় করতে পারছেন না বা স্থির সিদ্ধান্ত করতে পারছেন না। তিনি যেন ঠাকুরের কী ইচ্ছা জানবার চেষ্টা করছেন, নিজের ইচ্ছায় সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন না। যখন সে ইঙ্গিত এল, তখনই সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁর শরণাগতির ফলস্বরূপ স্বামীজী যে ইঙ্গিত লাভ করলেন তাতেই তাঁর সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হলো।

বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার আমেরিকা ভ্রমণকালে ভগিনী নিবেদিতা লিখছেন (স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি)—'অতঃপর কোথায় কার্য আরম্ভ করিতে হইবে এই বিষয়ে ভগবানের ইঙ্গিতের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, আর এই ইঙ্গিত যে আসিবেই ইহা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।'

কোনো সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে স্বামীজী নিজের বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে, ভালো মন্দ নানাদিক বিচার করে অগ্রসর হতেন না, তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুভব করার চেষ্টা করতেন কোনো ইঙ্গিত বা প্রেরণায়। তিনি শরণাগত অবস্থায় ছিলেন বলেই নিজের ইচ্ছা দ্বারা প্রেরিত হয়ে কোনো কাজ করতেন না।

কিন্তু সাধারণ মানুষকে প্রায় প্রতিদিন নানা বিষয়ে নানারকম কর্তব্য বা

অকর্তব্য নির্ণয় করতে হয় বা সিদ্ধান্ত নিতে হয়। নিজেদের বিচার বুদ্ধি সহায়ে বিবেচনা করে, কখনও অপরের বা বিচক্ষণ ব্যক্তির বুদ্ধি পরামর্শ নিয়ে মানুষ কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। কখনও এমন জরুরী অবস্থা আসে যে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, নতুবা বিষম ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা থাকতে পারে। যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফল শুভও হতে পারে, অশুভও হতে পারে। শুভ ফল হলে নিজের অহমিকা প্রকাশ পেতে পারে, অথবা বলতে পারি, ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই হয়েছে। অশুভ ফল হলে দুঃখ হয়, অনেক আপসোষ হয় ঐরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে। নৈরাশ্যও এসে যেতে পারে।

এটা করব কি ওটা করব, ওখানে যাব কি যাব না, ওই কাজটা করা উচিত কি উচিত নয়, প্রভৃতি ব্যাপারে কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয় যে নিত্যকার ঘটনা তার পেছনে ঈশ্বরের কী ইচ্ছা—সাধারণ মানুষের বোঝবার কোনো উপায় আছে কি? যে শরণাগত তার তো প্রতি কর্মে প্রতি বিষয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুধাবন করে চলাই তো উচিত। কাজেই 'শরণাগত হয়ে থাকা'র মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রশ্নটি বিশেষভাবেই আসে। এই কর্তব্য-কর্তব্য নির্ণয়ের রহস্যটি জানতে পারলে শরণাগতিও ঠিক ঠিক হয় বলে ধারণা হয়।

তাই শরণাগতির এই তিনটি দিক—(১) নির্ভরতা বা সমর্পণ, (২) ইচ্ছা-লয় ও (৩) কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয়। শরণাগতির সাধন বলতে এই বিষয়গুলো নিয়ে সাধনার কথা—আমাদের মনে রাখতে হবে।

৩

শাস্ত্রবাক্য ও আপ্তবাক্য

শরণাগতি সম্বন্ধে বিভিন্ন শাস্ত্রে কিছু কিছু বর্ণনা আছে। মহাপুরুষ, মনীষী ও সাধকগণ শরণাগতি সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিয়েছেন। এ সব শাস্ত্রীয় উক্তি ও মনীষীদের বাণী বিচার করলে সাধনার দিক থেকে শরণাগতির প্রয়োজনীয়তা এবং সাধকের দৃষ্টিতে শরণাগতির মূল্য বিশেষভাবে অনুধাবন করতে পারা যায়। এ অধ্যায়ে তার কিছু কিছু উল্লেখ করা হলো। শরণাগতির কথা শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে পাওয়া যায়—'যিনি সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে বেদসমূহ প্রদান করিয়াছিলেন, মোক্ষলাভের ইচ্ছায় আমি আত্মাবিষয়ক বুদ্ধির প্রকাশক সেই জ্যোতির্ময় পুরুষের শরণ গ্রহণ করিতেছি।' (৬।১৮)

প্রাচীনতম উপনিষদ সমূহে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা ব্রহ্ম-উপলব্ধির সাধনার কথা পাই, ক্রমে পরে ব্রহ্মের শরণ গ্রহণের দ্বারাও সাধনার ইঙ্গিত এইরূপে দেখা যায়।

অন্যতম ভক্তিশাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—

হে উদ্ধব, যদি ব্রহ্মে নিশ্চল মন ধারণে অশক্ত হও, তাহা হইলে ফল কামনা-রহিত হইয়া নিত্য নৈমিত্তিক কর্মসমূহ আমাতে সমর্পণপূর্বক আচরণ করিবে। (১১।১১।১২)

হে উদ্ধব, তুমি শ্রুতি, স্মৃতি, বিধি, নিষেধ, শ্রোতব্য ও শ্রুত বিষয় ত্যাগ করিয়া সকল প্রাণিগণের অন্তর্যামী আমারই সর্বাত্মভাবে শরণাগত হও। তাহা হইলে আমা কর্তৃক তুমি সর্বত্র নির্ভয় হইবে। (১১।১২।২৫)

নিমি রাজাকে কবি বলিলেন, দেহ বাক্য মন ইন্দ্রিয় বুদ্ধি চিত্ত এমন কি স্বীয় সংসার বা স্বভাব অনুসারেও যে যে কর্ম সাধিত হয়, সমস্তই পরাৎপর

সমর্পণ করা বিধেয়। (১১।৩)

যে সাধু ব্যক্তির চিত্ত ভগবান নারায়ণে সমর্পিত, তিনি ইন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা ভোগ্য শব্দ স্পর্শাদি বিষয় উপভোগ করিয়াও বিষয়নিষ্ঠ সুখ বা দুঃখে আনন্দিত ও বিষণ্ণ হন না, যাবতীয় সুখ-দুঃখাদির ব্যাপার এক বিষ্ণু-মায়ারূপে নির্ধারিত করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, তিনিই উত্তম ভাগবত। (১১।২।৪৮)

শ্রীমদ্ভাগবতে প্রহ্লাদ কর্তৃক ব্যাখ্যাত নববিধা ভক্তির কথা বলা হয়েছে—শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন। এই আত্মনিবেদনই শরণাগতি। আত্মনিবেদন সম্বন্ধে বলা হয়েছে—'দেহ হইতে শুদ্ধ আত্মা পর্যন্ত সর্বতোভাবে ভগবানে অর্পণই আত্মনিবেদন লক্ষণ ভক্তি। আত্মনিবেদনে কেবল ভগবানের কার্য—নিজের জন্য আর কোন কার্যই অবশিষ্ট থাকে না। এই আত্মনিবেদন সর্বাত্ম-দানে—যেমন দেখা যায় বলিরাজের আত্মনিবেদন। দাস্যমিশ্রিত ভাবে হনুমানের ও মহারাজ অম্বরীষের। সখ্যভাবে অর্জুন ও স্তবস্তুতিতে অক্রূরমুনি। স্মরণ মনন নাম-কীর্তনে ঠাকুর হরিদাস। স্মরণে ও আত্মসমর্পণে দ্রৌপদী। স্মরণ, মননসহ আত্মসমর্পণে ভক্ত প্রহ্লাদ।'

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শরণাগতি সম্বন্ধে অনেক কথা পাওয়া যায়—

হে পার্থ, কিন্তু যাঁহারা সমুদয় কর্ম আমাতে অর্পণ করেন, একমাত্র আমাতেই চিত্ত সমাহিত করেন ও ধ্যানপরায়ণ হয়ে আমার উপাসনা করেন, আমাতে অর্পিত সেই ব্যক্তিগণকে আমি মৃত্যুময় অনিত্য সংসার-সাগর হইতে অচিরে উদ্ধার করি। (১২।৬-৭)

হে ভারত, সর্বতোভাবে অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে তাঁহারই শরণাগত হও। তাঁহার প্রসাদে তুমি পরমা শান্তি ও শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হইবে। (১৮।৬২)

ভগবদ্গীতায় শরণাগতির বিষয় সম্পর্কে স্বামী তুরীয়ানন্দ বলেছেন (পত্রাবলী), '…গীতা পাঠ করিয়া ইহাই বোঝা যায় যে, সমুদয় ভগবানে সমর্পণ—এই হচ্ছে গীতার নিশ্চিত শিক্ষা।…ভগবানে আত্মসমর্পণ—নিজ অহং-অভিমান সম্পূর্ণ ত্যাগ—এই-ই হচ্ছে গীতার সারমর্ম। ইহাই

আমার অভিমত।...'

গীতাকে 'শরণাগতি শাস্ত্র' উল্লেখ করে বলা হয়েছে— '...ভক্তির কথা বলতে গিয়ে আর একটা নূতন চিন্তাধারার মধ্যে গিয়ে গীতা পৌঁছেছেন। সেটা হচ্ছে 'প্রপত্তি'। প্রপত্তি হচ্ছে শরণাগতি—ভগবানের শরণ নেওয়া সর্বতোভাবে। এই প্রপত্তির কথা গীতায় সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। শুরুতেই অর্জুন বলেছেন, 'শিষ্যস্তেঽহং সাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্'—আমি তোমার শিষ্য, তোমার প্রপন্ন—তোমার শরণাগত, আমাকে উপদেশ দাও।

'গীতার শেষে ভগবানও অর্জুনকে বলছেন, 'ত্বমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত'—হে অর্জুন, তুমি সর্বতোভাবে তাঁরই—সেই ঈশ্বরেরই শরণাগত হও। 'সর্বধর্মান্ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'—সর্ব ধর্মাধর্ম ছেড়ে একমাত্র আমারই শরণ নাও। আর গীতার মধ্যেও বহুবার এই প্রপত্তির কথা এসেছে। যেমন—'নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ'—ভগবান সকলের আশ্রয়, সকলেরই শরণ্য ও মঙ্গলকারী।

'আবার প্রপন্ন ভক্তকে কীভাবে প্রার্থনা করতে হবে, তাও ভগবান শেখাচ্ছেন, 'তমো চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী'—আমি সেই আদি পুরুষের শরণ নিচ্ছি, যিনি এই অনাদি সংসার প্রবাহের উৎস।

'এই যে প্রপত্তি, এটিও একটি নূতন চিন্তাধারা যা গীতার মধ্যে আমরা পাই। আদিতে, মধ্যে ও অন্তে শরণাগতির কথা থাকায় অনেকে গীতাকে শরণাগতি-শাস্ত্র বলেন।'*

'অর্জুনের একটি প্রশ্নের উত্তরে যেমন দাঁড়িয়ে আছে গীতা, তেমনি মহারাজ পরীক্ষিতের একটি প্রশ্নের উত্তরে দাঁড়িয়ে আছে মহান ও বিশাল মহাগ্রন্থ ভাগবত। পরীক্ষিত মৃত্যু আসন্ন জেনেই প্রশ্ন করেছিলেন শুকদেবকে: হে মহাভাগ, কীভাবে আমি বিষয়সঙ্গরহিত মনকে অখিল বিশ্বের পরমাত্মাস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করে নিজ দেহ বিসর্জন দিতে পারি তার

উপায়টি আমায় বলে দিন।' (দেশ, ৫৩-৯, অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)।
শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রেও এইভাবে ভক্তির সঙ্গে শরণাগতির ভাবটিও উজ্জ্বল-ভাবে প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মেধস্ ঋষি মহারাজ সুরথকে বলছেন, 'হে মহারাজ, সেই পরমেশ্বরীর শরণাপন্ন হও। তিনিই আরাধিতা হলে মনুষ্যগণকে ঐহিক ভোগ, স্বর্গ ও মুক্তি প্রদান করেন।' (১৩।৫)

শ্রীশ্রীচণ্ডীর দেবীকবচে আছে (৬-৮)—'যারা অগ্নিদ্বারা দহ্যমান, রণক্ষেত্রে শত্রুমধ্যে পতিত অথবা বিষম সংকটে ভীত হয়ে দেবীর শরণাগত হয়, তাদের রণ-সংকটে কোনও অমঙ্গল ঘটে না এবং তারা শোকদুঃখময় ভীষণ বিপদ দর্শন করে না।

পাতঞ্জল যোগদর্শনে যোগের ৮টি অঙ্গ বা সোপান রয়েছে, তার মধ্যে দ্বিতীয়টি হলো 'নিয়ম'। নিয়ম অর্থে নিয়মিত অভ্যাস ও ব্রতপালন। নিয়ম পাঁচটি—তপঃ, স্বাধ্যায়, সন্তোষ, শৌচ ও ঈশ্বর-প্রণিধান। এই ঈশ্বর-প্রণিধান বলতে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ বুঝায়। এই যোগের সাধন-পাদ অংশে প্রথমেই বলা হয়েছে—তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধানকে 'ক্রিয়াযোগ' বলে। স্বামী বিবেকানন্দ ক্রিয়াযোগের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন (রাজযোগ)—'···ক্রিয়াযোগ শব্দের আক্ষরিক অর্থ—কর্মদ্বারা যোগের দিকে অগ্রসর হওয়া।···ঈশ্বর-প্রণিধান বা ঈশ্বরে কর্মফল-অর্পণ অর্থে কর্মের জন্য নিজে কোনরূপ প্রশংসা বা নিন্দা দ্বারা প্রভাবিত না হইয়া দুইটিই ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া শান্তিতে অবস্থান করা বুঝায়।'

এই যোগদর্শনে সমাধিপাদ অংশে 'সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ' প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—'ঋষি বলিলেন, ঈশ্বর-প্রণিধান হইতে সমাধিসিদ্ধি হয়। ···ঈশ্বরে সম্যক আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে, তাহা হইতেই সমাধিসিদ্ধি হইয়া থাকে অর্থাৎ চিত্তের সমাধি-পরিণামরূপ সম্প্রজ্ঞাত যোগের আসন্নতম লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে।

'···যাহারা সত্যসত্যই ঈশ্বর-প্রণিধান-যোগী অর্থাৎ আত্মসমর্পণ-যোগী, তাঁহারা ঈশ্বর কৃপায়ই চিত্তের সমাধি-পরিণামরূপ অবস্থায় উপনীত হইতে

পারেন।···সর্ব কর্মের মধ্য দিয়া সকল অবস্থার মধ্য দিয়া তুমি প্রিয়তমের সহিত যুক্ত হইতে চেষ্টা করিবে, ইহাই ঈশ্বর-প্রণিধান, ইহাই সমাধি-সিদ্ধির হেতু।'*

রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে শরণাগতির একটি বিশেষ স্থান আছে। 'বেদার্থ সংগ্রহে' এ বিষয়ে বর্ণনা আছে। শরণাগতিকে এখানে বলা হয়েছে প্রপত্তি। শ্রীভাষ্যে তিনি বলেছেন, '···এবংবিধ বন্ধনের নিবৃত্তি একমাত্র ভক্তিরূপ শরণাগত উপাসনার দ্বারা পরিতুষ্ট পরম পুরুষের প্রসাদেরই দ্বারা লভ্য।'

নারদপঞ্চরাত্রে প্রপত্তি সম্বন্ধে বিশেষভাবে বর্ণনা আছে। অন্যান্য পাঞ্চরাত্র সংহিতায়ও শরণাগতি একটি বিশেষ সাধন পদ্ধতি হিসাবে বর্ণিত হয়েছে।

বৌদ্ধধর্মে ত্রি-শরণ-গমন বিধি রয়েছে। বৌদ্ধমতে প্রব্রজ্যা গ্রহণেচ্ছু শ্রমণ, উপসম্পদা গ্রহণেচ্ছু ভিক্ষু অথবা গৃহী উপাসকের ত্রি-শরণ-গমন এক বিশেষ রীতি বা দীক্ষা। সে মন্ত্র হলো—'বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, ধর্মং সরণং গচ্ছামি, সংঘং সরণং গচ্ছামি।'

গৃহী উপাসক বুদ্ধদেবের নিকট গিয়ে বলতেন, 'হে গৌতম! আমি আপনার শরণাগত হইতেছি, ধর্মের শরণাগত হইতেছি, ভিক্ষু সংঘের শরণাগত হইতেছি। হে গৌতম! আপনি আমাকে উপাসক বলিয়া আজ হইতে আজীবন শরণাগত হিসাবে অবধারণ করুন।' প্রব্রজ্যা বা উপসম্পদা (প্রব্রজ্যার পরবর্তী স্তর) গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তি ঐরূপ বলার শেষে বলতেন, 'প্রভো! ভগবানের নিকট আমি প্রব্রজ্যা লাভ করিব, উপ-সম্পদা লাভ করিব।'**

বুদ্ধদেবের জীবনকালের পরে ত্রিশরণ-গমন পদ্ধতিতে 'বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ গ্রহণ'—এই রূপ নেয়। শরণ গ্রহণ দ্বারা বৌদ্ধমতে দীক্ষার প্রধান শপথ গ্রহণ।

মহাভারতে অনেক স্থলেই শরণাগতির কথা আছে। যেমন—'তাঁহারই

* যোগেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

** ত্রিরত্ন ও বৌদ্ধ শরণাগতি—বেণীমাধব বড়ুয়া

প্রসাদে সর্বজগৎ সুখ লাভ করে এবং তিনিই সর্বজগতের শরণ্য।' 'যাহারা সর্বভাবানুগত হইয়া মহেশ্বরের শরণ গ্রহণ করে (প্রপদ্যন্তে), প্রপন্নবৎসল দেব তাহাদিগকে সংসার হইতে মুক্ত করেন।' ইত্যাদি*

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আচার্য যামুন 'গীতার্থসংগ্রহে' বলেছেন, 'ভক্তির চরম অভিব্যক্তি প্রপত্তি বা শরণাগতি। আত্মসমর্পণেই অর্থাৎ অহন্তামমতাকে বা যাহা 'আমি' এবং যাহা কিছু 'আমার' তৎসমস্তকে ভগবানে সমর্পণেই শরণাগতির পরিপূর্ণতা।' যামুন বলেন, 'ভগবানের স্বরূপ প্রকৃতি (বা মায়া) দ্বারা তিরোহিত আছে। শরণাগতি দ্বারা সেই তিরোধানের নিবৃত্তি হয়।'*

ঈশানুশরণে ভগবান বলেছেন, 'আমিই একমাত্র সর্ববিষয়ের দাতা। সুতরাং আমি চাই—তুমি সর্ববিষয় আমাকেই সমর্পণ কর।

'ঈশ্বরই যে সকল বিষয়ের মূল তাহা মনে রাখিবে। সুতরাং সকলের মূল আমাকেই পুনরায় সব সমর্পণ করিতে হইবে।

'আমিই সব দান করিয়াছি, এবং তুমি পুনরায় সেই সব আমাকে অর্পণ কর—ইহাই আমি ইচ্ছা করি। এবং এই কারণে অত্যন্ত কঠোরভাবেই আমি তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা আশা করি।' (৩।৯।১-২)**

ভগবান যীশুখৃস্টের একটি বিশেষ বাণী—'Let Thy will be done (তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক)। খৃস্টধর্মাবলম্বীদের মতে, মনুষ্যমাত্রই জন্মাবধি পাপী। 'যে খৃস্টের শরণাগত হইয়া তাঁহার প্রবর্তিত ধর্ম ও সংঘের আশ্রয় লইবে, শেষ বিচারের দিনে সে পাপমুক্ত বলিয়া গৃহীত হইবে, তাহাকে আর পাপের শাস্তি ভোগ করিতে হইবে না, সে চিরকাল ধরিয়া স্বর্গে (Kingdom of Heaven) বাস করিবে। মানুষের এই পাপমোচন ও স্বর্গপ্রাপ্তির প্রধান উপায় ঈশ্বরের কৃপা। যে অনুতপ্ত চিত্তে কৃপার ভিখারী হইয়া করুণাময় ত্রাণকর্তা খৃস্টের শরণাপন্ন হয়, সেই পরিত্রাণ পায়।'

* ভাগবতধর্মের প্রাচীন ইতিহাস—স্বামী বিদ্যারণ্য।

** ঈশানুশরণ—অনুবাদ স্বামী সচ্চিদানন্দ।

হজরত মহম্মদ তাঁর শিষ্যদের প্রায়ই বলতেন যে তাঁর সকল কাজের উৎস হচ্ছে আল্লার মরজি। 'মুসলমান শব্দটির অর্থই হল আত্মসমর্পণকারী, যে ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।'

নারদীয় ভক্তিসূত্রে শরণাগতি সম্বন্ধে বলা হয়েছে—'ঐকান্তিক ভক্তির অর্থ—অন্য সকল আশ্রয় ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করা।'

'তোমার সকল কর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ কর, কাম ক্রোধ অভিমান প্রভৃতি তোমার সকল রিপুকে ঈশ্বরাভিমুখী কর।' (১।১০, ৮।৬৫)

মধুসূদন সরস্বতী তাঁর গীতায় টীকায় বলেছেন, 'ঈশ্বরই সর্বনিয়ন্তা— তিনি অন্তর্যামীরূপে প্রেরক। তিনি আমাদিগকে যন্ত্রের ন্যায় চালিত করিতেছেন, ইহা বুঝিতে পারিয়া সর্বভাবে তাঁহার শরণাগত হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য। বুদ্ধির সার্থকতা এবং চরম উৎকর্ষ হইল এই উপলব্ধিতে। ঈশ্বরই যে সর্বকর্তা, সর্বনিয়ামক, ইহা বুঝিতে পারিলেই বুদ্ধির যাহা কিছু কর্তব্য তাহা শেষ হয়।···একমাত্র ভগবানকে আশ্রয় করিলে সর্বধর্মের যাহা প্রয়োজন তাহাও সিদ্ধ হইবে। সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে সকল ধর্মের অনুষ্ঠান নিষ্প্রয়োজন।'

তিনি আরো বলেছেন, 'ঈশ্বরশরণতাই সকল শাস্ত্রের পরম রহস্য। ঈশ্বর-শরণতা বিধান করাই সকল শাস্ত্রের পরম তাৎপর্য।·· সন্ন্যাসের ফল যে মোক্ষ তাহা ভগবৎ-শরণাগতিতে পর্যবসিত।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর সাধনার সময়ে তিনবার ইষ্টদেবীর নিকট থেকে নির্দেশ পেয়েছিলেন, 'তুই ভাবমুখে থাক।' পরবর্তীকালে তিনি অখণ্ড ও খণ্ডের মাঝে সাধারণ ভূমির ঊর্ধ্বে ভাবের রাজ্যে অবস্থান করে মুখ্যত ঈশ্বরীয় ভাব ভক্তি নিয়ে ও ভক্তদের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলে এক অমানবীয় জীবনধারার সাক্ষ্য রেখে গেছেন।

তিনি ছিলেন মায়ের শিশু সন্তান। মা ছাড়া কিছু বুঝতেন না, মায়ের আদেশ না নিয়ে কোনো কাজ করতেন না। তিনি ভক্তি ও ভক্ত নিয়ে ছিলেন। তবে তাঁর ভক্তিতে শরণাগতির ভাবই ছিল প্রকট। তোতাপুরী যখন বেদান্ত সাধনার কথা বললেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তখনই মন্দিরে গেলেন,

মায়ের কী ইচ্ছা জানবার জন্যে। দক্ষিণেশ্বরে পূজক হলধারী একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট বর্ণনা করে বলেন যে মা কালী হলেন 'তামসী দেবী'। এই ইষ্ট-নিন্দা শুনে তাঁর মন ব্যথিত হলো। তিনি তখন কালীমন্দিরে গিয়ে মাকে কেঁদে কেঁদে বললেন, 'মা, হলধারী শাস্ত্র-জানা পণ্ডিত, সে তোকে তমোগুণময়ী বলে। তুই কি সত্যিই তাই?' মায়ের মুখে মার তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হয়ে ঠাকুর আনন্দে হলধারীর কাছে ছুটে গেলেন এবং ভাবাবেগে তাঁর কাঁধে বসে উত্তেজিত ভাবে বললেন, 'তুই মাকে তামসী বলিস? মা কি তামসী? মা যে ত্রিগুণময়ী আবার শুদ্ধসত্ত্বগুণময়ী।'

নরেন্দ্রনাথ একদিন শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেছিলেন, 'তুমি ঈশ্বরের রূপটুপ যা দেখ, ও মনের ভুল।' শ্রীরামকৃষ্ণ তখন মার কাছে গিয়ে কাঁদতে লাগলেন, 'মা, এ কী হলো! এ সব কি মিছে? নরেন্দ্র যে এমন কথা বলছে।' মা তখন সব দেখিয়ে দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন নরেন্দ্রনাথকে গিয়ে অভিমান ভরে বললেন, 'শালা, তুই আমায় অবিশ্বাস করে দিছলি। তুই আর আসিস নাই!'

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—'আমি বলি উপায় থাকবে না কেন? তাঁর শরণাগত হও, আর ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর, যাতে অনুকূল হাওয়া বয়, যাতে শুভ যোগ ঘটে।···ঈশ্বরের শরণাগত হয়ে তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাকলে, তিনি শুনবেনই শুনবেন—সব সুযোগ করে দেবেন।

'কী করবে? তাঁর পদে সব সমর্পণ কর। তাঁকে আমমোক্তারি দাও। তিনি যা ভাল হয় করুন।

'তাঁকে কি বিচার করে জানা যায়? তাঁর দাস হয়ে তাঁর শরণাগত হয়ে তাঁকে ডাক।

'আমি জানি। তিনি সাকার নিরাকার দুইই। আরও কত কী হতে পারেন। তিনি সবই হতে পারেন। সেই চিৎশক্তি, সেই মহামায়া চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়ে রয়েছেন। সেই চিৎশক্তির, সেই মহামায়ার শরণাগত হতে হয়।'

স্বামী বিবেকানন্দ শরণাগতি সম্বন্ধে বলেছেন, (বাণী ও রচনা, ৪র্থ)—

'যিনি একবার এই অবস্থার (সর্বব্যাপক প্রেমের) আস্বাদ পাইয়াছেন, তাঁহার নিকট এই প্রিয়তম প্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ—জগতের সমুদয় ধন, প্রভুত্ব, এমনকি মানুষ যতদূর মান যশ ও ভোগসুখের আশা করতে পারে, তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীত হয়। ভগবানে নির্ভরজনিত 'এই শান্তি আমাদের বুদ্ধির অতীত' ও অমূল্য। আত্মসমর্পণ হইতে এই অপ্রাতিকূল্য অবস্থা লাভ হইলে সাধকের আর কোন স্বার্থ থাকে না।'

দেববাণী-তে স্বামীজী বলেছেন, 'এমন কোন মহাত্মার শরণাগত হও, যিনি নিজের বন্ধন ছিন্ন করেছেন, কালে তিনিই কৃপাবশে তোমায় মুক্ত করে দেবেন। ঈশ্বরের শরণাগত হওয়া এর চেয়ে উচ্চ ভাব, কিন্তু অতি কঠিন। ···কিছু অনুভব করো না, কিছু জেনো না, কিছু করো না, নিজের বলে কিছু দেখো না—সব কিছু ঈশ্বরে সমর্পণ কর আর সর্বান্তঃকরণে বলো. তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক।'

'আমরা বদ্ধ—এই ভাব আমাদের স্বপ্নমাত্র। জেগে ওঠ, বন্ধন চলে যাক। ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও, এই মায়া-মরু অতিক্রম করবার এই একমাত্র উপায়। ··যাঁরা ঈশ্বরে সমর্পণ করেছেন, তাঁরা তথাকথিত কর্মীদের চেয়ে জগতের জন্য অনেক বেশী কাজ করেন। আপনাকে সম্পূর্ণ শুদ্ধ করেছে, এমন একজন লোক হাজার ধর্মপ্রচারকের চেয়ে বেশী কাজ করে।'

স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলেছেন (ধর্মপ্রসঙ্গে—কথোপকথন)—'শরণাগত শরণাগত শরণাগত। এ ছাড়া আর গতি নেই। কলির জীব অন্নগত প্রাণ, অল্পায়ু। অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কাজ করতে হবে। সেই শক্তি সামর্থ্য ত্যাগ তপস্যা ও সাহস নেই, মন দুর্বল, কাজেই ভোগাসক্তি বেশী। তা সত্ত্বেও কিন্তু ভগবানকে পেতে হবে, তা না হলে এ জীবনটা বৃথা গেল, কেবল আসা যাওয়া সার হলো। তাঁর শরণাগত হয়ে পড়ে থাকা ছাড়া এ যুগে সহজ রাস্তা আর নেই।'

স্বামী শিবানন্দ বলেন (শিবানন্দ-বাণী)—'তাই তো ছেলেদের বলি, যখন এখানে সেখানে যাবার গোঁ ধরে, বাবারা সব কোথায় ছুটাছুটি করে বেড়াবে? শরণাগত হয়ে ঠাকুরের দুয়ারে পড়ে থাক, আর কিছুই করতে

হবে না। চাই কেবল আন্তরিক শরণাগতি। আমরাও সব শরণাগত হয়ে পড়ে আছি। আমাদের তিনি কৃপা করে খুব দিয়েছেন, আজো দিচ্ছেন।'

স্বামী তুরীয়ানন্দ পত্রাবলীতে বলেছেন, 'তাঁহার শরণাগত হইয়া কর্ম করিলে এই মায়া অপগত হয়। কর্তা বোঝে যে, সে কর্তা নহে—যন্ত্র মাত্র। ইহারই নাম করিয়াও না করা, ইহাই অকর্তানুভূতি। ইহাই জীবন্মুক্তি।'

শ্রীঅরবিন্দ সমর্পণ সম্বন্ধে বলেছেন (পত্রাবলী)—'যদি মায়ের উপর শুদ্ধ প্রেম ও ভক্তি থাকে, নির্ভর থাকে, তা হলে মাকে পাওয়া যায়। না থাকলে তীব্র চেষ্টা দ্বারাও পাওয়া যায় না।···মায়ের উপর শান্ত সরল-ভাবে নির্ভর কর, বাধাকে ভয় না করে মায়ের শক্তিকে তোমার ভিতর ডাক—যা পেয়েছ সে সব তোমার ভিতরে আছে, নূতন উন্নতিও হবে।

'সমর্পণ সম্পূর্ণ করতে সময় লাগে—যেখানে দেখছ হয় নি, সেখানটাও সমর্পণ কর—এইরূপ করতে করতে শেষে সম্পূর্ণ হবে।···শান্তভাবে সমর্পণ করতে করতে চল, পুরাতন সবের যে রূপান্তর দরকার তা ক্রমে ক্রমে হয়ে যাবে।

'সব সময় মায়ের উপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখতে হয় যে তাঁরই হাতে আছি। তাঁর শক্তিতে সব হবে, তাহলে বাধার জন্য দুঃখ বা নিরাশা আসতে পারবে না।···সাধনা করতে হয় দৃঢ় শান্ত মনে, মায়ের উপর অটুট শ্রদ্ধা ও নির্ভরতা রেখে।'

স্বামী বিরজানন্দ বলেছেন, '[তথাকথিত বুদ্ধিমন্তরা] নিজেদের নির্বুদ্ধিতা, অকর্মণ্যাদি যত দোষ-ত্রুটি তাঁর (ঈশ্বরের) ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে খালাস। কোন কাজ নিজেদের দোষে বা চেষ্টার অভাবে বিফল হলে বলেন, 'তাঁর ইচ্ছা নয়।' আর যেটা করার ভারি ঝোঁক, করে ফেলে পস্তান আর বলেন, 'ঈশ্বরেচ্ছায় হয়েছে।' পরমেশ্বর কী ইচ্ছা করছেন না করছেন, তাঁরা সব জেনে ফেলে দিয়েছেন! তাহলে তাঁরা তো কেউ-কেটা নন—সর্বজ্ঞেরও মর্মজ্ঞ! তাঁরা এও বলেন, 'বে করে সংসারী হওয়াই ভগবানের অভিপ্রেত, সকলে সাধু হয়ে গেলে সৃষ্টিরক্ষা হবে কী করে?' যেন জগত-

সুদ্ধ লোক সাধু হবার জন্য ছুটছে!

'আমরা কথায় কথায় যে 'ঈশ্বরের ইচ্ছা' বলি ও ঈশ্বরের দোহাই দিই, সেটা ফাঁকা আওয়াজ মাত্র। যেমন ছোট ছেলেমেয়েরা বলে, 'মাইরি, ঈশ্বরের দিব্যি!' 'ঈশ্বরেচ্ছা' বোধ তারই ঠিক হয় ও ঐ ভাবের কথা বলা তার মুখেই সাজে, যে সম্পূর্ণরূপে ভগবানে আত্মসমর্পণ করেছে। যে জানে 'আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী', যার নিজের ভাল-মন্দ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা কিছুই নেই, সে নিন্দা-স্তুতিতে, লাভালাভে, সুখে-দুঃখে সমভাবাপন্ন।'

স্বামী ওঙ্কারানন্দ সৎ-প্রসঙ্গে বলেছেন, 'মানুষ তার প্রবৃত্তি অনুযায়ী সব করে—'প্রবৃত্তিরেষাং ভূতানাং নিবৃত্তেস্তু মহাবলম্'—প্রবৃত্তি মানুষের ভেতরে রয়েছে—সেটা কাজ করবেই করবে। সর্বদা দেখবেন যে, আপনি যে কোন মার্গই নিন, সঙ্গে সঙ্গে আপনার নিজস্ব প্রবৃত্তি তাকে Distort করে আপনাকে ঘুরিয়ে অভিমানে এনে ফেলবে। সেই অভিমান দূর করবেন কী উপায়ে? ভয়ানক শক্ত। এক্ষেত্রে শরণাগতি ছাড়া কোন উপায় নেই। আপনি কী বিচার করবেন? অনন্ত ঢেউ আসছে, নিরন্তর আসছে—কটা ঢেউ কাটাবেন? ঢেউ কাটাতে গেলে শরণাগতি ছাড়া উপায় নেই। তেমনি আপনার এই সব মানসিক অহংকার, এই আসক্তি, নামযশ আসবে—এ কাটানো যাবে ভগবানে শরণাগত হলে।'

ডঃ রমা চৌধুরী একটি প্রবন্ধে বলেছেন —'ভারতীয় দর্শনে পঞ্চ সাধনের কথা বলা হয়েছে—জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম, প্রপত্তি এবং গুরূসপত্তি। প্রপত্তি হল ঈশ্বরে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ এবং গুরূসপত্তি হল —গুরুতে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ। ···প্রপত্তি হল সকল সাধনার পরম ও চরম রূপ—কারণ, জ্ঞানই হোক, ভক্তিই হোক, নিষ্কাম কর্মই হোক, শেষ পর্যন্ত সকলকেই সেই একই প্রপত্তিতে পরিপূর্তি, পরিপুষ্টি, পরিসমাপ্তি ও পরিপূর্ণতা লাভ করতে হবে।'

ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ তাঁর ব্যাখ্যাত শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার ভূমিকায় বলেছেন (অনুঃ শুভেন্দ্র মিত্র)—'সনৎ সুজাতীয়'র উপর ভাষ্যে শংকরাচার্য বলেছেন, 'জ্ঞানদ্বারা মোক্ষলাভ হয়, কিন্তু অন্তর পবিত্র না হলে জ্ঞানোদয়

হয় না। অতএব অন্তর শুদ্ধ করার জন্য শ্রুতি ও স্মৃতি বিহিত সমস্ত কর্ম কায়মনোবাক্যে পরমেশ্বরে নিবেদন করা উচিত।' এইভাবে কর্মে প্রবৃত্ত হলে তা যজ্ঞের সমান হয়। যজ্ঞ মানে ঈশ্বরের কাছে পবিত্র হওয়া। সে ত্যাগও নয়, আত্মবলিদানও নয়, স্বতঃস্ফূর্ত আত্মসমর্পণ—যে মহত্তর চেতনার আমরা সীমায়িত অংশ, তার কাছে সমর্পণ। এই প্রকার আত্ম-সমর্পণ দ্বারা মনের মালিন্য দূর হয় এবং সমর্পণকারী ঈশ্বরের শক্তি ও জ্ঞানের অংশ লাভ করে। যজ্ঞের ভাব নিয়ে যে কর্ম করা যায়। তা বন্ধনের কারণ হয় না।'

৪

শরণাগতির প্রকারভেদ

মধুসূদন সরস্বতী 'ভক্তিরসায়ন' গ্রন্থে তিন প্রকারের শরণাগতির কথা বলেছেন—(১) মৃদু শরণাগতি, (২) মধ্যম শরণাগতি, (৩) অধিমাত্র বা উত্তম শরণাগতি।

(১) মৃদু শরণাগতি—তস্যৈবাহম্। যেমন সমুদ্রেরই তরঙ্গ, তরঙ্গের সমুদ্র হয় না। তেমনি হে ঈশ্বর, আমি তোমার। তুমি আমার নও। আমি তোমারই মাত্র।

(২) মধ্যম শরণাগতি—মমৈবাসৌ। বৃন্দাবনে গোপীদের হস্তবন্ধন ছাড়িয়ে নিয়ে কৃষ্ণ দূরে সরে গেলেন, তখন গোপীরা বললে, হে কৃষ্ণ, তুমি পুরুষ। তুমি গায়ের জোরে আমাদের ছেড়ে চলে গেলে বটে কিন্তু তুমি আমাদের হৃদয় ছেড়ে কি যেতে পারবে? কারণ তুমি যে আমাদের হৃদয়ে বাঁধা—তুমি যে আমাদের। তুমিই আমার।

(৩) অধিমাত্র বা উত্তম শরণাগতি—স এবাহম্। সেখানে তুমি আমি জীব-জগত ঈশ্বর সবই এক। সেখানে সব এক হয়ে গেছে। এক আত্মায় সব আত্মা মিশে গেছে। আমিও তোমার নই, তুমিও আমার নও—আমি তুমি সবই এক।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তি, 'শিখরা বলেছিল—ঈশ্বর দয়ালু। আমি বল্লাম, তিনি আমাদের মা বাপ, তিনি আবার দয়ালু কি? ছেলেদের জন্ম দিয়ে বাপ মা লালন-পালন করবে না—তো কি বামুন পাড়ার লোকেরা এসে করবে? এ ভক্তদের ঠিক বিশ্বাস—তিনি আপনার মা, আপনার বাপ।'

শিখরা দেখছে যে ঈশ্বর আমাদের কত দয়া করছেন, আমাদের কত দিয়েছেন—আমরা ঈশ্বরের সন্তান বলেই এত দয়া করছেন। এরা প্রথম

স্তরের ভক্ত —এদের মৃদু শরণাগতি।

দ্বিতীয় স্তরের ভক্ত দেখছেন—ঈশ্বর আপনার মা, আপনার বাবা। ঈশ্বর আমার একান্ত নিজের। কাজেই তাঁর ওপর জোর খাটে, তাঁর ওপর বিশ্বাস থাকে যে প্রার্থনা করলে তিনি দেবেনই দেবেন। এদের মধ্যম শরণাগতি।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা—'হনুমান বলেছিলেন, রাম! কখনও দেখি তুমি পূর্ণ, আমি অংশ। কখনও দেখি তুমি প্রভু, আমি দাস। আর রাম, যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়—তখন দেখি তুমিই আমি, আমিই তুমি।'

'প্রহ্লাদ কখনও স্ব-স্বরূপে থাকতেন। কখনও দেখতেন, আমি একটি, তুমি একটি। তখন ভক্তিভাবে থাকতেন।'

হনুমান, প্রহ্লাদ যখন স্ব-স্বরূপে থাকতেন, যখন ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম অনুভব করতেন, তখনই হতো উত্তম শরণাগতি। নিজের ইচ্ছা, নিজের সত্তা ঈশ্বরের সঙ্গে মিশে এক হয়ে যেতো।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন অন্তরঙ্গ ভক্তদের কাছে যেন একটি গোপন কথা প্রকাশ করে বলেছেন (কথামৃত, ২।১৭।৪)—'এখানে আর কেউ নাই, তোমরা আপনার লোক, তোমাদের বলছি—শেষে এই বুঝেছি, তিনি পূর্ণ আমি তাঁর অংশ। তিনি প্রভু আমি তাঁর দাস। আবার এক একবার ভাবি, তিনিই আমি আমিই তিনি।'

'ভক্তেরা নিস্তব্ধ হইয়া এই কথাগুলি শুনিতেছেন।'

এখানে দেখা যাচ্ছে যে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন যে, ভাবে থাকেন তখন সে ভাবের অনুভূতি লাভ করেন। 'তিনি পূর্ণ আমি তাঁর অংশ', 'তিনি প্রভু আমি তাঁর দাস'—এই ভাবটির মধ্যে 'আমি তাঁর' এই মৃদু শরণাগতির অবস্থা প্রকাশ পাচ্ছে। আর 'তিনিই আমি, আমিই তিনি'—এর মধ্যে ভগবানের সঙ্গে একাত্মতা দ্বারা উত্তম শরণাগতির ভাব প্রকটিত হচ্ছে।

ভক্ত প্রহ্লাদ ও হনুমানের মধ্যেও এই দুই ভাবের শরণাগতির প্রকাশ। প্রথম অবস্থার মধ্যে ভক্তি ভাবের প্রকাশ, আর দ্বিতীয় অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতার মধ্যে জ্ঞান ভাবের প্রকাশ। এঁরা বাহ্য জগতের সঙ্গে

ব্যবহারে ভক্তিভাবে থাকেন, আর নিজেদের অন্তর জগতে জ্ঞানভাবের পূর্ণতায় অবস্থান করেন। আবার ভক্তিসাধিকা মীরাবাঈ গিরিধারীলাল কৃষ্ণকে নিজের স্বামীরূপে ভজনা করেছেন। 'তিনি আমার স্বামী' এই ভাবটি সদা তাঁর মধ্যে প্রকট ছিল। এটি মধ্যম শরণাগতি।

ভক্তিশাস্ত্রে কয়েক প্রকারের শরণাগতির কথা বলা হয়েছে। পাঞ্চরাত্র সংহিতার মধ্যে ভারদ্বজ সংহিতায় (নারদ পঞ্চরাত্র) তিন প্রকার শরণাগতির কথা আছে। কায়, মন ও বাক্য ভেদে তিন প্রকার শরণাগতি হয় —অর্থাৎ কায়িকী, বাচিকী ও মানসী শরণাগতি। (১) প্রণাম, তিলক ফোঁটা অর্থাৎ ঊর্ধ্বপুণ্ড্র-চক্রাদি ন্যাসলিঙ্গসমূহ ধারণ করা হলো কায়িকী শরণাগতি বা প্রপত্তি। (২) অর্থবোধ ছাড়া মন্ত্র, স্তবস্তুতির উচ্চারণ ও পাঠ দ্বারা হয় বাচিকী প্রপত্তি। এবং (৩) ন্যাসলিঙ্গ সমূহ ধারণ করে ও মন্ত্রের অর্থ তত্ত্বতঃ অবগত হয়ে মন্ত্র উচ্চারণ ও পাঠাদি দ্বারা সম্যকরূপে শরণাগতি হলো মানসী প্রপত্তি। এই তিন প্রপত্তিই গুরুর অধীনে থেকে গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা ও শরণাগতি রেখে করতে হয়। এখানে মানসী প্রপত্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ।*

আবার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতি ভেদে তিন প্রকারের শরণাগতির কথা বলা হয়েছে (নারদ পঞ্চরাত্র)। এই পদ্ধতিতে কায়িকী, বাচিক ও মানসিক তিন প্রকার হিসাব ধরে তিন প্রকৃতি ভেদে মোট নয় প্রকার শরণাগতি হয়। (১) অপর প্রাণী বা ব্যক্তি যাতে তাদের কার্য অনুযায়ী উপযুক্ত ফল না পেয়ে বিপরীত ফল লাভ করে সেই আকাঙ্ক্ষায় মোহবশত পরম দয়াবান ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ করাকে তামসী প্রপত্তি বলে। (২) নানাবিধ কাম্যবস্তু লাভের আকাংক্ষায় ভগবানের শরণ গ্রহণ করাকে রাজসী প্রপত্তি বলে। (৩) সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে ভক্তি সহকারে দাস্যভাবে ভগবানের শরণ গ্রহণকে সাত্ত্বিকী প্রপত্তি বলে। এখানে সাত্ত্বিকী প্রপত্তি শ্রেষ্ঠ। অধিকারী-ভেদেই এইরূপ শরণাগতি হয়ে থাকে। এই মানসী প্রপত্তি এবং সাত্ত্বিকী প্রপত্তিই মুখ্যতম এবং কাম্য।

* ভাগবতধর্মের প্রাচীন ইতিহাস—স্বামী বিদ্যারণ্য।

'যতীন্দ্রমত দীপিকায়' শ্রীনিবাস দাসের মতে প্রপন্ন (শরণাগতি) দুই প্রকারের—একান্তী এবং পরম একান্তী। যার চিত্তবৃত্তি একই বিষয়ে অন্ত বা অভিনিবিষ্ট বা পর্যবসিত হয়েছে, সে একান্তী। পরমৈকান্তী আবার দ্বিবিধ—দৃপ্ত ও আর্ত। আর্ত পরমৈকান্তীই সর্বশ্রেষ্ঠ শরণাগতি। তাঁর মতে ভক্তি ও প্রপত্তি দ্বারা প্রপন্ন হয়েই ঈশ্বর মোক্ষ প্রদান করেন।*

বৌদ্ধধর্ম মতে শরণাগতি দুই প্রকার—লৌকিক ও লোকোত্তর। লৌকিক শরণাগতি আবার দ্বিবিধ—সাবদ্য ও অনবদ্য এবং সদোষ ও নির্দোষ।

'লৌকিক আলম্বন বা ধ্যেয় বস্তু রত্নত্রয়ের (বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ) গুণ বা লক্ষণ। লোকোত্তরে আলম্বন বা ধ্যেয় বস্তু নির্বাণ। লৌকিকে আনুষঙ্গিক বিপর্যয়ভয় নিবারিত হয় মাত্র। লোকোত্তরে তাহা সমূলে বিনষ্ট হয়। লৌকিকে ইষ্টফল ভবসম্পদ, ভোগসম্পদ্, স্বর্গ এবং অতুল ঐশ্বর্য। লোকোত্তরের পরিপক্ক ফল চতুর্বিধ শ্রামণ্য-ফল, চারি আর্যসত্যের উপলব্ধি, ইহার সুখদ ফল সর্বদুঃখ-ক্ষয় নির্বাণ।'**

শ্রীরামকৃষ্ণদেব দু রকম শরণাগতির কথা বলেছেন—(১) বেড়ালের ছানার স্বভাব, (২) বানরের ছানার স্বভাব।

তিনি বলেছেন, 'দু রকম ভক্ত আছে। এক থাকের বিল্লীর ছার স্বভাব। সব নির্ভর—মা যা করে। বিল্লীর ছা কেবল মিউমিউ করে। কোথায় যাবে, কী করবে কিছুই জানে না। মা কখন হেঁশালে রাখছে—কখন বা বিছানার ওপর রাখছে। এরূপ ভক্ত ঈশ্বরকে আমমোক্তারি (বকলমা) দেয়। আমমোক্তারি দিয়ে নিশ্চিন্ত।

'আর এক থাক ভক্ত আছে, তাদের বানরের ছার স্বভাব। বানরের ছা নিজে যো সো করে মাকে আঁকড়ে ধরে। এদের একটু কর্তৃত্ব বোধ আছে। আমায় তীর্থ করতে হবে, জপ তপ করতে হবে, ষোড়শোপচারে পূজা করতে হবে, তবে আমি ঈশ্বরকে ধরতে পারবো—এদের এই ভাব।'

* ভাগবতধর্মের প্রাচীন ইতিহাস—স্বামী বিদ্যারণ্য

** ত্রিরত্ন ও বৌদ্ধ শরণাগতি—বেণীমাধব বড়ুয়া।

বানরের ছা মাকে ধরে আছে, কিন্তু মা যখন লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে এ ডাল থেকে ও ডালে, এ ছাদ থেকে ও ছাদে যায় তখন বানরের ছানা হাত ফসকে নিচে পড়ে যেতে পারে। কিন্তু বেড়ালের ছানার পড়বার ভয় নেই, মা যে তাকে মুখ দিয়ে কামড়ে ধরে এখান থেকে সেখানে নিয়ে যাচ্ছে। 'সেইরূপ কোন কোন সাধক নিজে হিসাব করে কোন সাধন করতে পারে না—এত জপ করবো, এত ধ্যান করবো ইত্যাদি। সে কেবল ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে তাঁকে ডাকে। তিনি তাঁর কান্না শুনে আর স্থির থাকতে পারেন না। এসে দেখা দেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব আর একটি উদাহরণ দিতেন। গ্রামে ক্ষেতের আলের ওপর দিয়ে বাপ তার দু ছেলেকে নিয়ে যাচ্ছে। ছোট ছেলে যে বাবা ছাড়া কিছুই জানে না, সে বাপের কোলে আছে, বড় ছেলে বাপের হাত ধরে যাচ্ছে। যেতে যেতে আকাশে একটি চিল উড়ে যেতে দেখে বড় ছেলে আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। ফলে বাপের হাত ছেড়ে দিতে হলো বলে আলের পাশে নিচে পড়ে গেল। ছোট ছেলেটিও চিলকে দেখে আনন্দে হাততালি দিলে, কিন্তু তার পড়বার ভয় নেই—সে যে বাপের কোলে আছে।

শুধু সাধনের ক্ষেত্রে নয়, সাধারণ সংসারের ক্ষেত্রে ঈশ্বরে বিশ্বাস অবিশ্বাস নিয়েও এ রকম দুই থাকের ভক্ত দেখা যায়।

(১) এক ভদ্রলোক অফিসে কাজ করেন। অফিসের একটি পরীক্ষা তাঁকে দিতে হলো। এই পরীক্ষার উপর তাঁর চাকরির পদোন্নতিও নির্ভর করে। কিন্তু পরীক্ষায় একটি পেপার একটু খারাপ হয়ে যায়। পরীক্ষার পর মনে হলো—তিনি পাশ নম্বর পেতেও পারেন, নাও পেতে পারেন। মন দুর্বল হয়ে গেল। কয়েকজন জ্যোতিষের কাছে গেলেন। কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর গেলেন—মায়ের কাছে প্রার্থনা করলেন। মা, আমি যেন পাশ করি। এর আগে তিনি দেবতায় এত বিশ্বাস ভক্তি রাখতেন না। এখন যেখানে যে দেবতা বা মন্দির দেখেন, সেখানেই হাত তুলে নমস্কার করেন আর বলেন, ঠাকুর, আমায় পাশ করিয়ে দাও।

কিন্তু তিনি পাশ করতে পারলেন না। সঙ্গে সঙ্গে ভগবানে বিশ্বাস তাঁর উঠে গেল। এত প্রার্থনা, এত প্রণামের পরেও ভগবান যখন পাশ করিয়ে দিতে পারলেন না—তখন ভগবান নেই। ভগবানের প্রয়োজনও নেই।

(২) এক ভদ্রলোকের স্ত্রী অসুস্থ। তিনি অনেক চিকিৎসা করালেন। সাধ্যের অতিরিক্ত ব্যয় হয়ে গেল, কিছু দেনা হলো—তাতেও ভ্রূক্ষেপ না করে চিকিৎসা চলল। ভদ্রলোক দীক্ষিত, ভক্ত। নিত্য জপ প্রার্থনা তাঁর ছিল। মাকে কত ডেকেছেন, 'মা, ওকে ভাল করে দাও।' কিন্তু দীর্ঘকাল রোগে ভুগে ভদ্রমহিলা মারা গেলেন।

এবার ভদ্রলোকের তীব্র অভিমান হলো। মাকে এত ডাকলুম, এত পূজা পাঠ করলুম—সবই কি বৃথা? মা কি কিছুই শুনলেন না? অন্তরের আহ্বান কি তিনি শোনেন না? তবে এই জপ ধ্যান পূজা পাঠের মূল্য কী?

তাঁর সমস্ত বিশ্বাস ভক্তি যেন নষ্ট হতে চলেছে। অভিমানে তিনি পূর্ণ।

এঁরা ভগবানকে ধরেছিলেন—বানরের ছানার মতো। এঁদের রাজসী প্রপত্তি। সামান্য আঘাতেই হতাশা আর অবিশ্বাস।

ঈশান মুখোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের একজন ভক্ত। ঈশান ভাটপাড়ায় গায়ত্রীর পুরশ্চরণ করবার জন্য গঙ্গাকূলে আটচালা বাঁধছিলেন, একথা ঠাকুর শুনেছেন। একদিন অধর সেনের বাড়িতে (কথামৃত ৫ম, ২২।৯ ১৮৮৩) শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশানকে বলছেন, "হ্যাঁগা, ঘর কি তৈয়ার হয়েছে? কি জান, ও সব লোকের খপরে যত না আসে ততই ভাল। যারা সত্ত্বগুণী, তারা ধ্যান করে মনে বনে কোণে, কখনও মশারির ভেতর ধ্যান করে।··· আর দেখ, বেশী আচার করো না।···আর তাঁর নামে বিশ্বাস কর। তা হলে আর তীর্থাদিরও প্রয়োজন হবে না।'

এই বলে ঠাকুর ভাবে বিভোর হয়ে গান ধরলেন—

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চি কেবা চায়।
কালী কালী কালী বলে অজপা যদি ফুরায়॥

ঈশান সব শুনে চুপ করে আছেন। ঠাকুর তাকে আরো উপদেশ দিলেন,

'আর তুমি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের নিয়ে বেশী মাখামাখি করো না। ওদের চিন্তা দু পয়সা পাবার জন্য।···নানা শাস্ত্রেরও কিছু প্রয়োজন নাই। যদি বিবেক না থাকে, শুধু পাণ্ডিত্যে কিছু হয় না। ষট্‌শাস্ত্র পড়লেও কিছু হয় না। নির্জনে গোপনে কেঁদে কেঁদে তাঁকে ডাক, তিনিই সব করে দেবেন। '···সরল ভাবে বলো, হে ঈশ্বর, দেখা দাও, আর কাঁদ। আর ডুব দাও। উপর উপর ভাসলে বা সাঁতার দিলে কি রত্ন পাওয়া যায়? ডুব দিতে হয়।···বিশ্বাসে সব মিলে।'

এখানে দেখা যাচ্ছে ঈশান মুখোপাধ্যায়ের বানরের ছায়ের স্বভাব ছিল। তাই পুরশ্চরণ করেছিলেন। তীর্থযাত্রা, শাস্ত্রপাঠ ইত্যাদির ওপর তাঁর ঝোঁক ছিল। ঠাকুর তাকে বেড়ালের ছায়ের স্বভাবে রূপান্তরিত করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। তাই ঈশানকে জোরের সঙ্গে বিশ্বাস প্রভৃতির কথা বলেছিলেন। বেড়ালের ছায়ের মতো হওয়াই শরণাগতির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

ভক্তভৈরব শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষের আমমোক্তারী বা কলমা দেবার ঘটনা প্রসঙ্গে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গে' স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন—'শ্রীযুক্ত গিরিশ ঠাকুরের নিকট কয়েকবার আসা-যাওয়ার পর একদিন তাঁহাকে সর্বতো আত্মসমর্পণ করিয়া বলিলেন—'এখন থেকে আমি কী করব?'

ঠাকুর—যা করচ তাই করে যাও। এখন এদিক (ভগবান) ওদিক (সংসার) দুদিক রেখে চল, তারপর যখন একদিক ভাঙ্গবে তখন যা হয় হবে। তবে সকালে-বিকালে তাঁর স্মরণ মননটা রেখো।—এই বলিয়া গিরিশের দিকে চাহিলেন, যেন তাঁহার উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছেন।

কিন্তু গিরিশ নীরব রহিলেন। তিনি বিষণ্ণ মনে ভাবিতে লাগিলেন, আমার যে কাজ তাহাতে স্নান-আহার-নিদ্রা প্রভৃতি নিত্যকর্মেরই একটা নিয়মিত সময় রাখিতে পারি না। সকালে বিকালে স্মরণ-মনন করিতে নিশ্চয়ই ভুলিয়া যাইব।···ইত্যাদি।

ঠাকুর তাহার মনোগত ভাব বুঝিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, তা যদি না পার তো খাবার শোবার আগে তাঁহার একবার স্মরণ করে নিও।'

গিরিশ এবারও নীরব। ভাবিলেন, উহাই কি করিতে পারিবেন? তাঁর খাওয়া শোওয়ার কোনো সময় ঠিক থাকে না।···ঠাকুর গিরিশের দিকে আবার চাহিয়া হাসিতে হাসিতে এইবার বলিলেন—'তুই বলবি, তাও যদি না পারি—আচ্ছা তবে আমায় বকলমা দে।'

কথাটি মনের মতো হইল। গিরিশের প্রাণ ঠাণ্ডা হইল। শুধু ঠাণ্ডা হইল না, ঠাকুরের অপার দয়ার কথা ভাবিয়া তাঁহার উপর ভালবাসা ও বিশ্বাস একেবারে অনন্তধারে উছলিয়া উঠিল।···গিরিশ ভাবিলেন, এখন যাই করি না কেন, এইটি মনে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিলেই হইল যে ঠাকুর তাঁহার অসীম দিব্যশক্তি বলে কোনো না কোনো উপায়ে তাঁহাকে উদ্ধার করিবেন।

গিরিশ এবার নিশ্চিন্ত এবং সুখী। তাঁর এখন সর্বদা এক চিন্তা—শ্রীরামকৃষ্ণ আমার সম্পূর্ণ ভার লইয়াছেন। ধীরে ধীরে তাঁর জীবন ও চরিত্রের আমূল পরিবর্তন হইল—তাঁর বকলমা দেওয়া সার্থক হইল।'

গিরিশ এভাবে অবতাররূপী শ্রীরামকৃষ্ণে বকলমা দিয়েছিলেন, অর্থাৎ সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছিলেন। এইভাবে ভগবানে যদি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা যায়, তবেই হবে বিড়ালের ছানার স্বভাব।

বালক প্রহ্লাদ অতি শৈশব থেকে শ্রীহরির ভজনা করেছেন। তাঁর মন প্রাণ শ্রীহরিতে অর্পিত। পিতা হিরণ্যকশিপু নানাভাবে প্রহ্লাদকে হরির ভজনা থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু তাতে কোনো ফল হলো না দেখে প্রহ্লাদকে নানাভাবে শাস্তি দিলেন। তাকে তীক্ষ্ণ শূলের আঘাত করা হলো, কিন্তু সে আঘাতে তার কিছু হলো না। ক্রমে মত্ত হস্তীর পদতলে নিক্ষেপ, বিষধর সর্পের আক্রমণ, বিষ-প্রদান, উপবাস, পর্বতশৃঙ্গ থেকে নিক্ষেপ প্রভৃতি নানা উপায়ে শিশুকে বধ করার চেষ্টা করা হলো। কিন্তু শ্রীহরির স্মরণ, মনন ও নির্ভরতায় তার কোনোই ক্ষতি হলো না। প্রহ্লাদের এই যে শরণাগতি তা বেড়াল ছানার শরণাগতি এবং তদুপরি শ্রীহরির সঙ্গে একাত্মতালাভে সর্বোৎকৃষ্ট শরণাগতিতে পরিণত হয়েছে।

৫

ঈশ্বরেচ্ছা, কর্মবাদ ও স্বাধীন ইচ্ছা

ঈশ্বরই এই জগতের কর্তা, তিনিই সব করাচ্ছেন, তাঁর ইচ্ছাতেই জগত চলছে। তাহলে মানুষ আবার সুখ দুঃখ নানা কর্মফলে ভোগে কেন? তাঁর ইচ্ছাতেই যদি সব কিছু কাজ নির্বাহিত হয়, তবে মানুষের কর্মফলের জন্যে দায়ী কি তিনি নন? দুর্যোধন বলেছিলেন, 'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি-স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি'—তুমি হৃষীকেশ অন্তর্যামীরূপে সর্বজীবের হৃদয় মধ্যে অবস্থান করে যেমন কাজ করাচ্ছ তেমনি আমি করছি।

ভারতীয় ধর্মদর্শনে একথা সকলেই বলছেন যে কর্ম করলেই তার ফল ভোগ করতে হবে। কায়িক, বাচিক ও মানসিক ব্যাপারের নাম কর্ম এবং সুখ, দুঃখ, মোহ, ভোগ তার ফল। কৃতকর্মের ফল নষ্ট হয় না (কৃত প্রণাশ বা কৃতহানি) আবার অকৃতকর্মের ফল লাভও হয় না (অকৃত অভ্যাগম)। একে বলা হয় কর্মবাদ। কার্য-কারণ নীতির ভিত্তিতে এই কর্মবাদ প্রতিষ্ঠিত বলে এ সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক মতবাদ। শুভ কর্মের ফল সুখ আর অশুভ কর্মের ফল দুঃখ। এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। কারণ ভোগ ব্যতীত কর্মের ফল কখনও—এমন কি কল্পকল্পান্তরেও নাশ হয় না। তবে কর্মবাদীরা ঈশ্বরবাদী নাও হতে পারেন—যেমন জৈন, বৌদ্ধ। কিন্তু কর্ম ও কর্মফলে তাঁরা বিশ্বাসী।

ঈশ্বর কর্মফলের দাতা, বিধায়ক। কর্মের নিয়ম বিধির বিধানে নিয়ন্ত্রিত। ঈশ্বর কর্মের নিয়মে বা অদৃষ্ট বা দৈববিধি অনুসারেই জগত সৃষ্টি করেন। এই কর্মের বিধান বা অদৃষ্ট জড় বা অচেতন। যে কোনো কর্ম করলেই তার একটা প্রভাব অদৃশ্যাকারে বর্তমান থাকে। এর নাম অদৃষ্ট বা কর্মসংস্কার।

এই কর্মসংস্কার পরবর্তীকালে কৃতকর্মের উপযুক্ত ফল বিধান করে। চেতন কোনো কিছুর নিয়ন্ত্রণ ছাড়া অচেতন অদৃষ্টের পক্ষে যার যা প্রাপ্য তা দেওয়া সম্ভব নয়।

'চেতন নিয়ামক ভিন্ন কর্মশৃংখলা বিধান সুব্যবস্থিতরূপে ক্রিয়মাণ হইতে পারে না। হইতে গেলে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে পড়িবে। রাম কর্ম করিবে, শ্যাম তাহার ফল পাইবে। কোন নির্দিষ্ট কর্মের কোন নির্দিষ্ট ফল-পরিচায়িকতা থাকিবে না। দেশ, কাল, পাত্র ও নিমিত্ত বিচার থাকিবে না। তাই চাই অধিষ্ঠানরূপে এক চেতন নিয়ামক। সেইজন্যই বলিতে বাধ্য যে, সমষ্টি-জীব-কর্ম-সংস্কারোপহিত চৈতন্যই ঈশ্বরাত্মা ঈশ্বরাত্মা মায়ার অধীশ্বর হইয়া মায়ার দ্বারাই অর্থাৎ জীবের পূর্ব পূর্ব জন্মার্জিত কর্মসংস্কার দ্বারাই জীবের কর্মফলসংযোগ-বিধাতা, জীবের নিয়ন্তা।'

—(তীর্থস্বামী, আত্মদর্শন ও সাধনতত্ত্ব)

তাই বলা হয় ঈশ্বর অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রণ করেন এবং কর্মানুসারে জীবের সুখদুঃখ বিধান করেন। ভগবান হৃদয়দেশে অবস্থান করে কর্মফল অনুসারে মানুষের ভবিষ্যত কার্যক্রম বিধান করেন মাত্র। তবে কোনো কর্মের ফল আগে আসে, কোনো কর্মের ফল পরে আসে। কোন্‌টা আগে আসবে, কোন্‌টা পরে আসবে, কোন্ কারণে কী ফল দেখা দিচ্ছে বা দেবে—এ রহস্য বোঝবার ক্ষমতা মানুষের নেই—ঈশ্বরই তার বিধানকর্তা। কিন্তু যদি পূর্বকৃত কর্মের দ্বারা মানুষের বর্তমান কর্ম নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে কর্মে মানুষের স্বাধীনতা কোথায়? ঈশ্বরবাদী যাঁরা নন, তাঁরাও একই ফল লাভ করেন—আর অন্যথা হয় না।

সংস্কারের ফলে বাসনার প্রভাবে মানুষ সৎ কর্ম ও অসৎ কর্ম করে থাকে এবং তা করার স্বাধীনতা তার আছে। কর্মের স্বাধীনতা আছে মনে করেই মানুষ পুরুষকার বলে অগ্রসর হতে চায়, প্রচেষ্টা চালায়, উৎসাহ উদ্যম নিয়ে এগিয়ে চলে। আবার মানুষ নিজের চেষ্টা দ্বারা তার স্বভাবেরও পরিবর্তন করতে পারে। যুদ্ধ করতে গিয়ে অর্জুনের মনে হলো—না, যুদ্ধ করা উচিত হবে না। নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় তিনি যুদ্ধ করবেন না বলে

স্থির করলেন। আবার শ্রীকৃষ্ণ যখন নানা যুক্তি দিয়ে, উপদেশ দিয়ে তাঁকে বোঝালেন যে তাঁর যুদ্ধ করাই উচিত হবে—তখন অর্জুন সব বুঝে যুদ্ধ করতে গেলেন। কর্মের স্বাধীনতার মধ্যে সঙ্গের, পরিবেশের প্রভাব, উপদেশের প্রভাব থাকতে পারে।

কর্মের ফল দুটি—একটি মুখ্য ফল, একটি গৌণ ফল। মুখ্য ফল হচ্ছে ভোগাত্মক—যা ভোগ করছি বা করতে হবে, আর গৌণফল হচ্ছে বাসনাত্মক বা সংস্কারাত্মক। ভোগাত্মক কর্মফলকে কেউ রোধ করতে পারে না, ভোগ দিয়ে সে কর্মফল নাশ প্রাপ্ত হয়। ভোগের ফলে সুখ বা দুঃখ আসবে। অজ্ঞাতসারে বা অনিচ্ছাকৃত ভাবে অনেক কর্ম করতে হয় এবং তারও ফল আসে। শুভ করতে অশুভও হয়ে যায়—তার ফলও দুঃখ।

বাসনাত্মক গৌণ ফল হিসাবে কৃতকর্মের 'সংস্কার' চিত্তের মধ্যে অবস্থান করে এবং পূর্বকৃত কর্মের পুনরাবৃত্তির বাসনা জাগ্রত করে। পরবর্তী জন্মে 'প্রারব্ধ' কর্মরূপে সুখ বা দুঃখ ভোগদ্বারা এই সংস্কারের কর্মফল লাভ হয়। পুনরাবৃত্তির বাসনার ফলে অনুরূপ কর্মদ্বারা পুনরায় মুখ্য ও গৌণ ফলের সম্ভাবনা থাকে এবং এভাবে জন্ম-জন্মান্তর চলতে থাকে।

কর্ম তিন প্রকারের—(১) সঞ্চিত (২) প্রারব্ধ, (৩) আগামী বা ক্রিয়মাণ। (১) যে কর্ম জমা আছে (সংস্কার রূপে), এখনও পরিপক্ক হয়ে ফল দিতে আরম্ভ করে নি, তা সঞ্চিত। (২) যে কর্মের ফল পরিপক্ক হয়ে এ জন্ম লাভ হয়েছে এবং কর্মের ফল সকলে ভোগ করছে তা প্রারব্ধ। (৩) এ জন্মের কর্মের দ্বারা যে সংস্কার তৈরি হচ্ছে যা পরবর্তী জন্মে ফল দেবে তা আগামী বা ক্রিয়মাণ কর্ম।

বর্তমানে যে কর্ম করা হচ্ছে তার মধ্যে উৎকট কর্মের ফল এ জন্মেই ভোগ করতে হয়। যেমন কেউ বিষ খেল। তার ফলে সে ভুগবে। কেউ চুরি করল, ধরা পড়ল—ফলে সে মার খাবে, জেলে যাবে। কিন্তু বিষ খাওয়া, চুরি করার যে ইচ্ছা ছিল তার ফলে সংস্কার জন্মাবে—'আগামী' কর্মরূপে তা থাকবে। আগামী কর্ম পরবর্তী জন্মে 'সঞ্চিতে'র মধ্যে জমা হবে, প্রারব্ধ-রূপে পরে তা দেখা দেবে। এইভাবে কর্মচক্র চলছে।

সংস্কারের ফলে যে বাসনা জাগ্রত হয়, মানুষ তীব্র ইচ্ছা সহায়ে চেষ্টা করলে, সাধনা বলে অথবা সঙ্গ ও পরিবেশের প্রভাবে তা নিস্তেজ করতে পারে। শুভ কর্মের দ্বারা অশুভ কর্মের সংস্কার দুর্বল হতে থাকে। ফলে ভোগ হয় ঠিকই, কিন্তু ভোগের শক্তি কমে যায়—অর্থাৎ দুর্ভোগ কম হয়। এখানেই এই কর্মের সংস্কারের ব্যাপারে মানুষের স্বাধীনতা আছে। পুরুষকার বলেই সাধন সহায়ে কর্ম সংস্কারের যে একটি অনাদি প্রবাহ চলছে তাকে শান্ত করা যায়। পুরুষকার বলে সাধনা দ্বারা সংস্কার বা দৈবের বিনাশ বা মৃত্যু ঘটে। কিন্তু প্রারব্ধ কর্মের সুখ-দুঃখাকারে প্রকাশিত কর্মফলে মানুষের হাত নেই। আবার এ কর্মফল তো মানুষেরই কৃতকর্মের ফল। সুতরাং এর উপর প্রত্যক্ষ না হোক, পরোক্ষভাবে একেবারেই হাত নেই—এ কথাও কিন্তু বলা যায় না।

কাজেই ভক্তিবাদীদের দৃষ্টিতে সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছা. তিনিই কর্তা, তিনিই সব কিছু করাচ্ছেন, ওকথা ঠিক। কিন্তু কর্মবাদী মানুষ যতদিন না ঠিক ঠিক তা অনুভব করছে, ততদিন তাঁর স্বাধীন ইচ্ছা 'ফ্রি উইল'—এই মনোভাবটি থাকবেই। যাঁরা শরণাগতিতে বিশ্বাস রাখেন তাঁরা জানেন, যখন নিজের ইচ্ছাকে ঈশ্বরের ইচ্ছায় সম্পূর্ণ মিশিয়ে দিতে পারা যাবে, যখন তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতার ভাব আনা যাবে—তখন ঠিক ঠিক অনুভব করা যাবে যে তিনিই সব কিছু করাচ্ছেন। তার আগে পর্যন্ত পুরুষকার থাকবেই, নিজে করছি এই ভাবটি থাকবে এবং কর্মফল ভুগতে হবে।

আবার শরণাগতির কৌশলটি জেনে সাধন সহায়ে পুরুষকার বলে যখন বাসনাকে দুর্বল করা যাবে, তখন অশুভ সংস্কারের বন্ধন শক্তিহীন হতে থাকবে, শুভ সংস্কার প্রবলতর হবে এবং সর্ব কর্ম ঈশ্বরেচ্ছায় হচ্ছে—এ সত্যও প্রতিভাত হতে থাকবে। নিষ্কাম কর্ম দ্বারা সঞ্চিত কর্মের বাসনারূপ সংস্কার দুর্বল হতে থাকে। ফলে চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্তের মূল, যথা—ঈর্ষা, দ্বেষ, অনুরাগ, কাম, ক্রোধ ইত্যাদি সংস্কার নিষ্কাম কর্ম দ্বারা দুর্বল হয়ে যায় এবং উত্তম সংস্কারগুলো, যেমন—ঈশ্বরচিন্তা, ভগবানে ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য প্রবল হতে থাকে। চিত্তশুদ্ধি এই ভাবেই হয়। কিন্তু

সংস্কার তখন একেবারে নাশ হয় না, দুর্বল অবস্থায় থাকে মাত্র।

শুদ্ধ চিত্ত লাভের পর সাধনা দ্বারা যদি জ্ঞান লাভ হয় তবেই সঞ্চিত কর্মের সংস্কার সম্পূর্ণ বিনষ্ট হবে। কেবলমাত্র এই ক্ষেত্রেই অর্থাৎ জ্ঞান লাভ হলে তবেই কর্মফল ভোগ বিনা ক্ষয় হয় বলা যায়। জ্ঞান লাভ হলে সঞ্চিত কর্ম যেমন ক্ষয় হয়, তেমনি আগামী কর্মও ক্ষয় হয়। কেবলমাত্র প্রারব্ধ থাকে। প্রারব্ধ ভোগের পর এই দেহ নাশ হয়—কোনো কর্ম-সংস্কার আর থাকে না বলে জ্ঞানীর আর জন্ম হয় না। তাই পুরুষকারের মূল্য প্রবর্তক ও সাধকের কাছে বিশেষভাবে রয়েছে।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে (অনুবাদ—তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য) বলা হয়েছে (মুমুক্ষুব্যবহার প্রকরণ)—'দৈব বলিয়া যাহা কথিত হয় তাহা তো পূর্ব জন্মের পুরুষকার ভিন্ন অন্য কিছু নহে। ···প্রাক্তন পুরুষকারকে বর্তমান পুরুষকার সহায়ে বিজিত করা যায়। ···ইহকালের সৎকর্ম দ্বারা যতদিন না প্রাক্তন অসৎকর্ম পরাভূত হয়, ততকাল যত্নের সহিত ঐহিক সৎকর্মের অনুষ্ঠান করিবে। কেননা, প্রাক্তন অসৎকর্ম ইহকালের সৎকর্ম দ্বারা অবশ্যই পরাভূত হয়। ···অতএব পুরুষকার অবলম্বনপূর্বক সাধুসঙ্গ ও সৎশাস্ত্র সহায়ে বুদ্ধির মালিন্য বিদূরিত করিয়া সংসার সমুদ্রের পারে গমন করা কর্তব্য।'

পুরুষকার থাকলে স্বাধীন-ইচ্ছা মনোভাবটিও থাকবে। স্বাধীন ইচ্ছা বলতে সত্যিকার কিছু আছে কি?

কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন—হ্যাঁ, তিনি সব করাচ্ছেন বটে, তিনিই কর্তা, মানুষ যন্ত্রের স্বরূপ। আবার এও ঠিক যে কর্মফল আছেই আছে। লংকা-মরিচ খেলেই পেট জ্বালা করবে, তিনিই বলে দিয়েছেন যে খেলে পেট জ্বালা করবে। পাপ করলেই তার ফলটি পেতে হবে।

একজনের প্রশ্ন—তবে ঈশ্বর দুষ্ট লোক করলেন কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁর ইচ্ছা, তাঁর লীলা। তাঁর মায়াতে বিদ্যাও আছে অবিদ্যাও আছে। অন্ধকারের প্রয়োজন আছে, অন্ধকার থাকলে আলোর আরও মহিমা প্রকাশ হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ খারাপ জিনিস বটে, তবে

তিনি দিয়েছেন কেন ? মহৎ লোক তয়ের করবেন বলে।···ঈশ্বর সব রকম করেছেন—ভাল গাছ, বিষ গাছ, আবার আগাছাও করেছেন। জানোয়ারদের ভিতর ভালমন্দ সব আছে—বাঘ, সিংহ, সাপ সব আছে।

'যে ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করেছে, সে কিন্তু পাপ করতে পারে না। সাধা লোকের বেতালে পা পড়ে না। যার সাধা গলা, তার সুরেতে সা রে গা মা-ই এসে পড়ে।···

'তাঁকে চিন্তা করলে অচৈতন্য! যে চৈতন্যে জড় পর্যন্ত চেতন হয়েছে, হাত-পা-শরীর নড়ছে! বলে, শরীর নড়ছে, কিন্তু তিনি নড়ছেন জানে না। বলে, জলে হাত পুড়ে গেল! জলে কিছু পোড়ে না। জলের ভিতর যে উত্তাপ, জলের ভিতর যে অগ্নি তাতেই হাত পুড়ে গেল।

'হাড়িতে ভাত ফুটছে। আলু-বেগুন লাফাচ্ছে। ছোট ছেলে বলে আলু-বেগুনগুলো আপনি নাচছে। জানে না যে নীচে আগুন আছে। মানুষ বলে ইন্দ্রিয়েরা আপনা আপনি কাজ করছে! ভিতরে যে সেই চৈতন্যস্বরূপ আছে তা জানে না।'

চৈতন্যদেব বলেছেন (চৈতন্যচরিতামৃত)—

'একেলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব তাঁর ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য।'

তিনি যেমন করাচ্ছেন, আমরা তাই করছি, যেমনভাবে আমাদের নিয়ে খেলা করাচ্ছেন, আমরা তাই করছি—আমাদের নিজস্ব কোনো স্বাধীনতা নেই।

স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন (মন ও মানুষ)—'···স্বার্থপরতা বিসর্জন দিয়ে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কাজ করলে ভগবান সহায় হন। এর অর্থ কি জানো ? মানুষের individual will-টা (ব্যষ্টি ইচ্ছা) cosmic will-এর (সমষ্টি ঈশ্বর) কাছে surrender (সমর্পণ) করা। Individual will-এর তরঙ্গ Cosmic will-এর প্রবাহের সঙ্গে এক হলে শক্তির অদম্য স্ফুরণ হয়, পৃথিবীর কোন শক্তিই তখন আর সে গতির প্রতিরোধ করতে পারে না। Individual will এক একটা মানুষ, আর

Cosmic will সেই বিরাট বিশ্বপ্রকৃতি। সকল সৃষ্টি, সকল কামনা বাসনার বীজ বিশ্ব প্রকৃতিতে কারণাকারে সঞ্চিত থাকে। মানুষ ভগবানকে ভুলে গিয়ে যখনই নিজের সংকীর্ণ বুদ্ধি নিয়ে মোহগ্রস্ত হয়, তখনই সে নিজেকে দুর্বল ভাবে, আর তখনই তার শক্তি হয় সীমায়িত। আর যখনই সে ভাবে 'আমি সামান্য তো নই, রাজপুত্র হই, পিতার ধনে পুত্রের পূর্ণ অধিকার' তখন বিশ্বপ্রকৃতি ও তার মধ্য থেকে সকল ব্যবধান নিমেষে তা অন্তর্হিত হয়, আর তখনই প্রকৃতির বিরাট শক্তির সে হয় অধিকারী, then he becomes the playground of the Almighty (সে হয় ভগবানের লীলাভূমি)।

'আত্মবিশ্বাস মানে নিজের মধ্যে অন্তর্হিত বিশ্বপ্রকৃতির বিরাট ইচ্ছা বা শক্তি, তাকে ঠিক ঠিক ভাবে জেনে তার সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন জ্ঞান করতে হয়। প্রকৃতি বা ভগবানের সমষ্টি ইচ্ছা থেকে নিজেকে ভিন্ন ভাবলেই মনে দুর্বলতা আসে। এই ভিন্নজ্ঞানই সৃষ্টি করে মানুষের মধ্যে স্বার্থবুদ্ধি বা অহংকার। ভগবানকে ভুলে নিজেকে স্বতন্ত্র বা সর্বময় কর্তা ভাবলে মনের মধ্যে আসে অহংকার। আর এই অহংকারই সকল অনিষ্টের মূল।'

এখানে এই বোঝা যাচ্ছে যে শরণাগতিতে আত্মবিশ্বাস বাড়ে। আত্মবিশ্বাস অর্থে অহংকার নয়। অহংকার যার তার 'স্বাধীন ইচ্ছা' মনোভাব থাকতে পারে, কিন্তু অহংকার ভগবান থেকে দূরে নিয়ে যায়।

স্বামী বিবেকানন্দ 'দেববাণী'তে বলেছেন, 'আমাদের ইচ্ছাশক্তিই সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাণী। সে-ই যথার্থ নিয়ন্তা, যে আমাদের বলছে—এই কাজ কর, এই কাজ করো না। এই ইচ্ছাশক্তি আমাদের যত বন্ধনের মধ্যে এনেছে। অজ্ঞ ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তি তাকে বন্ধনে ফেলে, আর সেইটেই জ্ঞানপূর্বক পরিচালিত হলে আমাদের মুক্তি দিতে পারে। সহস্র সহস্র উপায়ে ইচ্ছা-শক্তিকে দৃঢ় করা যেতে পারে, প্রত্যেক উপায়ই এক এক প্রকার যোগ। তবে প্রণালীবদ্ধ যোগের দ্বারা এটা খুব শীঘ্র সাধিত হতে পারে।'

তিনি আরো বলেছেন (দেববাণী)—'সর্বদা স্মরণ রেখো যে মুক্ত বা

স্বাধীন পুরুষেরই কেবল স্বাধীন ইচ্ছা আছে—বাকি সকলেই বন্ধনের ভিতর রয়েছে—সুতরাং তারা যা করছে, তার জন্য তারা দায়ী নয়। ইচ্ছা যখন ইচ্ছারূপে প্রকাশিত, তখন তা বদ্ধ।'

স্বামী সারদানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে লিখেছেন (সাধকভাব)—'দক্ষিণেশ্বরে একদিন আমরা স্বামী নিরঞ্জনানন্দের সহিত মানবের স্বাধীন ইচ্ছা কিছুমাত্র আছে কিনা, এই বিষয় লইয়া অনেকক্ষণ বাদানুবাদের পর উহার যথার্থ মীমাংসা পাইবার নিমিত্ত ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হই। ঠাকুর বালকদিগের বিবাদ কিছুক্ষণ রহস্য করিয়া শুনিতে লাগিলেন, পরে গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'স্বাধীন ইচ্ছা ফিচ্ছা কারও কিছু কি আছে রে? ঈশ্বরেচ্ছাতেই চিরকাল সব হচ্ছে ও হবে। মানুষ ঐ কথা শেষকালে বুঝতে পারে। তবে কি জানিস, যেমন গরুটাকে লম্বা দড়ি দিয়ে খোঁটায় বেঁধে রেখেছে—গরুটা খোঁটার এক হাত দূরে দাঁড়াতে পারে, আবার দড়িগাছাটা যত লম্বা ততদূর গিয়েও দাঁড়াতে পারে—মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাটাও ঐরূপ জানবি। গরুটা এতটা দূরের ভিতর যেখানে ইচ্ছা বসুক, দাঁড়াক বা ঘুরে বেড়াক—মনে করেই মানুষ তাকে বাঁধে। তেমনি ঈশ্বরও মানুষকে কতকটা শক্তি দিয়ে তার ভিতরে সে যেমন ইচ্ছা, যতটা ইচ্ছা ব্যবহার করুক, বলে ছেড়ে দিয়েছেন। তাই মানুষ মনে করে সে স্বাধীন। দড়িটা কিন্তু খোঁটায় বাঁধা আছে। তবে কি জানিস, তাঁর কাছে কাতর হয়ে প্রার্থনা করলে, তিনি নেড়ে বাঁধতে পারেন, দড়ি গাছটা আরও লম্বা করে দিতে পারেন, চাই কি গলার বাঁধন একেবারে খুলেও দিতে পারেন।'

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ পত্রাবলীতে লিখেছেন (যোগক্ষেম, ১৮৯)—

যতদিন না আমরা মুক্ত হইতেছি আমাদের will কিরূপে Free will হইবে? Free souls ইচ্ছামাত্র সব করিতে পারেন। But our will is fettered by the laws of the mind *i. e.*, by time, space and causation. সুতরাং ইহাকে Free will বলা যাইবে না। Human will হইতেছে সেই Highest Knowledge বা Free will-এর transformation through time, space and causa-

tion। এই তিনকে transcend করিতে human will-ই তখন Free will-এ রূপান্তরিত হয়—উহা Freedom হইতে আসিয়াছে ও তাহাতেই ফিরিয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ তাঁর ব্যাখ্যাত শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার* ভূমিকায় নতুন ধরনের উদাহরণ দিয়েছেন—তিনি বলেছেন, 'স্বাধীনভাবে কর্ম করার ক্ষমতা মানুষের আছে। তাই আচার্য সমস্ত জীবনদর্শন ব্যাখ্যা করে অর্জুনকে নিজ ইচ্ছামত কর্ম করতে নির্দেশ দিয়েছেন। গীতার সমস্ত শিক্ষা মানুষকে কল্যাণের পথ বেছে নিতে বলছে এবং সচেতন প্রকাশ দ্বারা অভীষ্ট লাভ করতে বলছে।...

'পূর্বেকার কর্ম দ্বারাই আমাদের কুল, বংশগতি ও প্রতিবেশ নির্ধারিত হয়। কিন্তু ইহজন্মের দিক থেকে যদি দেখি তো বুঝি যে আমাদের জাতি, কুল, পিতামাতা বা সামাজিক মর্যাদা আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করা হয় না। কিন্তু এই পরিসীমার মধ্যে আমাদের বেছে নেবার স্বাধীনতা আছে। জীবন তাসের ব্রিজ খেলার মতো। খেলাটা আমরা উদ্ভাবনও করি নি আর তাসের আকার প্রকারও আমরা স্থির করি নি। নিয়মকানুনও অন্যে বেঁধে দিয়েছে, আর কার ভাগ্যে কি কি তাস পড়বে তাও খেলোয়াড়রা স্থির করতে পারে না। অথচ যে তাস আমাদের বণ্টন করে দেওয়া হয়, ভাল হোক বা মন্দ হোক তাই নিয়েই খেলতে হবে। এ পর্যন্ত খেলোয়াড়রা সম্পূর্ণ নিয়তির অধীন। তা সত্ত্বেও খেলার ভাল মন্দ আছে। দক্ষ খেলোয়াড় খারাপ হাত পেয়েও গেম জিততে পারে আর খারাপ খেলোয়াড় ভাল হাত পেয়েও সব গোলমাল করে ফেলে। আমাদের জীবনও বাধ্যতা ও স্বাধীনতা, দৈব ও নির্বাচনের মিশ্রণ। যথোপযুক্ত নির্বাচন দ্বারা আমরা সমস্ত উপাদানগুলিকে স্থিরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে প্রাকৃতিক নিয়তিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতে পারি।'

কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণ 'স্বাধীন ইচ্ছা' সম্বন্ধে বলেছেন—'তিনিই সব করছেন। যদি বল তা হলে লোকে পাপ করতে পারে। তা নয়—যার ঠিক ঠিক

* অনুবাদ—শ্রীশুভেন্দ্রকুমার মিত্র

বোধ হয়েছে 'ঈশ্বরই কর্তা আমি অকর্তা' তার আর বেতালে পা পড়ে না। 'ইংলিশম্যানরা যাকে স্বাধীন-ইচ্ছা বলে, সেই স্বাধীন-ইচ্ছা বোধ তিনিই দিয়ে রাখেন। যারা তাঁকে লাভ করে নাই, তাদের ভিতর এই স্বাধীন-ইচ্ছা বোধ না দিলে পাপের বৃদ্ধি হত। নিজের দোষে পাপ করছি, এ বোধ যদি তিনি না দিতেন, তা হলে পাপের আরও বৃদ্ধি হত।

'যারা তাঁকে লাভ করেছে, তারা জানে দেখতেই 'স্বাধীন-ইচ্ছা'—বস্তুত তিনি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র। তিনি ইঞ্জিনিয়ার আমি গাড়ী।'

স্বাধীন-ইচ্ছা সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, (বাণী ও রচনা ৩য়)—'ইচ্ছাকে স্বাধীন বলা একেবারে নিরর্থক। যখনই সেই অনন্ত সত্তা যেন এই মায়াজালের মধ্যে পড়ে, তখনই উহা ইচ্ছার আকার ধারণ করে। ইচ্ছা মায়াজালে আবদ্ধ সেই পুরুষের কিঞ্চিদংশ মাত্র, সুতরাং 'স্বাধীন-ইচ্ছা' বাক্যটির কোনো অর্থ নাই, উহা সম্পূর্ণ নিরর্থক।'

স্বাধীন ইচ্ছা সম্বন্ধে শ্রীমকে প্রশ্ন করা হলে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কথা উল্লেখ করে বলেন (শ্রীম-দর্শন ২।৭।২), 'ওয়েস্টে কত বড় বড় লোক এ বিষয়ে মাথা ঘামিয়েছেন—The problem of free will and predestination। ঠাকুর কিন্তু একটি ছোট গল্প বলে এ সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন। কেশব সেনকে বলেছিলেন, এক জমিদারের এক নায়েব আছে। সেই দেখেশুনে জমিদারী। প্রজাদের বিবাদের বিচার করে। একদিন জমিদার এসেছে inspection করতে। কাচারীতে সাদা ফরাসের চাদর পাতা। তার উপর তাকিয়া ঠেসান দিয়ে জমিদার বসে আছে। নায়েব দাঁড়িয়ে আছে। প্রজারা সব এসেছে। অন্যদিনের মতো নায়েবের কাছে নালিশ করছে, অমুক আমার অমুক করেছে। নায়েব জমিদারকে দেখিয়ে দিয়ে বললে, ঐ মালিক আজ নিজে উপস্থিত, ওঁকে সব বল। আমার হাতে কিছু নাই। আজ কর্তা এসেছেন, তাই নায়েবের কোনো কর্তৃত্ব নাই। ঠিক এইরূপ, ঈশ্বর দর্শন হলে বোঝা যায় ঈশ্বরই কর্তা, মানুষ অকর্তা। যতদিন তা না হয় মনে হয় যেন স্বতন্ত্র। সাক্ষাৎ হলে দেখতে পায় সব পরতন্ত্র—ঈশ্বরের অধীন। 'আমি' খুঁজে পাওয়া যায় না—

যেমন ঠাকুরের হয়েছিল। ওদেশের লোকেদের ঈশ্বর কি বস্তু তারই জ্ঞান নেই। এসব বুঝবে কি করে?'

স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্য 'নিবন্ধ গ্রন্থাবলী'তে বলেছেন, 'স্বাধীন ইচ্ছা হয় কিরূপে? তাহার কি কোন কারণ নাই? যদি কারণ না থাকে অর্থাৎ বিনা কারণেই স্বাধীন ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে উহা সঙ্গত হইতে পারে। কিন্তু কোন ঘটনা কারণ ব্যতীত ঘটে না। সুতরাং স্বাধীন ইচ্ছারও কারণ আছে। স্বাধীন ইচ্ছা বিচারাদি করিয়া হয়, সুতরাং বিচারাদি উহার কারণ, মনের স্বভাব বিশেষও মনের স্বাধীন ইচ্ছার কারণ। আবার বিচারাদির কারণ কতকগুলি পারিপার্শ্বিক ঘটনাদি হইতে পারে। অতএব স্বাধীন ইচ্ছাও নিষ্কারণে হয় না। যদি এমন জ্ঞানশক্তি থাকে যদ্দারা সমস্ত কারণ জানা যায়, তাহা হইলে স্বাধীন ইচ্ছারও কারণ জানা যাইবে।'

এই বিচারেও স্বাধীন ইচ্ছা বস্তুত স্বাধীন নয়, কার্যকারণের নিয়মের অধীন।

অনির্বাণ বলেছেন (প্রবচন, পত্র ৯), 'The Divine Will is evolving itself in endless ways. 'অমনটি না হয়ে এমনটি কেন হ'ল না'—এ আমাদের ছেলেমানুষী, ভাই!

'আমাদের ইচ্ছার পরাভবেই তো তাঁর শক্তির পরিচয়। খণ্ড ইচ্ছাতেই পরাধীনতা—অখণ্ড বিরাট ইচ্ছা যে স্বাধীন!

'Ours wills are ours to make them thine.' চূর্ণ হয়ে যাক বাসনার বিক্ষোভ, অথবা পূর্ণ হোক তার আকুতি—দ্রষ্টার কাছে দুই-ই কি তুল্যমূল্য নয়?'

শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে 'রামের ইচ্ছা' গল্পটি শুনে 'শ্রীম'র হৃদয়ে যে দিব্যভাব স্ফুরিত হয়েছিল, কথামৃতে তা বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন—'রামের ইচ্ছা' এটি তো বেশ কথা! এতে তো Predestination আর Free will, Liberty আর Necessity—এসব ঝগড়া মিটে যাচ্ছে।···সৎ ইচ্ছা, অসৎ ইচ্ছা তিনি দিয়েছেন। কিন্তু তিনি যদি সব করেছেন, sense of responsibility তো যায়? তা যাবে কেন? ঈশ্বরকে না জানলে, তাঁর

দর্শন না হলে 'রামের ইচ্ছা' এইটি ষোল আনা বোধই হবে না। তাঁকে লাভ না করলে এটি এক-একবার বোধহয়, আবার ভুল হয়ে যাবে। যতক্ষণ না পূর্ণ বিশ্বাস হয়, ততক্ষণ পাপ-পুণ্য বোধ, responsibility বোধ থাকবেই থাকবে। ঠাকুর বুঝালেন, 'রামের ইচ্ছা'। তোতা পাখির মতো 'রামের ইচ্ছা' মুখে বললেই হয় না। যতক্ষণ ঈশ্বরকে জানা না হয়, তাঁর ইচ্ছায় আমার ইচ্ছা এক না হয়, যতক্ষণ না 'আমি যন্ত্র' ঠিক বোধ হয়, ততক্ষণ তিনি পাপ-পুণ্য বোধ, সুখ-দুঃখ বোধ রেখে দেন। Sense of responsibility রেখে দেন। তা না হলে তাঁর মায়ার সংসার কেমন করে চলবে?'

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন অসুস্থ অবস্থায় কলকাতায় শ্যামপুকুরে অবস্থান করছেন, তখন ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁর চিকিৎসা উপলক্ষে প্রায়ই সে বাড়িতে আসতেন। সেখানে ধর্মপ্রসঙ্গে নানা আলোচনা হত। একদিন গিরিশ ঘোষ, মাস্টার মশায় উপস্থিত আছেন, সে সময় স্বাধীন ইচ্ছা নিয়ে কথা উঠল (কথামৃত ১ম)। ডাক্তার সরকার বললেন, 'Free will তিনিই দিয়েছেন তো। আমি মনে করলে ঈশ্বর চিন্তা করতে পারি, আবার না করলে না করতে পারি।'

গিরিশ—আপনার ঈশ্বর চিন্তা বা অন্য কোন সৎকাজ ভাল লাগে বলে করেন। আপনি করেন না, সেই ভাল লাগাটা করায়।

ডাক্তার—কেন, আমি কর্তব্য কর্ম বলে করি—

গিরিশ—সেও, কর্তব্যকর্ম করতে ভাল লাগে বলে।···

শ্রীরামকৃষ্ণ—কর্ম করতে গেলে আগে একটি বিশ্বাস চাই, সেই সঙ্গে জিনিসটি মনে করে আনন্দ হয়, তবে সে ব্যক্তি কাজে প্রবৃত্ত হয়। মাটির নীচে এক ঘড়া মোহর আছে—এই জ্ঞান, এই বিশ্বাস প্রথমে চাই। ঘড়া মনে করে সেই সঙ্গে আনন্দ হয়—তারপর খোঁড়ে। খুঁড়তে খুঁড়তে ঠং শব্দ হলে আনন্দ বাড়ে। তারপর ঘড়ার কানা দেখা যায়। তখন আনন্দ আরও বাড়ে। এই রকম ক্রমে ক্রমে আনন্দ বাড়তে থাকে।···

ডাক্তার—এইরূপ মনের ইনক্লিনেশন (কর্তব্য কর্মের দিকে মনের গতি)।

মাস্টার—পোড়া স্বভাবে টানে! যদি একদিকে ঝোঁকই হলো, Free will কোথায়?

ডাক্তার—আমি Free একেবারে বলছি না। গরু খুঁটিতে বাঁধা আছে, দড়ি যতদূর যায়, তার ভিতর ফ্রি। দড়ি টান পড়লে আবার····। ডিউটির ভিতর দুটো এলিমেণ্ট—(১) ডিউটি বলে কর্তব্য কর্ম করতে যাই, (২) পরে আহ্লাদ হয়। কিন্তু initial stage-এ আনন্দ হবে বলে যাই না।

মাস্টার (স্বগত)—পরে আনন্দ, কি সঙ্গে সঙ্গে মনে করে আহ্লাদ হয়, বলা কঠিন। আনন্দের জোরে কার্য হলে, Free will কোথায়?

শ্রীমদ্ভগবদগীতায় ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীজগদীশ ঘোষ লিখেছেন(১৮।৬১)—'পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র্য (Freedom of the will) সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়াছেন, কিন্তু কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছেন বলিয়া বোধহয় না। আর্য ঋষিগণ সাংখ্য-বেদান্তাদি শাস্ত্রে মনস্তত্ত্ব ও আত্মতত্ত্বের যে সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে 'ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র্য' শব্দটিই একরূপ অর্থহীন। কারণ ইচ্ছা মনের ধর্ম, মন বুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়। মন বুদ্ধি প্রকৃতিরই পরিণাম এবং প্রকৃতি গুণানুসারেই বিভিন্ন হয়, সুতরাং ইচ্ছাও সর্বদাই প্রকৃতির অধীন—উহার স্বাতন্ত্র্য নাই। উহার স্বাতন্ত্র্য তখনই হয় যখন জীব ত্রিগুণাতীত বা নিত্যসত্ত্বস্থ হয় অর্থাৎ জীবের স্বাতন্ত্র্য ইচ্ছা থাকে না। যখন জীবের ইচ্ছা এবং ঈশ্বরেচ্ছা এক হইয়া যায়—প্রকৃতপক্ষে উহা আত্ম-স্বাতন্ত্র্য, ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র্য নহে।'

এই আলোচনা থেকে পাওয়া যাচ্ছে যে স্বাধীন ইচ্ছা নেই, সবই ঈশ্বরেচ্ছা। সাধারণ যুক্তিতেও ফ্রি উইল বা স্বাধীন ইচ্ছা প্রমাণ করা যায় না। সাধারণ ইচ্ছাও আনন্দ লাভের বা বিশেষ ঝোঁকের অধীন।

পণ্ডিত ও সাধক গোপীনাথ কবিরাজ কর্মবাদ ও কৃপাবাদ সম্বন্ধে 'স্বসংবেদনে' বর্ণনা করেছেন, 'কর্মদৃষ্টিতে বলিতে হয় যে যার যেমন যোগ্যতা, ঈশ্বর তাহাকে তেমন শক্তিই দেন। বেশীও নহে, কমও নহে। অহংভাবের প্রাধান্যে এই দৃষ্টি হয়। ইহাই কর্মবাদ। যেমন কর্ম জীবের;

তেমন ফলের দাতা ঈশ্বর। জীবের যোগ্যতা কেন ভিন্ন হয় তাহার জন্য ঈশ্বর দায়ী হন না। যোগ্যতা বা আধার যেমন, ঈশ্বর তেমনি শক্তি দেন বিচারপূর্বক। ইহাই ন্যায়, নীতি বা কর্মরহস্য। এখানে জীবের ইচ্ছা প্রধান। কেন জীবের ইচ্ছা শুভ ও প্রবল হয়, কোথায় বা প্রবল হয় না —কারণ কেহই জানে না।

'আর ভক্তিদৃষ্টিতে বলিতে হয়—ঈশ্বর যেমন দিতেছেন, তাহার সেই প্রকার যোগ্যতা হইতেছে। জীবের কর্ম ও কর্মফল কথার কথা। যে পরিমাণ শক্তি জীব পায় তাহার যোগ্যতা বা আধার ততটুকুই হয়—বেশীও নহে, কমও নহে। অহং ভাব কাটিলে এই দৃষ্টি হয়। ইহাই কৃপাবাদ। ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন শক্তি কেন দেন, তাহার জন্য জীবের কর্ম দায়ী নহে। কারণ জীবের কর্ম তো তেমনই হইবে যেমন প্রেরণা ঈশ্বর হইতে সে পাইবে। জীব তো তাঁহারই হাতের পুতুল মাত্র। এখানে ঈশ্বরের ইচ্ছাই প্রধান। ঈশ্বরের ইচ্ছা কেন বিভিন্ন হয়, তাহার কারণ কেহই জানে না।

'...ঈশ্বর ও জীব উভয়েই যেখানে এক, তিনিই পরাৎপর পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন, তিনিই স্বভাব। তাঁহার স্ফুরণই মূল—ইহাই ঈশ্বরের কৃপারূপে, জীবের পুরুষকাররূপে প্রকাশ পায়। উহা স্বতন্ত্র। তাহাই অহেতুক নিত্য।'

স্বামী অদ্ভুতানন্দজীর উক্তি (উদ্বোধন ১৩৮৬) 'ভগবানকে ডাকলে তিনি বাধা বিঘ্ন সব কাটিয়ে দেন—কর্মফল কাটিয়ে দেন। তিনি সৃষ্টিকর্তা। তিনি ইচ্ছা করলে কী না করতে পারেন।

'ভগবান কাউকে কর্ম না করিয়ে দয়া করেন, আর কাউকে কর্ম করিয়ে দয়া করেন—সে ভগবানের খুশী। ভগবানই আমাদের কাজের মধ্যে রেখেছেন —তিনি ইচ্ছা করলে আমাদের কর্মের পাশ কেটে দিতে পারেন।'

এখানে ঈশ্বরেচ্ছার সঙ্গে কর্মবাদের কথায় বলা হয়েছে, ঈশ্বরেচ্ছা প্রবল হলে কর্মফলকে খণ্ডন করে দিতে পারে—এ কথা জানা যাচ্ছে। কর্মবাদীরা একথা মেনে নাও নিতে পারেন। স্বামী শিবানন্দ (মহাপুরুষ মহারাজ) কর্মবাদ ও ঈশ্বরেচ্ছার সামঞ্জস্য বিধান করে বলেছেন—

'সর্বশক্তিমান করুণাময় শ্রীভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস ও কর্মবাদকে যদি একই মতবাদের অঙ্গ বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে উহারা পরস্পর সামঞ্জস্যহীন হইয়া পড়ে। বস্তুত যাঁহারা কর্মবাদে বিশ্বাসী, তাঁহারা উপরি-উক্ত গুণসম্পন্ন শ্রীভগবানে বিশ্বাসী নহেন। আবার যাঁহাদের শ্রীভগবান সম্বন্ধে ঐরূপ ধারণা, তাঁহারা কর্মবাদকে অতটা আমল দেন না। তাঁহারা বলেন, সুখ-দুঃখ কর্মের অপেক্ষা না রাখিয়া সম্পূর্ণ শ্রীভগবানের ইচ্ছায় আমাদের কল্যাণের জন্যই হইয়া থাকে।'

স্বামী অখণ্ডানন্দ বলেছেন, 'প্রকৃত ভক্ত যারা তারা কিছু দেখলেই মনে করে এ ভগবানের খেলা। তোমরা দেখছ, পাতা নড়ছে, বাতাস বইছে। কিন্তু ভক্ত মনে করে—তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত গাছের একটি পাতাও নড়তে পারে না।'

একজন পরিচিত স্বামীজী একটি ঘটনার কথা বললেন। একটি সরকারী অফিসে কোনও কাজের উপলক্ষে গেলে কয়েকজন ভদ্রলোক তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ভগবানের ইচ্ছায়ই যে জগত চলছে, এ কথা কি সত্যি ?

স্বামীজী—হ্যাঁ, তা সত্যি।

—কেন, মানুষ কি স্বাধীনভাবে কিছু করতে পারে না ?

—দেখুন, আপনারা এই অফিসে কাজ করছেন, আপনারা কি নিজের ইচ্ছেমত কাজ করে যাচ্ছেন, না আপনাদের বড়বাবু যেমন বলে দিচ্ছেন তেমন করছেন ? বড়বাবু আবার অফিসারের নির্দেশমত কাজ করেন। অফিসার আবার বড় সায়েব বা বড় অফিসারের নির্দেশে কাজ করেন। আর যিনি এই বিভাগের ডিরেক্টর তিনি সর্বময় কর্তা।

'কিন্তু ডিরেক্টরের ওপরে আরও কর্তা বা সচিব বা মন্ত্রী আছেন। কাজেই আপনারা স্বাধীন কোথায় ? তবে হ্যাঁ, চিন্তা, বুদ্ধিদ্বারা বিবেচনা করে কাজ করার মত সীমিত স্বাধীনতা আছে। তাই নয় কি ?'

গরু দড়ি দিয়ে খুঁটিতে বাঁধা। গরুটি ওই খুঁটি অতিক্রম করে যেতে পারে না। তবে কারও দড়িটি ছোট, কারও লম্বা—এই মাত্র তফাত। তেমনি এই বিশ্ব যিনি রচনা করেছেন, তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কি আমরা চলতে পারি ?

তিনি অন্তর্যামীরূপে আমাদের বুদ্ধি, প্রেরণা দিচ্ছেন, আমাদের পরিচালনা করছেন। স্বাধীন ইচ্ছার মনোভাবটিও তিনি আমাদের দিয়ে রেখেছেন—বাস্তবিক স্বাধীন ইচ্ছা বলতে কিছু নেই।

কাজেই ভগবানের ইচ্ছায়ই যদি জগত চলে তাহলে আমাদের দুঃখ করবার কী থাকে? শোক আফসোস কিছু তো আমাদের করার নেই। তাঁর ইচ্ছাকে মেনে নিয়ে তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে মানুষের ইচ্ছা মিলিয়ে দেওয়াই তো ভাল। তথাকথিত কর্মবাদীদের ও স্বাধীন ইচ্ছাবাদীদের চেয়ে শরণাগত ভক্ত অনেক বেশী শান্তির অধিকারী হতে পারে।

কর্মবাদকে বাদ দিয়ে আর এক ধরনের ইচ্ছা মানুষের হয়ে থাকে—তার মধ্যে শুভাশুভ মিশ্রিত কর্মফল কিছু আছে বলে মনে হয় না। যদি কর্মফল না থাকে তবে বিধির বিধানেরও প্রশ্ন হয় না। তাহলে ঈশ্বরেচ্ছা এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে না।

যেমন, আমার তেষ্টা পেয়েছে, আমার জল খাবার ইচ্ছে হলো। ক্ষিদে পেয়েছে, খাবার ইচ্ছে হলো। ক্লান্ত হয়েছি, ঘুমের ইচ্ছে হলো। স্নান করার সময়ে স্নানে যেতে হবে, মুখ হাত ধোয়ার সময় কলে বা পুকুরে যেতে হবে। ক্ষিদে পায় নি, আজ খাব না। শরীর খারাপ হয়েছে, আজ অফিসে যাব না। এরূপ অসংখ্য ছোটখাট ইচ্ছা অনিচ্ছা আমাদের নিত্য লেগে থাকে। সব সময়ই এ রকম ইচ্ছা অনিচ্ছার সম্মুখীন মানুষ হয়ে থাকে। এই সকল ইচ্ছাও কি ঈশ্বর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত? তা না হলে কীভাবে বলা হয়, তাঁর ইচ্ছা না হলে গাছের পাতাটিও নড়ে না।

এই ইচ্ছা অনিচ্ছার পেছনে কর্মবাদকে ধরা হবে না এই জন্যে যে এই ইচ্ছার পেছনে কামনা বাসনা নেই। শুধু শরীর ও মনের অতি সাধারণ প্রয়োজন মেটানোর জন্যেই এই ইচ্ছা। কামনা, বাসনা, আসক্তি পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে ফল বিধান করে। ক্ষিদে মেটাবার জন্যে নিত্য অভ্যস্ত খাবার খাওয়ার ইচ্ছা আর ভালো ভালো খাবার লোভের বশবর্তী হয়ে খাওয়ার ইচ্ছায় অনেক তফাত আছে। কাম ক্রোধ লোভ ইত্যাদি রিপু বাসনাপ্রসূত সংস্কারের দ্বারাই ইচ্ছা-অনিচ্ছারূপে প্রকাশ পায়। কিন্তু

জীবনধারণ ও শরীর রক্ষার জন্য সাধারণ ইচ্ছা অনিচ্ছা সংস্কারজাত নয়, অভ্যাসপ্রসূত বা শারীর ধর্মজাত—এরূপ বলা যায়।

একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। আমাদের শরীরের যাবতীয় কাজ স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্ক কেন্দ্র থেকে মন দ্বারা পরিচালিত হয়। পায়ে একটি মশা কামড়াচ্ছে, স্নায়ুর মাধ্যমে খবর গেল মস্তিষ্কে, মস্তিষ্ক থেকে মনে, মন থেকে বুদ্ধিতে। বুদ্ধি যখন প্রতিক্রিয়া করে তখনই আমরা বুঝতে পারি মশা কামড়াচ্ছে। মন নির্দেশ দিলে মশাকে তাড়িয়ে দিই বা মেরে ফেলি। মন স্নায়ুর মাধ্যমে শরীরের যাবতীয় কাজ নির্বাহ করে এবং পরিচালিত করে। যখন মন ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে তখন আমরাও ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুমের মধ্যেই অনেক সময় দেখা যায় মশায় কামড়ালে হাত সে জায়গায় চলে যায়, চুলকায়—যদিও অজ্ঞাতসারে। এ কী করে সম্ভব হয়? শারীর-বিদ্যার মতে এটি একটি প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Reflex Action)। ঘুমের মধ্যে মন কাজ না করলেও কয়েকটি স্নায়ুকেন্দ্র মনের দায়িত্ব খানিকটা পালন করে—যন্ত্রণা অনুভব করে এবং চুলকে যন্ত্রণা উপশম করার চেষ্টা করে। ছোট ছোট শারীরিক কাজই এইরূপ প্রতিবর্ত-ক্রিয়া দ্বারা সম্পন্ন হয়। নিত্য প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক কাজকর্মের মধ্যে বাসনা-বিযুক্ত মন ইচ্ছা অনিচ্ছা প্রকাশ দ্বারা ছোটখাট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে—প্রতিবর্ত-ক্রিয়ার মতোই। অভ্যাসবশেই এই কাজগুলো হয়। জীবন্মুক্ত পুরুষ যেমন কামনা-বাসনা-হীন হয়ে অভ্যাসবশত এ জগতে বিচরণ করেন, কর্মাদি নির্বাহ করেন এবং তদ্দ্বারা তাঁদের কোনো কর্মসংস্কার উৎপন্ন হয় না—তেমনি শরীর মনের প্রয়োজনীয় অতি সাধারণ কর্মাদি কামনাশূন্য অভ্যাসবশতই সাধারণ ইচ্ছা-অনিচ্ছা প্রকাশদ্বারা সম্পন্ন হয়। এ দ্বারা কর্মফল উৎপন্ন হয় না। এ সব ইচ্ছা-অনিচ্ছা দ্বারা সম্পন্ন কর্মকে নিষ্কাম কর্মও বলা যায় না—অভ্যাসবশত কামনা শূন্য কর্ম মাত্র।

তবে যেহেতু এগুলোও কর্ম, সেজন্য এর কার্য-কারণ সম্বন্ধ নিশ্চয়ই আছে—এই সাধারণ ইচ্ছারও কারণ আছে। কারণেরও কারণ থাকে, সেই বিচারে সকল কর্মই সর্ব কারণের কারণ ঈশ্বরে পর্যবসিত হয়। তাই এই সব ছোটখাট ইচ্ছা-অনিচ্ছাও ঈশ্বরেচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হয়। সেইজন্যই বলা যায়—ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া গাছের পাতাটিও নড়ে না।

৬

শরণাগতির সাধন

অনেকে বলে থাকেন যে শরণাগতির কোনো নিজস্ব সাধন পদ্ধতি নেই, শরণাগতি সিদ্ধের একটি অবস্থা মাত্র। সাধকেরা বিভিন্ন সাধনপথ অবলম্বন করে যখন সিদ্ধিলাভ করেন তখন তার ফলস্বরূপ শরণাগতির অবস্থা তাঁদের আপনা থেকেই এসে যায়—এজন্য পৃথক সাধনা করতে হয় না। আবার কেউ কেউ বলেন যে শরণাগতি সাধকের একটি আশ্রিত ভাব মাত্র। সাধক তাঁর নির্দিষ্ট সাধনপথে যখন এগিয়ে চলেন তখন শরণাগতির ভাবটিকেও তিনি গ্রহণ করেন।

অনেক সাধক বা শাস্ত্রের মতে শরণাগতির নিজস্ব সাধন-পদ্ধতি আছে। শরণাগতির পথকে অবলম্বন করে ভাগবদ্-তত্ত্বে পৌঁছানো যায় এবং এ পথ অন্য কোনো সাধনার পথের চেয়ে সহজ পথ যা অতি সাধারণ মানুষও গ্রহণ করতে পারে। প্রাচীন শাস্ত্র, মহাপুরুষ, মনীষী, সাধক ও অবতারপুরুষগণের বাক্যে, বাণীতে ও জীবনে এ কথার অনেক সমর্থন পাওয়া যায়।

পাঞ্চরাত্রসংহিতা প্রভৃতি ভক্তিশাস্ত্র মতে শরণাগতি একটি সাধনার পথ। 'ভাগবতধর্মের প্রাচীন ইতিহাস' পুস্তকে স্বামী বিদ্যারণ্য বলেছেন, 'অহির্বুধ্ন্য সংহিতায় শরণাগতির বা ন্যাসের সর্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসা দেখা যায়। তন্মতে উহা এক স্বতন্ত্র এবং সুপর্যাপ্ত সাধন।'

উক্ত সংহিতায় বলা হয়েছে—'সকাম ব্যক্তিগণ অপর নানাপ্রকার সাধন-সমূহের দ্বারা যে যে অভীষ্ট বস্তু লাভ করিতে সমর্থ হয় না—এবং মুমুক্ষুগণ সাংখ্য, যোগ কিংবা ভক্তিদ্বারা পুনরাবর্তন বিরহিত যেই পরমধাম পাইতে পারে না, ন্যাস (ত্যাগ) দ্বারা তাহা তাহা নিশ্চয় লাভ করা

যায়। উহা দ্বারা পরমাত্মা নিশ্চয় সিদ্ধ হয়। এইরূপে দেখা যায়, ন্যাস পরমাত্মা লাভের কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ অপেক্ষা পৃথক এবং শ্রেষ্ঠ সাধন।'*

এই সংহিতার মতে শরণাগতের অপর কোনো কর্তব্য থাকে না। এক ন্যাস-মাত্রই সমস্ত তপস্যা, যজ্ঞ, দান ও তীর্থ কী প্রকারে সিদ্ধ হয়, নারদের এই প্রশ্নের উত্তরে অহির্বুধ্ন বলেন, 'যে সকল তপস্যা নিঃশ্রেয় সার্থক বলিয়া চোদিত হয়, ন্যাস সেই সকল তপস্যার অতিরিক্ত তপঃ বলিয়া শ্রুত হয়।'**

যামুনাচার্যও 'স্তোত্ররত্নে' শরণাগতিকে ধর্ম-নিষ্ঠাবান, আত্মবিদ বা ভক্তি-মানদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সাধন হিসাবে বর্ণনা করেছেন। ব্রহ্ম পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে ধ্যান-যোগ বিবর্জিত হলেও শুধুমাত্র শরণ গ্রহণ দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়।

অতএব দেখা যায় যে ভক্তিশাস্ত্রমতে ন্যাস বা শরণাগতি এক প্রকার তপস্যা এবং অপর সমস্ত তপস্যার মতো একটি শ্রেষ্ঠ তপস্যা। অপর সমস্ত তপস্যা দ্বারা যা লাভ হয় শরণাগতি দ্বারাও তা লাভ হতে পারে। সুতরাং একথা বলা যায় যে ঠিক ঠিক শরণাগত হতে পারলে ইষ্টলাভ ও মুক্তির জন্য আর কিছু করার দরকার হয় না। তবে নব্যপাঞ্চরাত্রবাদীদের (পরবর্তী ভক্তিবাদী) মতে প্রপত্তির স্বতন্ত্র সাধন স্বীকৃত হয় না। ভক্তি ও প্রপত্তির ঐক্য তাঁরা মানেন। ভক্তি ও প্রপত্তির অঙ্গাঙ্গিত্ব অনেক স্থলেই দেখা যায়।*** তাই বলা যায় শরণাগতির সাধন একটি সহজ সাধন, অন্যদিক থেকে আবার কঠিনও বটে।

(১) শরণাগতি সাধনার অধিকারী কে ?

সমস্ত সাধনারই অধিকারী নির্ণীত হয় সর্বাগ্রে। শরণাগতিতেও অধিকারী

* ভাগবতধর্মের প্রাচীন ইতিহাস—স্বামী বিদ্যারণ্য

** ভাগবতধর্মের প্রাচীন ইতিহাস—স্বামী বিদ্যারণ্য

*** ভাগবতধর্মের প্রাচীন ইতিহাস—স্বামী বিদ্যারণ্য

নির্ণয় করার প্রয়োজন আছে। তবে শরণাগতি এমন একটি সাধন যাতে সকলের, সকল স্তরের মানুষেরই অধিকার স্বীকৃত হয়। ভারদ্বাজ সংহিতায় (নারদ পঞ্চরাত্র ১।১৫) বলা হয়েছে যে—'প্রপত্তিতে সকলেরই অধিকার আছে। এই ন্যাস-যোগ নিশ্চয় কিছুরই অপেক্ষা রাখে না—জাতিভেদের নহে, কুলের নহে, লিঙ্গের নহে, গুণের বা ক্রিয়ার নহে, দেশের বা কালের নহে এবং অবস্থারও নহে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং স্ত্রীগণ, তথা অন্তরজ-গণ, সকলেই সর্বধাতা অচ্যুতে প্রপন্ন হইতে পারে।' নারদপঞ্চরাত্রে আরও বলা হয়েছে—অকিঞ্চন, গুণহীন—সকলেই প্রপত্তি প্রাপ্ত হতে পারে। অকিঞ্চন অর্থে—মুক্তির ইচ্ছা নাই, শুধু ভক্তি চাই। লক্ষ্মীতন্ত্রে আছে যে, জ্ঞানী এবং অজ্ঞানী শরণাগতিকে আশ্রয় করতে পারে।*

যাঁরা শুদ্ধ অদ্বৈতবাদী জ্ঞানযোগী তাঁরা জগদ্‌ব্রহ্মবুদ্ধিতে কর্ম করে থাকেন, ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম করেন না। ব্রহ্মার্পণ ভাবে জ্ঞানীরা অবস্থান করেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বা ভেদাভেদবাদীরাও এই কৌশলে কর্ম করতে পারেন। কিন্তু দ্বৈতবাদী সাধকগণ ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম করেন। তবে অদ্বৈতবাদী-গণও সাধক অবস্থায় উপাসনাকালে এবং ব্যবহারকালে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বা দ্বৈতবাদীদের মত এই জগত ব্রহ্মের—এই মত স্বীকার করে ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম করতে পারেন।

কারো কারো মতে যাঁরা জ্ঞানযোগী, ভক্তিযোগী, কর্মযোগী ও রাজযোগী, তাঁদের সাধনকে বলা হয় আত্মনির্ভরশীল সবল মুমুক্ষুগণের সাধন, আর পরনির্ভরশীল দুর্বল মুমুক্ষুগণের সাধনকে বলা হয় প্রপত্তি বা শরণাগতি। কিন্তু জ্ঞানী, ভক্ত, কর্মী বা যোগী নিজ নিজ সাধনপথে শরণাগতিকেও অবলম্বন করতে পারেন অথবা নিজ নিজ পথে সাধন সহায়ে সিদ্ধিলাভ করে শরণাগতিতে অবস্থান করতে পারেন। মোট কথা শরণাগতিতে অধিকার সকল স্তরের সকল পথের সাধকের।

স্বামী বিবেকানন্দ পরাভক্তি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে অধিকারী নির্ণয় করেছেন (বাণী ও রচনা ৪র্থ)—'...সকল প্রকার বৈরাগ্য অপেক্ষা ভক্তিযোগীর

* ভাগবতধর্মের প্রাচীন ইতিহাস

বৈরাগ্য খুব স্বাভাবিক। ইহাতে কোন কঠোরতা নাই, জোর করিয়া কিছু ছাড়িতে হয় না। ভক্তের ত্যাগ অতি সহজ।···ভক্তের ত্যাগ—ভগবানের প্রতি প্রবল আকর্ষণ, তাহার সকল আসক্তিকে নাশ করিয়া দেয়।'

শরণাগতি ভক্তিযোগের একটি প্রধান অঙ্গ। তাই শরণাগতের এই স্বাভাবিক ত্যাগ বা বৈরাগ্যটুকু প্রয়োজন। ভগবানের প্রতি প্রবল অনুরাগ, জীবজগত বিষয়ে অনাসক্তি, আর প্রয়োজন শ্রদ্ধা অর্থাৎ এই দৃঢ় বিশ্বাস যে শরণাগতিতেই তার অভীষ্ট ফল লাভ হবে—এই ভাবের অধিকারী হলেই শরণাগতির সাধক এই পথে অগ্রসর হতে পারেন।

(২) শরণাগতির বিষয়টি কী?

পাঞ্চরাত্রসংহিতায় 'শরণ' শব্দের অর্থ বলা হয়েছে 'উপায়'। অহির্বুধ্ন্য-সংহিতায় শরণাগতি সম্বন্ধে বলা হয়েছে—'আমি অপরাধসমূহের আলয়। আমি অকিঞ্চন অর্থাৎ অপরাধসমূহের ক্ষালনোপযোগী সাধন-সম্পত্তি-বিরহিত এবং অগতি (উপায়বিহীন)। তুমি আমার উপায়ভূত হও। এই প্রার্থনারূপ যে মনোবৃত্তি তাই শরণাগতি।' ভরত মুনি নাট্যশাস্ত্রে বলেছেন—'নিজের অভীষ্ট অনন্যসাধ্য হলে তাঁর দ্বারাই আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে—এই মহা বিশ্বাসপূর্বক একমাত্র তাঁর উপায়তা প্রার্থনাই প্রপত্তি বা শরণাগতি।'*

যে নিরুপায়, যার কিছুই নাই সে তার অভীষ্ট লাভের জন্য এক সমর্থ ব্যক্তির দ্বারস্থ হতে পারে—তার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারে। রোগী যেমন ডাক্তারের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, শিশু যেমন পিতামাতার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে—তেমন নির্ভরতা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, বকলমা দেওয়া। উকিলকে যেমন ওকালতনামা লিখে দিতে হয় মক্কেলের হয়ে বিচারপতিকে আইনের যুক্তিতে সব কিছু বুঝিয়ে দেবার জন্যে বা বলার জন্যে—মক্কেলের সম্পূর্ণ নির্ভর উকিলের ওপর—সেইরূপ গুরুর ওপর, ঈশ্বরের ওপব বকলমা দেওয়া। নিজের আর কিছু করার থাকে না, নিজের

* ভাগবতধর্মের প্রাচীন ইতিহাস

ইচ্ছা থাকে না, ঈশ্বর যা করান, ঈশ্বর যেরূপ ইচ্ছা করেন সেরূপই কাজ করতে হবে।

আবার নিজের কোনো সংকল্প থাকবে না, নিজের বিচার দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণের মানসিকতা থাকবে না। শিশু যেমন মাকে ছাড়া কিছু জানে না, মা ছাড়া কিছু বুঝে না, জ্ঞানী যেমন ব্রহ্মাকারা বৃত্তি নিয়ে অবস্থান করেন, তেমনি যিনি শরণাগত হন, তাঁর নিজের ইষ্ট বা ঈশ্বর ছাড়া অন্য চিন্তা থাকবে না, তাঁর বৃত্তি হয়ে যায় যেন ঈশ্বরাকারা বৃত্তি। শরণাগতির বিষয়ও হবে এরূপ একটি অবস্থা লাভ।

(৩) শরণাগতির প্রয়োজন কী?

সাধন শাস্ত্রে অনুবন্ধ চতুষ্টয় রয়েছে (১) অধিকারী, (২) বিষয়, (৩) সম্বন্ধ, (৪) প্রয়োজন। শরণাগতি যদি একটি সাধন হয় অর্থাৎ শরণাগতিকে অবলম্বন করে যদি ঈশ্বর-লাভ, ঈশ্বর-দর্শন বা ব্রহ্মাত্মৈক্যানুভূতি লাভ হয়, তবে শরণাগতির প্রয়োজন অবশ্যই আছে।

শরণাগতি সাধনের ব্যাপারে 'ভক্তিসূত্রে' বলা হয়েছে—'জীবমাত্রই জ্ঞানে বা অজ্ঞানে ঈশ্বরে আশ্রিত।' ঈশ্বর এই জীব-জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি পালন করেছেন। আবার জীব-জগৎ ঈশ্বরেরই অংশ, ঈশ্বরেরই অন্তর্গত —সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে ঈশ্বর অনুস্যূত। অতএব জীবের আশ্রয় ঈশ্বর। একথা সকলেই আমরা বুঝি—এটি বাচনিক সত্য মাত্র, কিন্তু অনুভূতিতে তা আমাদের নেই। যতদিন আমাদের সে অনুভূতি না হয় ততদিন ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের কোনো ধারণা হয় না, কোনো ফলও লাভ হয় না।

আমরা যে ঈশ্বরে আশ্রিত এটি সত্য তত্ত্ব। আশ্রিতবোধ একটি সত্য— কিন্তু আমরা তা জানি না। সাধনা মানে আমরা যে আশ্রিত তা জানা। শরণাগতি দ্বারা তা জানা যায়। শরণাগতির সাধনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে 'ভক্তিসূত্রে' এভাবে বলা হয়েছে—

(ক) আত্মসমর্পণেই আশ্রিতবোধ জেগে উঠবে।

(খ) অহংকার নিষ্কারণ না হলে এই সম্যক আত্মসমর্পণ সম্ভব নয়।

(গ) আত্মসমর্পণ না হলে আশ্রয়েরও সন্ধান পাওয়া যায় না।

(ঘ) আশ্রয় যে কী তা জানতে না পারলে যোগ বা জীবব্রহ্মৈক্য জ্ঞান লাভ হয় না।

(ঙ) যাঁর সঙ্গে যুক্ত বা মিলিত হতে হবে, তাঁর সম্যক পরিচয়ের জন্যই এই প্রণিধানের বা আত্মসমর্পণের প্রয়োজন।

অতএব ঈশ্বর লাভের জন্যে, ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত বা মিলিত হবার জন্যে এবং জীবব্রহ্মৈক্য জ্ঞানলাভের জন্যে শরণাগতির সাধন প্রয়োজন।

(৪) শরণাগতিতে সম্বন্ধ আছে কি?

শরণাগতিদ্বারা জীবে ও ঈশ্বরে অথবা জীবে ও ব্রহ্মে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়—মিলিত হয় বা ঐক্যবোধ আসে। ফলে পরমপুরুষার্থ লাভ বা জীবনের উদ্দেশ্য সফল হয়। তাই শরণাগতি জীবের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্বন্ধের হেতু বা উপায়। এখানে একটি বোধ্য-বোধক ভাব রয়েছে। শরণাগতি দ্বারা ঈশ্বর বোধ্য হবেন, আর সাধক হবেন বোধক। শরণাগতি ঠিক ঠিক হলেই এই ভাবটি আসতে পারে। কোনো কোনো সাধক ঈশ্বরের সান্নিধ্যবোধ এভাবেই করেছিলেন। এই সম্বন্ধ লাভ বা ঐক্য লাভই সাধনার প্রধান উদ্দেশ্য।

শরণাগতির নিজস্ব সাধন-পদ্ধতি কী?

শরণাগতি নিজেই একটি সাধন। ভক্তিশাস্ত্রে কিছু কিছু পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। তবে 'শরণাগতি' এমন একটি ভাবধারা বলতে গেলে যা কোনো আচার-অনুষ্ঠান সাপেক্ষ নয়। এ একটি মানসিক ভাবের ব্যাপাব যার জন্যে বাহ্যিক ক্রিয়াকর্মের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। শরণাগতি ঈশ্বরের সঙ্গে একটি ভাবের সম্পর্ক। ভাবের দিক থেকে তাঁতে নির্ভর করা। এই ভাব নিয়ে চলা যে তিনিই করছেন, করাচ্ছেন। তবু কোনো কোনো ভক্তি-শাস্ত্রে বৈধী অনুষ্ঠানের কথা বলা হয় যা শরণাগতি লাভে সহায়ক হয়। সাধক, মহাপুরুষ ও অবতারগণের জীবন ও বাণী এবং পথ-নির্দেশ এ পথে সাধনের কিছু কিছু ইঙ্গিত দেয়। তাঁদের আচার-আচরণের মধ্যে, দৈনিক

জীবনযাত্রার মধ্যে, তাঁদের কর্মপ্রণালীর মধ্যে শরণাগতির এমন একটা অবস্থা ফুটে ওঠে যার ফলে এই পথে সাধন-রহস্য অনুধাবন করা যেতে পারে।

পূর্বে শরণাগতির তিনটি দিক সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা লক্ষ্য রেখে শরণাগতির সাধন হিসাবে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। পৃথক পৃথক ভাবে এগুলো সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পরে করা হলো।

সাধনার প্রকার :—

১। (ক) সমর্পণ—শাস্ত্রীয় উক্তি
(খ) সমর্পণ—মহাজনের উক্তি
(গ) সমর্পণ—প্রার্থনা
(ঘ) সমর্পণ—বিবিধ

২। ইচ্ছা-লয়

৩। কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয়

সমর্পণ

১। (ক) **সমর্পণ—শাস্ত্রীয় উক্তি**

অহির্বুধ্ন্য সংহিতায় এবং কোনো কোনো পঞ্চরাত্রসংহিতায় (যেমন, নারদ-পাঞ্চরাত্র) বলা হয়েছে যে শরণাগতির ছয়টি অঙ্গ। যথা—(১) আনুকূল্যের সংকল্প, (২) প্রাতিকূল্যের বর্জন, (৩) তিনি রক্ষা করবেন এই বিশ্বাস, (৪) তাঁকে গোপ্তৃত্বে বরণ, (৫) কার্পণ্য এবং (৬) আত্মনিক্ষেপ।

ঐ সকল অঙ্গকে এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে*—

(১) আনুকূল্যের সংকল্প—চরাচর সর্বভূত ভগবানের শরীর। সেই হেতু তাদের আনুকূল্য আমার কর্তব্য—এরূপ স্থিরনিশ্চয় করাকে আনুকূল্যের সংকল্প বলে। সকলের সঙ্গে গভীর প্রীতি, মৈত্রী, সর্বজীবে দয়া আমার

কর্তব্য। সকলকে মন প্রাণ জীবন দিয়ে সেবা ও পূজা করা প্রয়োজন।

(২) প্রাতিকূল্যের বর্জন—উহাদের নিরাকৃতি। অর্থাৎ হিংসাদ্বেষাদি দ্বারা ভগবানের শরীরভূত চরাচর জীববর্গের তিরস্কার তার বিরোধী। নিজের কর্তৃত্ববুদ্ধি এবং ভগবানের আজ্ঞার বা শাস্ত্রের বিরোধিতা, হিংসা, দ্বেষ, অনিষ্টাচরণ, স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা প্রভৃতি ত্যাগ করা হলো প্রাতিকূল্যের বর্জন।

(৩) তিনি রক্ষা করবেন এই বিশ্বাস—ভগবান অনুকম্পাময় এবং স্বভাবতই তিনি সতত প্রাণীদিগকে কৃপা করে থাকেন। তিনি স্বগুণেই সকলকে রক্ষা করবেন—এই বিশ্বাস সর্বদা থাকবে। তিনি প্রাণিগণের প্রতি উদাসীন, কিংবা তাদের শুভাশুভ কর্মানুসারে মাত্র তাদের ফল প্রদান করেন—এই প্রকার বিশ্বাস কখনও থাকবে না। বরং স্বভাববশতই ভগবান অকাতরে কৃপা করে থাকেন, তিনি অহেতুক কৃপাসিন্ধু—এই বিশ্বাস থাকবে।

(৪) তাঁকে গোপ্তৃত্বে বরণ—ভগবানের অহৈতুকী কৃপা—এই বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে এই বিশ্বাসও থাকবে যে তিনি সমস্ত জীবকে সতত সর্বপ্রকারে রক্ষা করতে সম্পূর্ণ সমর্থ। তাঁর এই গোপ্তৃশক্তি নিরূপণই তাঁকে গোপ্তৃত্বে বরণ। অর্থাৎ একমাত্র ভগবানকে রক্ষাকর্তারূপে বরণ করা।

(৫) কার্পণ্য—অনাদিকাল থেকে বাসনাগ্রস্ত হয়ে জীব অজ্ঞ, অল্পশক্তি হয়েছে। নিজের পরম কল্যাণ কী সে তা জানতে পারে না। যা জানে সামর্থ্যের অভাবে তা করতে পারে না। এইভাবে নিজের দীনতা বুঝতে পারা এবং সংকীর্ণ অহংকার থেকে মুক্তিলাভ করাকে কার্পণ্য বলা হয়।

(৬) আত্মনিক্ষেপ—শ্রীভগবানে সানন্দে সাগ্রহে সকল সংশয় ত্যাগ করে আত্মসমর্পণ করা—এই পরম সিদ্ধি, অন্য কোনো ফলাকাঙ্ক্ষা নেই—আত্মনিক্ষেপ তাকেই বলে।

কয়েকটি সংহিতায় এই ষড়ঙ্গের অন্য ব্যাখ্যাও আছে।

শরণাগতির এই ছয়টি অঙ্গের মধ্যে আত্মনিক্ষেপ বা আত্মসমর্পণই শ্রেষ্ঠতম অঙ্গ। কারো কারো মতে আত্মনিক্ষেপই প্রকৃতপক্ষে শরণাগতি, অপর

পাঁচটি তার অঙ্গ। যোগশাস্ত্রে যোগ যেমন অষ্টাঙ্গ, এর মধ্যে সমাধিই প্রকৃতপক্ষে যোগ, অন্য সাতটি যোগের অঙ্গ—তেমনি শরণাগতির বেলায়ও তাই বলা হয়। শরণাগতিতে পাঁচটি অঙ্গের সাধনা দ্বারা সর্বশেষ আত্ম-সমর্পণে পৌঁছানো যাবে।

নারদপাঞ্চরাত্রে দাস্য শরণাগতিকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। যারা পাপ ক্ষয়ের জন্য বিষ্ণুর শরণ গ্রহণ করে তারা দাস্য শরণাগতি পায় না। বহু জন্মের পুণ্যদ্বারা পাপক্ষয় হয়ে গেছে যাদের তারাই কেবলমাত্র দাস্যফলের শরণাগত হতে পারে।

নারদপাঞ্চরাত্রে বলা হয়েছে ষড়্‌বিধ প্রপত্তির সঙ্গে গুরুর আজ্ঞানুসারে ষড়্‌বিধ বৃত্তিও অবশ্য থাকবে। এই ছয়টি বৃত্তি হলো—

(১) বিহিতের আচরণ (ন্যায় আচরণ), (২) প্রতিসিদ্ধের বিবর্জন (অন্যায় আচরণ ত্যাগ), (৩) দৃষ্টি (জ্ঞান), (৪) ভক্তি, (৫) লিঙ্গধারণ (তিলক, বস্ত্রাদি ধারণ), (৬) সন্তসেবা (সাধুসেবা)।

শরণাগতের কর্তব্য সম্বন্ধেও নারদ পাঞ্চরাত্র নির্দেশ দিয়েছেন। তাতে নির্ধারিত আছে—(১) গুরুপ্রদত্ত মন্ত্র নিত্য জপ, (২) অর্চনা, পূজাদি ক্রিয়া, (৩) বিষ্ণুগায়ত্রী বা অন্য মন্ত্র জপ করে ভগবানে অর্পণ করা।

বৈদিক মন্ত্র, তান্ত্রিক বা লৌকিক মন্ত্রও প্রপত্তিতে বিহিত আছে।

গীতায় ভগবান বলেছেন—'সকল ধর্ম পরিত্যাগ করে তুমি আমার শরণ গ্রহণ কর।' শরণাগতকে কি শাস্ত্রীয় ধর্ম বা বর্ণাশ্রমজনিত ধর্মাদি সমস্ত ত্যাগ করতে হবে?

পাঞ্চরাত্রসংহিতাদির মতে শরণাগতির সাধককে বর্ণাশ্রমধর্মসমূহ পরিত্যাগ করতে হবে না, বরং যথাযথ পালন করতে হবে। শরণাগত ব্যক্তি শাস্ত্র-নিষিদ্ধ আচরণ করবে না। গীতায় ভগবান যে ধর্ম ত্যাগের কথা বলেছেন তার তাৎপর্য হলো—জাতিধর্ম, কুলধর্ম প্রভৃতি ধর্মসমূহের চিন্তা পরিত্যাগ করে মনকে ভগবানে নিবিষ্ট করা, তাঁর অনুগত হওয়া। প্রপত্তিতে বর্ণ-শ্রমোচিত সমস্ত নির্দোষ ক্রিয়াসমূহের আচরণ থাকে।*

---

* ভাগবতধর্মের প্রাচীন ইতিহাস—স্বামী বিদ্যারণ্য

গীতার সর্বধর্মত্যাগ সম্বন্ধে অন্যমতে বলা হয়েছে—শ্রুতি, স্মৃতি বা লোকাচারমূলক নানা ধর্মের নানারূপ বিধিনিষেধের দাসত্ব ত্যাগ করে আমার শরণ লও, আমার কর্মবোধে যথাপ্রাপ্ত কর্তব্য কর্ম করে যাও ('বিধিকৈঙ্কর্যং ত্যক্ত্বা'—শ্রীধর। 'Abandoning all rules of conduct'—Sri Aurobinda)।*

মধুসূদন সরস্বতী বলেছেন (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার টীকা)—যাঁহারা একমাত্র ভগবানকে আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারা ব্রহ্মচারী হউন, গৃহী হউন, তাঁহাদের আর স্বাশ্রম বিহিত কর্মে অতিরিক্ত আদর বা আশ্রয় অনাবশ্যক।

নারদীয় ভক্তিসূত্রে দেবর্ষি বলেছেন, ঈশ্বরে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা সত্ত্বেও ভক্তের লৌকিক কর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়। কিন্তু ঈশ্বরে কর্মফল সমর্পণপূর্বক তিনি কর্ম করিবেন।

সাধারণভাবে বলা যায়, সর্বধর্মত্যাগ অর্থে ধর্মের জন্য অনুষ্ঠেয় সকল কর্ম ত্যাগ। পূজা, যজ্ঞ, পুরশ্চরণ প্রভৃতি ধর্মের জন্য অনুষ্ঠানমূলক কর্ম বাদ দিয়ে তাঁর শরণ লাভ করা। শরণাগতি অনুষ্ঠেয় কর্মাদির চেয়ে শ্রেষ্ঠ, একথাই বলা হয়েছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে যে নবধা বৈধী ভক্তির কথা বলা হয়েছে তন্মধ্যে সর্বশেষ হলো 'আত্মনিবেদন'। আত্মনিবেদন বা আত্মসমর্পণ কার্যে অর্পণকারী তিনটি ভাবযুক্ত হয়। যথা—(১) নিজ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য চেষ্টার অভাব, (২) স্বীয় সাধ্য ও সাধন উভয়ই ভগবানে অর্পণ, (৩) একমাত্র তাঁরই উদ্দেশে যাবতীয় চেষ্টা তৎপরতা।

শ্রীজীব গোস্বামী 'ভক্তিসন্দর্ভ' গ্রন্থে আত্মনিবেদন সম্বন্ধে বলেছেন, 'দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি থেকে আরম্ভ করে শুদ্ধ আত্মা পর্যন্ত সমস্তই সর্বতোভাবে তাঁকে সমর্পণ।' কীভাবে তা সম্ভব হবে, তার কী লক্ষণ বা সাধন? তিনি উপরে বর্ণিত তিনটি ভাবের সাধনার কথাই বলেছেন। একটি উদাহরণ শ্রীজীব গোস্বামী দিয়েছেন—

'এই আত্মার্পণ নিশ্চয় গো-বিক্রয়ের ন্যায়। যে গো বিক্রয় করিয়াছে, সে

* শ্রীমদ্ভগদ্গীতা—জগদীশচন্দ্র ঘোষ

বিক্রীত গরুর ভরণপোষণাদির জন্য চেষ্টা করে না। (যাহাকে গো বিক্রয় করা হইয়াছে) তাহাকেই উহার শ্রেয়ঃ সাধক করা হইয়াছে। সেই গরু উহারই কর্ম করিবে, বিক্রয়কারীর কর্ম আর করিবে না।'*

ঈশ্বরে নিজেকে সমর্পণ করে দিয়ে আমাকে ভাবতে হবে তাঁর কাছে বিক্রীত গরুর মতো। আমার জন্য আমাকে আর ভাবতে হবে না, চেষ্টা করতে হবে না। তিনিই আমার যা ভালো বোঝেন করবেন। এখন থেকে আমি শুধু তাঁরই কর্ম করব, তাঁর ইচ্ছানুসারে চলব—আমার নিজের জন্য আর কিছু করার থাকবে না। এই মানসিকতা, সংস্কার তৈরি করতে হবে —তবেই ঠিক ঠিক শরণাগতি হবে।

'হরিভক্তি-বিলাসে' বর্ণিত হয়েছে—যিনি মুখে 'আমি তোমার হইলাম' একথা বলেন, মনে তদ্রূপ অভিমান বহন করেন এবং দেহে ভগবৎস্থানের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তিনিই শরণাগত। 'হে দেবদেব জনার্দন! তোমার প্রপন্ন হইলাম অর্থাৎ তোমাকেই আমার একমাত্র রক্ষাকর্তারূপে বরণ করিলাম'—এই বলিয়া যে ব্যক্তি আমার শরণ (আশ্রয়) গ্রহণ করেন, তাঁহাকে আমি সকল ক্লেশ হইতে উদ্ধার করি।**

গীতায় ভগবান বলেছেন (১৮।৫৭)—'তুমি সর্বদা কর্মানুষ্ঠান কালেও মনে মনে আমাতে সমুদয় কর্ম সমর্পণ করিয়া সমত্ববুদ্ধিরূপ যোগ, যাহা কর্মবন্ধ-হেতু হইলেও তাহার মোক্ষহেতুতা সম্পাদন করিয়া দেয়, সেই বুদ্ধিযোগের আশ্রয় করিয়া আমাতে চিত্ত সমর্পণ কর অর্থাৎ মৎপরায়ণ হও। (ফল-স্বরূপ—১৮।৫৮)—তাঁহার প্রসাদে, তাঁহার কৃপায় সকল বিপদ কাটিয়া যায়, সকল দুরিত ধ্বংস হইয়া যায়, পরম শান্তি লাভ হয়।'***

'সমস্ত সময় ধরিয়া যাহা কিছু অনুষ্ঠান করা যায়—যাগ, যজ্ঞ, দান, তপস্যা, খাওয়া দাওয়া যে কোনো কর্ম করা হউক না কেন, সবই নিজের কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া শ্রীভগবৎপ্রেরিত হইয়া অন্তর্যামীর অধীন

---

* ভাগবতধর্মের প্রাচীন ইতিহাস

** ভাগবতধর্মের প্রাচীন ইতিহাস

*** শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার টীকা—মধুসূদন

হইয়া কর্ম করিতেছি—এই ভাব লইয়া করিতে হয়। তাহা হইলেই সমস্ত কর্ম শ্রীভগবানে অর্পিত হইয়া যায় এবং এই অর্পণ যথাযথ হইলে সকল বন্ধন ক্ষয় হইয়া পরম পদ লাভ হয়।'*

এখানে শরণাগতির সাধন ইঙ্গিত রয়েছে যে—সকল কর্মই মনে মনে ভগবানকে সমর্পণ করতে হবে। অহংকার অভিমান শূন্য হয়ে, সর্বদা তাঁর চিন্তা রেখে তাঁর অধীনে কর্ম করছি, এই ভাব নিয়ে কর্ম করতে হবে। শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে (১১।২।৩৬)—কায়, মন, বাক্য, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, আত্মা দ্বারা বা স্বভাববশত যে কোনো কর্ম করা হয়, সে সমস্তই পরাৎপর নারায়ণে সমর্পণ করবে।

গীতাতে ভগবান বলেছেন (৯।২৭)—'তুমি যাহা কিছু কর, যাহা কিছু ভোজন কর, যাহা কিছু হোম কর, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু তপস্যা কর, তৎ সমস্তই আমাকে অর্পণ কর।' অর্থাৎ সর্ব ইন্দ্রিয় দ্বারা যা কিছু কর, সকলই আমাতে অর্পণ কর। এই প্রকার ভাব নিয়েই কাজ করতে হয়।

গীতায় ভগবান আরও নির্দেশ করেছেন (৩।৩০)—'কর্তা যিনি ঈশ্বর, তাঁহারই জন্য, তাঁহার ভৃত্যস্বরূপ এই কাজ করিতেছি'—এইরূপ বিবেচনায়, বিবেকবুদ্ধি সহকারে কাজ করলে কৃষ্ণে কর্মার্পণ হয়।

(শাংকর ভাষ্য)

আত্মসমর্পণের বাহ্য সাধন সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে (১০।৮০।৩-৪) —'অহো! এই ইন্দ্রিয়াদি দেহবর্গ লাভে এইরূপ উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন, যাহাতে ইহাতে সার্থকতা ঘটে।—যে বাণী ভগবানের লীলা গান করতে পারে সেই বাণীই সফলা, যে হস্ত তাঁহার যজ্ঞাদি অর্চনা-বিধিতে ব্যস্ত থাকে তাহাই প্রকৃত হস্ত এবং যে মন স্থাবর জঙ্গমাত্মক বস্তু-নিচয়ে অন্তর্যামিরূপে বিদ্যমান শ্রীভগবানকে স্মরণ করে, সেই প্রকৃত মন এবং যে কর্ম তাঁহার পবিত্র পুণ্যগাথা শ্রবণ করে সেই প্রকৃত প্রস্তাবে সফল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।'

'স্থাবর জঙ্গম দ্বিবিধ পদার্থকে ভগবান নারায়ণের কলেবর জ্ঞানে যে মস্তক

এতদুভয়কে প্রণামার্থ প্রস্তুত থাকে, সেই মস্তকই প্রকৃত মস্তক এবং যে চক্ষু এই উভয়ের অন্তরে ভগবদ্ভাব অবলোকন করে, সেই প্রকৃত চক্ষু। যে সকল অঙ্গ শ্রীহরির চরণামৃত এবং ভগবত-ভক্তের পাদোদক নিত্য স্বীকার করে, সেই সকল অঙ্গই সংসারে অঙ্গ বলিয়া পরিচিত।'

অতএব দেহ, ইন্দ্রিয়, মন-বুদ্ধিকে এভাবে শ্রীভগবানে নিবেদন করা এবং সেভাবে তাদের গড়ে তোলার উপযুক্ত পন্থা এখানে পাওয়া যায়।

এই যে ঈশ্বরে বা নারায়ণ কর্ম-সমর্পণ করা তা দুভাবে হতে পারে। ঈশ্বরের সঙ্গে সাধক যে ভাব বা সম্বন্ধ স্থাপন করে সে অনুসারে সাধকের কর্মার্পণ-বুদ্ধিও নিয়মিত হয়। তুমি প্রভু আমি দাস, তুমি যন্ত্রী আমি যন্ত্র, তুমি কর্তা আমি নিমিত্ত মাত্র—এই সকল ভাব নিয়ে কর্ম করলে কর্ম ঈশ্বরে সমর্পিত হয়। আমি যা কিছু করি তুমি করাও বলে করি, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, তোমার কর্ম সার্থক হোক, আমি কিছু জানি না, কিছু চাই না, কিছু বুঝি না—এই সকল ভাব নিয়ে কাজ করতে হয়। এই অবস্থায় 'আমি তোমার' এই দাস্যভাবটি সর্বদা বর্তমান থাকে। একে বলা হয় মৃদু শরণাগতি।

আর এক ভাবে ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে কাজ হয়। যেমন, আমার যা কিছু কর্ম ঈশ্বরের প্রীতির জন্যে করা। শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পূজার্চনা ইত্যাদি ভগবৎ-সেবা বিষয়ক কর্ম তাঁরই কর্ম তাঁরই প্রীত্যর্থে করা। এই অবস্থায় সাধকের অন্য কর্ম থাকে না—এটি উচ্চতর অবস্থার কর্ম। এখানে 'তুমি আমার' এই ভাব বা সম্বন্ধ রয়েছে। এই ভাবকে বলা হয় মধ্যম শরণাগতি।*

ভক্তিকে অবলম্বন করে যেমন ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে কর্ম করা হয় তেমনি জ্ঞানমার্গের সাধকগণ কর্ম করেন ব্রহ্মার্পণ-বুদ্ধিতে। ভক্তিমার্গে আমি জ্ঞান থাকে, কিন্তু জ্ঞানমার্গে 'সবই ব্রহ্ম'। এই ভাব নিয়ে জ্ঞানীরা ব্রহ্মভূত হন, তাঁর সমস্ত কর্ম ব্রহ্মকর্ম হয় (গীতা—৪।২৪)। জ্ঞানীরা এক আত্মার বা ব্রহ্মের শরণ গ্রহণ করেন, ফলে সমস্ত কর্মবন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করেন। আমি সর্বাধিষ্ঠানস্বরূপ আত্মা বা ব্রহ্ম—এই বোধই আত্মার শরণ গ্রহণ,

* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—জগদীশচন্দ্র ঘোষ

এই বোধই আত্মস্থিতি। এই ভাবটিই আচার্য মধুসূদনের মতে অধিমাত্র বা উত্তম শরণাগতি। 'ব্রহ্মার্পণ অর্থ হলো ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হওয়া। আমার কর্ম ধর্মাধর্ম ফল লাভ করে বন্ধনের কারণ না হয়। সবকিছু সমর্পিত হয়ে ব্রহ্ম-স্বরূপতা প্রাপ্তি—এই ভাবনা।'

ব্রহ্মর্ষি সত্যদেব শ্রীশ্রীচণ্ডীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় আত্মনিবেদন প্রসঙ্গে বলেছেন (সাধন সমর ২য়, ২।১৯)—স্ব স্ব খণ্ড শক্তিকে এক অদ্বিতীয় অখণ্ড মহতী শক্তিরূপে বুঝিতে পারার নামই শক্তি-সমর্পণ।···শক্তি-সমুদ্রের যে ক্ষুদ্র অংশটুকুকে আমার শক্তি বলিয়া গণ্ডী দিয়া রাখিয়াছি, এক কথায় যাহাকে আমরা পুরুষকার—যত্ন বা অধ্যবসায় বলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছি, উহা যে একমাত্র মাতৃশক্তি ব্যতীত অন্য কিছু নহে—যিনি একমাত্র পুরুষ, তাঁহারই কৃতির নাম যে পুরুষকার ইহা উপলব্ধি করিতে পারিলেই শক্তি-সমর্পণ করা হয়।···

'একদিনে উহা হয় না। প্রথমে ঐ শক্তিগুলি যেন আমারই শক্তি, এরূপ ভাবে ধরিয়া ধরিয়া মাতৃচরণে অর্পণ করিতে হয়। ফল পুষ্প ফলাদির অর্পণ বা দ্রব্যযজ্ঞ হইতে উহার আরম্ভ হয়, ক্রমে ব্রত নিয়ম উপবাস প্রভৃতি তপোযজ্ঞ এবং যম নিয়মাদি যোগযজ্ঞের ভিতর দিয়া সর্বশেষে স্বাধ্যায়ে বা জ্ঞানযজ্ঞে উপনীত হইতে হয়। তখন সাধক স্ব-কে অধ্যয়ন করে অর্থাৎ অখণ্ডজ্ঞান বা পরমাত্মার সন্ধান পায়। ইহাই চরম সমর্পণ। এই সমর্পণের নাম আত্ম-সমর্পণ। আত্মলাভ আত্মসমর্পণ ব্যতীত হয় না, হইতে পারে না।···'আমি'কে সম্যকরূপে মাতৃচরণে অর্পণ করিতে হইলে প্রতি কর্মে মাতৃ-কর্তৃত্ব দর্শন করিতে হয়। "নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বরঃ" বলিয়া প্রতিদিন আত্মনিবেদন করিতে হয়। এইরূপ করিতে করিতে তবে আত্মসমর্পণের যোগ্যতা লাভ হয়।'

নারদীয় ভক্তিসূত্রে বলা হয়েছে—অন্য সকল আশ্রয় ত্যাগ করে ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করা কর্তব্য। জীবমাত্রই জ্ঞানে বা অজ্ঞানে ঈশ্বরে আশ্রিত —যে তা জানে না সে তার ফল লাভ করতে পারে না। আশ্রিত বোধ একটি সত্য অনুভূতি। আত্মসমর্পণের দ্বারাই এই আশ্রিতবোধ জেগে

উঠবে। আশ্রয় যে কী তা জানতে পারলে জীবব্রহ্মৈক্য জ্ঞান লাভ হয়।*
নারদের মতে সকল চিন্তা, সকল কথা, সকল কর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করতে হবে, ক্ষণিকের বিস্মরণে তীব্র ব্যাকুলতা আসবে—তবেই হবে ভক্তি। এখানে আত্মসমর্পণের অর্থ হলো সকল কর্মার্পণ ও সতত তাঁকে স্মরণ। ঈশ্বরচিন্তা থেকে আমরা যেন কখনও বিচ্যুত না হই। নারদ আরও বলেছেন, যিনি শরণাগত তিনি নিজের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুর জন্যও ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করেন।**

নারদীয় ভক্তিসূত্রে আরও বলা হয়েছে—নিজেকে, নিজের বলতে সব কিছু বস্তুকে, এমন কি শাস্ত্রীয় আচারাদিকেও ভক্ত ঈশ্বরে সমর্পণ করেছেন, তাই তিনি ব্যক্তিগত ক্ষতির জন্য শোক করেন না। ভক্ত জানে ঈশ্বর তাঁর একমাত্র আশ্রয়, একান্ত আপনার। ভগবৎ-প্রেমে তাঁর হৃদয় পূর্ণ থাকে—লাভক্ষতির কথা আর মনে থাকে না।

আত্মসমর্পণ সম্বন্ধে ঈশানুশরণে বলা হয়েছে (৩।৩৭)—'কেহ কেহ আংশিকভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে, অথবা ঈশ্বরে একান্তভাবে আস্থা স্থাপন করে না। সেইজন্য তাহাদিগকে নিজেদের আত্মরক্ষার বিষয় চিন্তা করিতে হয়।

'আবার এমন কেহ কেহ আছে, যাহারা প্রথমে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে, কিন্তু যখন প্রলোভনের তাড়না আসে, তখন তাহাদের সেই ভাব চলিয়া যায়, এবং উহার ফলে তাহার ধর্মজীবনে আর উন্নতি করিতে পারে না।

সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণপূর্বক নিত্য আমার আরাধনা না করিয়া এইভাবে জীবন যাপন করিলে মুক্তিলাভ হয় না, বা আমার মধুর দর্শন লাভ করিতে পারে না। আত্মসমর্পণ ব্যতীত মুক্তি, দর্শন এবং আমার সঙ্গে শাশ্বত মিলন—ইহাদের কোনটিই লাভ হইবে না।'***

মহর্ষি বৃহস্পতির মতে, কর্ম ভগবানে অর্পিত হলে, তার ফল কর্তাকে

* নারদীয় ভক্তিসূত্র—স্বামী প্রভবানন্দ
** নারদীয় ভক্তিসূত্র—স্বামী প্রভবানন্দ
*** ঈশানুসরণ—অনুবাদক স্বামী সচ্চিদানন্দ

ভোগ করতে হয় না। সুতরাং উহার দ্বারা সে বন্ধনগ্রস্ত হয় না। পক্ষান্তরে উহার দ্বারা সে জ্ঞান লাভ করে এবং তাতে মুক্তি হয়। সাধু কি অসাধু ব্যক্তি যা কিছু কর্ম করে তা নারায়ণকে অর্পণ করলে কর্ম করেও তা দ্বারা লিপ্ত হয় না।*

শ্রীশ্রীচণ্ডীর কীলক স্তবে একটি কথা আছে (৭ ও ৮ মন্ত্র)—'দদাতি প্রতিগৃহ্লাতি'। মন্ত্রে বলা হয়েছে—'যিনি কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী বা অষ্টমীতে একাগ্রচিত্ত হইয়া দেবীকে দান করেন এবং প্রতিগ্রহণ করেন, তাঁহার প্রতি ইনি প্রসন্না হন, অন্য কোন প্রকারে নহে।'

সর্বস্ব দেবীকে সমর্পণ করে তাঁর প্রসাদ রূপে ঐগুলো প্রতিগ্রহণ করে শাস্ত্রানুযায়ী ব্যবহার করতে হবে। রহস্যতন্ত্রস্থিত 'গুরু-কীলক-পটলে' এই অনুষ্ঠানের বিবরণ আছে। দেবীকে সর্বস্ব সমর্পণ ও তাঁর প্রসাদরূপে প্রতিগ্রহণ পূর্বক (ধ্যান দ্বারা) সমগ্র আয়ের পঞ্চম অংশের তিন অংশ নিজ প্রয়োজনে, একাংশ দেবকার্য, পিতৃকার্য ও অতিথিসেবায় এবং একাংশ গুরুকে দান করা বিধেয়। তন্ত্রশাস্ত্রে একে 'দান-প্রতিগ্রহ' অনুষ্ঠান বলে।**

বৌদ্ধধর্ম মতে শরণাগতির বিশেষ সাধনের কথা আছে। 'ত্রিরত্ন ও বৌদ্ধ শরণাগতি' প্রবন্ধে (উদ্বোধন ১৩৪২) অধ্যাপক বেণীমাধব বড়ুয়া এ বিষয়ে বর্ণনা করেছেন—

বুদ্ধঘোষ বলেন, চারি বিভিন্ন ভাবে শরণাগতি সম্ভব হয়। যথা—আত্ম-দানের ভাবে (অত্তসন্নিয্যাতনেন), তৎপরায়ণতার ভাবে (তপ্পরায়নতায়), শিষ্যভাব গ্রহণের ভাবে (সিস্সভাবুপগমনেন), প্রণিপাতের ভাবে (পণি-পাতেনা তি)।

আত্মদানের ভাব—আজ হইতে আরম্ভ করিয়া আমি নিজেকে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘকে দিতেছি, বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের জন্য দান করিতেছি, ত্রি-

* ভাগবতধর্মের প্রাচীন ইতিহাস

** শ্রীশ্রীচণ্ডী—রাসমোহন চক্রবর্তী

রত্ন উদ্দেশে নিজেকে উৎসর্গীকৃত করিতেছি। আমি নিজে উৎসর্গীকৃত, আমার জীবন উৎসর্গীকৃত, আমি আমরণ শরণাগত। ত্রিরত্নই আমার পক্ষে শরণ, ত্রাণ, লয়ন।'

তৎপরায়ণতার ভাবে—'আজ হইতে আমি বুদ্ধ-পরায়ণ, ধর্ম-পরায়ণ, সংঘ-পরায়ণ, বুদ্ধ আমার পরাগতি, পরকাষ্ঠা, ধর্ম তথা সংঘ আমার পরাগতি, পরাকাষ্ঠা, এই ভাবে আমাকে অবধারণ করুন।'

শিষ্যভাব গ্রহণের ভাবে—'আমি ভগবানকে দেখিব ত শাস্তাকেই দেখিব, সম্যক সম্বুদ্ধকেই দেখিব। আজ হইতে আমি বুদ্ধের অন্তেবাসী, ধর্ম ও সংঘের আন্তবাসী এবং আমাকে এইরূপে অবধারণ করুন।'

প্রণিপাতের ভাবে—'আজ হইতে আমি বুদ্ধাদি রত্নত্রয়কে অভিবাদন করিব, রত্নত্রয়ের সম্মানার্থ সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিব, কৃতাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইব, গৌরব-বর্ধনার্থ বিহিত কার্য করিব, এবং আমাকে এইরূপ অবধারণ করুন।'

উপরে বর্ণিত চারভাবে শরণাপন্ন হওয়ার নাম বৌদ্ধশরণাগতি। 'শরণাগত মাত্রেই উপাসক, শরণাগতি মাত্রই উপাসনা এবং শরণ্যমাত্রই উপাস্য। পূজা, বন্দনা, সেবা, অর্চনা, ভজনা, সম্মাননা, গুরুকরণা, পর্যুপাসনা, সমস্তই উপাসনার অন্তর্গত। এই ভাবে বিচার করিলে বৌদ্ধ শরণাগতি ভক্তিবাদের বা ভাগবদ্ধর্মেরই পরিচায়ক।···নির্বাণ সাক্ষাৎকার করাই বৌদ্ধ শরণাগতির চরম লক্ষ্য। সুমেধ তাপসের শরণাগতি যথার্থত বুদ্ধ-প্রশংসিত সাধনপন্থা।'

১। (খ) সমর্পণ—মহাজনের উক্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব একটি গল্প বলতেন—জাহাজের মাস্তুলে একটি পাখি বসেছিল। জাহাজ কখন চলতে শুরু করেছে, পাখি তা টের পায় নি। নদী থেকে সাগরে গিয়ে যখন জাহাজ পড়ল, চারদিকে জল আর জল তখন পাখিটির সম্বিৎ ফিরে এল। সে উড়তে শুরু করে দক্ষিণে গেল, কিন্তু কোনো গাছপালা না পেয়ে ফিরে এল মাস্তুলে। এর পরে সে এক একবার

করে পূবে, পশ্চিমে, উত্তরে গেল—কিন্তু তাকে ফিরে আসতে হলো। এবার সে মাস্তুলে নিশ্চিন্ত নির্ভয় হয়ে স্থির হয়ে বসে রইল—জাহাজ যে দিকে নিয়ে যায় সে সেদিকেই যাবে। তার এখন আর কোনো চেষ্টা নাই, চিন্তা ভাবনা নাই—চুপ করে মনের শান্তিতে সে বসে রইল।

মানুষ নানা ধর্মানুষ্ঠান, কর্মানুষ্ঠান করে থাকে—কিন্তু মনে শান্তি না পেয়ে অবশেষে ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করে—তিনি যা করান তাই করে, তাঁর যা ইচ্ছা সে যেন সে ইচ্ছায় চলে—এরূপ ভাব নিয়ে সে নিশ্চিন্ত থাকে। এইভাবে জীবনে নানা ঘটনায় বাধাবিঘ্ন অশান্তিতে শ্রান্ত ক্লান্ত ব্যর্থকাম হয়ে নিজের পুরুষকার ও শক্তির ওপর নির্ভর হারিয়ে ঈশ্বরের শরণাগত হয়।

একদিন একজন ভক্তকে উপদেশ দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'তাঁর শরণাগত হও, তিনি সুবুদ্ধি দেবেন। তিনি সব ভার লবেন। তখন সব রকম বিচার দূরে যাবে। এ বুদ্ধি দিয়ে কি তাঁকে বুঝা যায়? আর তিনি না বুঝালে কি বুঝা যায়? তাই বলছি, তাঁর শরণাগত হও—তাঁর যা ইচ্ছা তিনি করুন। তিনি ইচ্ছাময়। মানুষের কী শক্তি আছে?'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব সর্বদাই বলতেন, 'শরণাগত, শরণাগত, নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু। শরণাগতি, শরণাগতি!'

অহংকার বা আমিত্ব না গেলে পূর্ণ শরণাগতি আসে না। তাই তিনি বলেছেন, 'জীবের অহংকারই মায়া। এই অহংকার সব আবরণ করে রেখেছে। আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল। যদি ঈশ্বরের কৃপায় 'আমি অকর্তা' এই বোধ হয়ে গেল, তাহলে সে ব্যক্তি তো জীবন্মুক্ত হয়ে গেল। তার আর ভয় নেই।···এ সংসার কর্মক্ষেত্র, এক হাতে ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধরে থাকবে, আর এক হাতে কাজ করবে। যখন কাজ থেকে অবসর হবে, তখন দুহাতেই (শরণাগত হয়ে) ঈশ্বরে পাদপদ্ম ধরে থাকবে।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব শরণাগতি সম্বন্ধে আরো বলেছেন—'তাঁর পাদপদ্মে সব অর্পণ কর, তাঁকে আম্মোক্তারী দাও। তিনি যা হয় করুন।'

এই আম্মোক্তারী শ্রীরামকৃষ্ণে দিয়েছিলেন গিরিশ ঘোষ। এই আম্মোক্তারী

দিয়ে গিরিশ ঘোষ কীভাবে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়েছিলেন, তার বর্ণনা শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে কিছু আছে। এ থেকে আম্মোক্তারী বা বকলমা সাধনের কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

বকলমা দেবার পর 'শ্রীযুত গিরিশ এখন নিশ্চিন্ত এবং খাইতে-শুইতে-বসিতে ঐ এক চিন্তা—শ্রীরামকৃষ্ণ আমার সম্পূর্ণ ভার লইয়াছেন—সর্বদা মনে উদিত থাকিয়া তাঁহাকে যে ঠাকুরের ধ্যান করাইয়া লইতেছে এবং তাঁহার সকল কর্ম ও মনোভাবের উপর একটা ছাপ দিয়া আধিপত্য বিস্তার করিয়া আমূল পরিবর্তন আনিয়া দিতেছে তাহা বুঝিতে না পারিলেও সুখী—কারণ তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) যে তাহাকে ভালবাসেন এবং আপনার হইতেও আপনার।

'...একদিন শ্রীযুক্ত গিরিশ ঠাকুরের সম্মুখে কোন একটি সামান্য বিষয়ে 'আমি করিব' বলায় ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, 'ও কি গো? অমন করে 'আমি করিব' বল কেন? যদি না করতে পার? বলবে—'ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়তো করব।' গিরিশও বুঝিলেন, 'ঠিক কথা, আমি যখন ভগবানের ওপর সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ ভার দিয়াছি এবং তিনিও সেই ভার লইয়াছেন, তখন তিনি যদি ঐ কার্য আমার পক্ষে করা উচিত বা মঙ্গলকর বলিয়া করিতে দেন তবেই তো করিতে পারিব।' বুঝিয়া তদবধি আমি করিব, যাইব ইত্যাদি বলা ও ভাবগুলো ত্যাগ করিতে লাগিলেন।

'এইরূপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। ক্রমে ঠাকুরের অদর্শন হইল। স্ত্রী-পুত্রাদির বিয়োগ রূপ নানা দুঃখকষ্ট আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহার মন কিন্তু পূর্বের ন্যায় প্রতি ব্যাপারে বলিয়া উঠিতে লাগিল—'তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) ঐরূপ হওয়া তোর পক্ষে মঙ্গলকর বলিয়াই ঐ সকল হইতে দিয়াছেন। তুই তাঁহার উপর ভার দিয়াছিস, তিনিও লইয়াছেন। কিন্তু কোন্ পথ দিয়া তিনি তোকে লইয়া যাইবেন, তাহা তো আর তোকে লেখাপড়া করিয়া বলেন নাই? তিনিই এই পথই তোর পক্ষে সহজ বুঝিয়া লইয়া যাইতেছেন, তাহাতে তোর 'না' বলিবার বা বিরক্ত হইবার তো কথা নাই। তবে কি তাঁহার উপর বকলমা বা ভার দেওয়াটা একটা

মুখের কথামাত্র বলিয়াছিলি? ইত্যাদি। এইরূপে যত দিন যাইতে লাগিল ততই গিরিশের বকলমা দেওয়ার গূঢ় অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইতে লাগিল।··· শ্রীযুত গিরিশকে জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, 'এখনও ঢের বাকী আছে! বকলমা দেওয়ার ভেতর যে এতটা আছে তখন কি তা বুঝেছি! এখন দেখি যে সাধন-ভজন-জপ-তপরূপ কাজের একটা সময়ে অন্ত আছে, কিন্তু যে বকলমা দিয়েছে তার কাজের আর অন্ত নাই—তাকে প্রতি পদে, প্রতি নিঃশ্বাসে দেখতে হয় তাঁর (ভগবানের) উপর ভার রেখে তাঁর জোরে পা-টি, নিঃশ্বাসটি ফেললে, না এই হতচ্ছাড়া 'আমি'টার জোরে সেটি করলে।'

কাশীপুরে একদিন কথাপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে গিরিশ ঘোষ বলছেন (কথামৃত ২।১৬।৩)—'মহাশয়, কি বলবো! আপনাকে চিন্তা করে আমি কি ছিলাম, কি হয়েছি! আগে আলস্য ছিল, এখন সে আলস্য ঈশ্বরে নির্ভর হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাপ ছিল, তাই এখন নিরহঙ্কার হয়েছি! আর কি বলবো!'

বকলমা দেওয়া সম্বন্ধে সাবধান বাণী বলেছেন লীলাপ্রসঙ্গকার স্বামী সারদানন্দ। তিনি বলেছেন, 'সাধন ভজন করিতে বা শ্রীভগবানকে ডাকিতে আমার ভাল লাগে না, যথেচ্ছাচার করিতে ভাল লাগে, অতএব তাহাই করিব, আর কেহ ঐ বিষয়ে প্রতিবাদ করিলে বলিব, 'কেন? আমি তো ভগবানকে বকলমা দিয়াছি! তিনি আমায় ঐরূপ করাইতেছেন তা কি করিব! মনটি কেন তিনি ফিরাইয়া দেন না?'—এ বকলমা কেবল পরকে ফাঁকি দেবার এবং নিজেও ফাঁকিতে পড়িবার বকলমা। উহাতে ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ হইতে হয়।'

কলকাতা সিমলা অঞ্চলের সুরেন্দ্রনাথ মিত্র পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত ও অর্ধ রসাদ্দার, এক অলৌকিক উপায়ে ধর্মপথে পরিচালিত হয়েছিলেন। 'শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা'য় স্বামী গম্ভীরানন্দ সুরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিখেছেন, 'বাহ্যতঃ সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটিলেও তাঁহার অন্তরে তখন হুতাশন প্রায় মর্মান্তিক যন্ত্রণা। উহা হইতে নিস্তারের উপায় দেখিতে না পাইয়া তিনি বিষপানে প্রাণনাশের পর্যন্ত উদ্যোগ করিতেছিলেন। এমন

সময়ে পূর্বপরিচিত বন্ধু রামচন্দ্র ও মনোমোহন একদিন এই অশান্তির কথা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট যাইতে পরামর্শ দিলেন।···তাঁহাদের পীড়াপীড়িতে সুরেন্দ্রকে তাঁহাদের সহিত দক্ষিণেশ্বরে যাইতে হইল।···ভক্তবৃন্দপরিবৃত ঠাকুরের বদন হইতে তখন অমৃতবাণী উৎসারিত হইতেছে। সুরেন্দ্র তেজস্বী, পুরুষকারে বিশ্বাসী এবং পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় অনেকটা প্রভাবান্বিত হইলেও আজ সবিস্ময়ে শুনিলেন, ঠাকুর বলিতেছেন, 'লোকে বাঁদরছানা হইতে চায় কেন? বিড়ালছানা হইলেই তো ভাল হয়। বাঁদরের স্বভাব এই যে, সে ইচ্ছা করিয়া তাহার মাতাকে জড়াইয়া ধরিলে তবে সে স্থানান্তরে লইয়া যাইবে। কিন্তু বিড়াল-ছানার স্বভাব সেরূপ নহে, তাহার মা যে স্থানে রাখিয়া দেয়, সেই স্থানে পড়িয়াই ম্যাও, ম্যাও করিতে থাকে। বাঁদর-ছানার স্বভাব জ্ঞান-প্রধান ও বিড়াল-ছানার স্বভাব ভক্তি-প্রধান।'

'সুরেন্দ্রের মনে হইল এ যেন তাঁহাকেই উপদেশ দেওয়া হইতেছে। নিজ বুদ্ধি-বিবেচনায় অতিমাত্র নির্ভর করিয়াও তিনি জীবন-সমস্যার কোন সমাধান খুঁজিয়া পান নাই। এমন কি, স্বীয় অপারগতায় হতাশ হইয়া অবশেষে আত্মহত্যার আয়োজন করিতেছিলেন। অথচ ইনি সমস্ত ভার লইবার ইঙ্গিতের সহিত তাঁহাকে এক শান্তিময় নূতন পথের সন্ধান দিলেন। সুরেন্দ্র অকূলে কূল পাইলেন, সুরেন্দ্র মজিলেন।'

শরণাগতিকে অবলম্বন করে সুরেন্দ্রনাথের জীবনে দারুণ পরিবর্তন এসে-ছিল। ধর্মজীবনে যেমন তিনি উন্নতি করেছিলেন, তেমনি ঠাকুর ও তাঁর সেবক ভক্তদের সেবায় প্রচুর অর্থব্যয়ও করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুরে তখন অত্যন্ত অসুস্থ, ভক্তরা গেলেই তিনি ঈশ্বরীয় কথা বলেন, আর তাঁর অসুখ ও যন্ত্রণা বেড়ে যায়। তাই ত্যাগী বালক ভক্ত ও সেবকেরা কিছুদিন দোতলায় ঠাকুরের ঘরে গৃহী ভক্তদের যেতে দিতেন না। মাস্টার মশায় (শ্রীম) একদিন উপরে চলে গেছেন, একটু পরে যোগীন মহারাজ তাঁকে সঙ্গে করে নিচে নিয়ে এসে মাস্টার মশায়কে উপরে উঠতে দেবার জন্যে নিরঞ্জন মহারাজকে বকেছিলেন। মাস্টার মশায়

সেদিনের ঘটনায় তাঁর ডায়েরীতে উল্লেখ করেছেন যে তিনি এজন্যে সংকুচিত বোধ করেন এবং অকস্মাৎ হতাশার ঝাপটায় আক্রান্ত হন ও বিভ্রান্ত বোধ করেন।

সেদিন মাস্টার মশায় সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের সঙ্গে কলকাতায় ফেরেন। পথে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব কাহিনী মাস্টার মশাইকে বলেন। জগন্মাতার উপর শরণাগতির উপদেশ সুরেন্দ্রের জীবনে এনেছিল আমূল পরিবর্তন। এ কাহিনী সুরেন্দ্রনাথের মুখে শুনে মাস্টার মশায়ের ধারণা হয়—এই মহৎ উপদেশ তাঁর জন্যেও প্রযোজ্য। 'তাঁর হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করে। তিনি শরণাগতির এই ভাবনা নিয়ে অন্তরের গভীরে ডুব দেন।'

'কাশীপুরের সেদিনের ঘটনা স্মরণ করে তাঁর চিত্ত ভারাক্রান্ত ও বিষণ্ণ হয়। তিনি যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত বিড়ালশাবকের শরণাগতিই একমাত্র অবলম্বনীয় ভেবে তিনি সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করেন।'

যা হয়েছে তাঁর ইচ্ছাতেই হয়েছে—এই ভাব নিয়ে কোনো অভিমান না রেখে দুদিন পরে আবার শ্রীম কাশীপুরে ঠাকুরের সন্দর্শনে যান।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব একটি গল্প বলতেন—এক ব্রাহ্মণের একটি বাগান ছিল। বাগানটি অতি সুন্দর এবং ব্রাহ্মণ নিজের হাতে তা সাজিয়েছিলেন। একদিন তিনি বাগানে এসে দেখতে পেলেন, একটি গরু ঢুকে বাগানের শাকসবজি, ফুলের গাছ অনেক নষ্ট করেছে। দেখে তার এত রাগ ও দুঃখ হলো যে তিনি লাঠি দিয়ে গরুটাকে এমনভাবে আঘাত করলেন, ফলে গরুটি মরে গেল।

গরু মরে যাওয়ায় ব্রাহ্মণের এখন খেয়াল হলো যে তার তো গো-হত্যা পাপ হয়ে গেল। তাহলে তো অনন্ত নরকে যেতে হবে। ব্রাহ্মণের একটু শাস্ত্র পড়া ছিল। সে এবার বিচার করলে—হাত গরুটাকে মেরেছে, হাতের দেবতা তো ইন্দ্র। কাজেই ইন্দ্রই তো এজন্যে দায়ী। পাপ হলে তা হবে ইন্দ্রের।

গো-হত্যার পাপ এবার ইন্দ্রের কাছে গেল। ইন্দ্র পাপকে বললেন, তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি একটু পরেই আসছি।

ইন্দ্র এক বৃদ্ধের ছদ্মবেশ ধরে ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে বাগানটির খুব প্রশংসা করতে লাগলেন। ব্রাহ্মণ বৃদ্ধের কথা শুনতে পেয়ে তাঁকে বাগানের ভেতরে নিয়ে সব দেখাতে লাগল, আর বলতে লাগল—এটা আমি করেছি, ওটা আমি করেছি, ইত্যাদি। হঠাৎ মরা গরুটা দেখতে পেয়ে বৃদ্ধ বলে উঠলেন, এটা কে মারলে? ব্রাহ্মণ আর কথা বলতে পারে না। বৃদ্ধ এবার নিজের রূপ ধরে ব্রাহ্মণকে বললেন, সব ভালো কাজের বেলায় তুমি, আর গো-হত্যার বেলায় শুধু আমি। তাই না? এই বলে গো-হত্যার পাপ ব্রাহ্মণকে দিয়ে ইন্দ্র বিদায় নিলেন।

বকলমা দেওয়া বা ঈশ্বর নির্ভরতার বেলায় আমাদের এই গল্পের শিক্ষাটি বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে।

দৈবে নির্ভর প্রসঙ্গে 'স্বামি-শিষ্য সংবাদে' স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'শাস্ত্রে নির্ভরতাকে পঞ্চম পুরুষার্থ বলে নির্দেশ করেছে। কিন্তু আমাদের দেশে লোকে যেভাবে 'দৈব দৈব করে, ওটা মৃত্যুর চিহ্ন, মহাকাপুরুষতার পরিণাম, কিম্ভূতকিমাকার একটা ঈশ্বর কল্পনা করে তার ঘাড়ে নিজের দোষ চাপানোর চেষ্টা মাত্র। ঠাকুরের সেই গো-হত্যা পাপের গল্প শুনেছিস তো? সেই গো-হত্যা পাপে শেষে বাগানের মালিককেই ভুগে মরতে হবে। আজকাল সকলেই 'যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি' বলে পাপপুণ্য দুই-ই ঈশ্বরের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। নিজে যেন পদ্মপত্রে জল। সর্বদা এভাবে থাকতে পারলে সে তো মুক্ত! কিন্তু ভালোর বেলায় 'আমি', আর মন্দের বেলা 'তুমি'—বলিহারি তোদের দৈবে নির্ভরতা! পূর্ণ প্রেম বা জ্ঞান না হলে নির্ভরের অবস্থা হতেই পারে না। যার ঠিক ঠিক নির্ভর হয়েছে, তার ভালোমন্দ ভেদবুদ্ধি থাকে না—ঐ অবস্থার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের (শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যদের) ভেতর ইদানীং নাগ মহাশয়।'

স্বামী প্রেমানন্দ বলেছেন (প্রেমানন্দ-স্মৃতি সংখ্যা, মালদহ)—'ঠাকুর মার কাছে বকলমা দিয়ে দেহধারণ করেছিলেন। আবার গিরিশবাবু ঠাকুরের

কাছে বকলমা দিয়েছিলেন। বকলমা মানে কারও কাছে কোন কার্যের ভারার্পণ। গিরিশবাবু নিজের দুর্বলতা দেখে ঠাকুরের নিকট তার আধ্যাত্মিক উন্নতির ভারার্পণ করেছিলেন। এ বড় কঠিন ব্যাপার। অহংকারের লেশমাত্র থাকলে বকলমা দেওয়া যায় না।···সুখে দুঃখে যিনি বিচলিত না হয়ে তাঁতে মন নিবেশ করে রাখতে পারেন, 'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি' তিনিই প্রকৃত বকলমা দিয়াছেন। তিনিই বাস্তবিক সর্বধর্ম ত্যাগ করে তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেছেন এবং প্রভু তারই ভার গ্রহণ করেছেন এবং প্রভু তারই ভার গ্রহণ করে সর্বপাপ হতে মুক্ত করেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব আর একটি গল্প বলতেন—এক গয়লানী রোজ সকালে নদীর ওপারে দুধ নিয়ে যেত। ওখানে একজন ভাগবতের পণ্ডিত আছেন, গয়লানী তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করে। আর সকালবেলা পণ্ডিত মশায়ের দুধ না হলে চলে না। পণ্ডিতমশায়ের ধর্মকথা গয়লানী মাঝে মাঝে শুনতে পায়, তার খুব আনন্দ হয়।

একদিন সকালে আকাশে মেঘ করেছে, ঝড় বৃষ্টি হয়েছে। গয়লানী নদীর পারে এসে দেখল কোনো নৌকা নেই। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে গয়লানী ভাবলে, পণ্ডিতমশায়ের তো খুব কষ্ট হবে, দুধ নিতে দেরী হচ্ছে। আচ্ছা, পণ্ডিত মশায় তো বলে থাকেন, হরি নামে ভবসাগর পার হওয়া যায়। আর এই নদীটুকু কি হরিনামে পার হওয়া যাবে না? গভীর বিশ্বাস আর নির্ভরতা নিয়ে সে হরিনাম করতে করতে জলের ধারে এল। সে ভগবানের নামে এমন ভাবাবিষ্ট ও একাগ্র ছিল যে হরিনাম করতে করতে জলের ওপর দিয়ে হেঁটে এপারে চলে এল।

পণ্ডিতমশায় তো এই ঝড়-বাদলের দিনে গয়লানীকে দেখে অবাক। নৌকা নেই, কী করে সে এল, জানতে গিয়ে পণ্ডিতমশায় গয়লানীর কাছে সব কথা শুনলেন। তিনি গয়লানীর ঈশ্বর-ভক্তির কথা শুনে বললেন, তুমি কীভাবে নদী পেরিয়ে এলে আমায় দেখিয়ে দাও, আমিও ওপারে যাব। গয়লানী আবার সরল বিশ্বাসে ভগবানের নাম করতে করতে জলের ওপর

দিয়ে হেঁটে চলল। পণ্ডিতমশায়ও ঠাকুরের নাম করতে করতে জলে নামলেন, পাছে কাপড় ভিজে যায়—তাই কাপড়ও তুলতে লাগলেন। তিনি দেখলেন, গয়লানী পেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তিনি কাপড় তুলতে তুলতে জলের গভীরে পড়ে গেলেন।

গয়লানীর হরিনামের ওপর মনে প্রাণে যে বিশ্বাস ও নির্ভরতা এসেছিল, পণ্ডিতমশায়ের তা আসে নি। তাই তিনি হরিও বলছেন আবার কাপড়ও তুলছেন। এই অর্ধ নির্ভরে শরণাগতি আসে না—পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর আসতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলেছেন, তাঁর উপর নির্ভর করে হাত পা ছেড়ে দিয়ে যেন তালগাছের ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া এই ভেবে যে তিনি রক্ষা করবেনই করবেন—এরূপ বিশ্বাস ও নির্ভর চাই। ঈশ্বর রক্ষাকর্তা, ত্রাণকর্তা, মঙ্গলময়—মনেপ্রাণে তা বিশ্বাস করা চাই। অমঙ্গলের মধ্যে, বিপদের মধ্যেও তাঁর মঙ্গল হস্তের কাজ সদা বিদ্যমান—এই ভাব ও বিশ্বাস আনা দরকার।

তাই গৃহীদের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ—'আর সংসারে থাকো ঝড়ের এঁটো পাতা হয়ে। ঝড়ের এঁটো পাতাকে কখনও ঘরের ভিতর লয়ে যায়, কখনও আঁস্তাকুঁড়ে। হাওয়া যেদিকে যায়, পাতাও সেদিকে যায়। কখনও ভাল জায়গায় কখনও মন্দ জায়গায়। তোমাকে এখন সংসারে ফেলেছেন, ভাল, এখন সেই স্থানেই থাকো—আবার যখন সেখান থেকে তুলে ওর চেয়ে ভাল জায়গায় লয়ে ফেলবেন, তখন যা হয় হবে।'

স্বামী বিবেকানন্দ (লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ—মহেন্দ্রনাথ দত্ত) বলেছেন, 'ঈশ্বর সান্নিধ্যজ্ঞান আসিলে নির্ভর আসে। আমার কথা একজন অলক্ষিতভাবে নিকটে থাকিয়া শুনিতেছেন এবং নিশ্চয় তিনি আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবেন, এই জ্ঞান হওয়াকে নির্ভর বলে। নির্ভর আসিলে মানুষ স্থির হইয়া উঠে আর বুকে জোর আসে এবং কথাবার্তায় জোর হয়। অনেকেরই ধারণা যে, ঈশ্বরচিন্তা করিব, তাহা হইলে খাইতে দিবে কে?···ইহার জন্য চিন্তা করিবার কিছু নাই।···নির্ভর থাকিলে কোন ভাবিবার কথা বা কারণ থাকে না।'

খৃষ্টধর্মের সাধক ব্রাদার লরেন্স ঈশ্বর নিয়ত সান্নিধ্যবোধের অনুশীলন করেছিলেন। 'ঈশ্বর-সান্নিধ্য বোধের যে পরমানন্দ এতদিন ধরে সম্ভোগ করে আসছি, তা থেকে বঞ্চিত হওয়া অপেক্ষা তীব্রতর কষ্ট আর কিছু হতে পারে বলে আমার মনে হয় না।···ঈশ্বরের প্রতি প্রীতির জন্যে আমি জীবন বিসর্জন করতে সদাই প্রস্তুত, এই কারণে আমার কোনো বিপদের আশঙ্কা হয় না। পরিপূর্ণ শরণাগতিই ঈশ্বরের রাজ্যে যাওয়ার সুনিশ্চিত পন্থা।'

'শ্রীভগবানের প্রীতির জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ করতেও আমাদের বিরক্ত হওয়া উচিত নয়। কারণ, কাজটা যে কত বড় তা তো তিনি দেখেন না—তিনি দেখেন, অনুরাগের সাথে সেটি করা হচ্ছে কিনা।···ধর্মের সারতত্ত্ব নির্ভরতা, আশাবন্ধতা এবং সর্বভূতে প্রীতি। এইগুলি অনুশীলনের ফলেই ঈশ্বরের ইচ্ছার দ্বারা আমরা নিয়ন্ত্রিত হতে পারি। ··

'কাজ করতে করতে আমি আমার সৃষ্টিকর্তার সাথে আমার চিরাচরিত আলাপ চালিয়ে যেতাম। তাঁর কৃপা প্রার্থনা করতাম, আমার সকল কাজ তাঁকেই সমর্পণ করতাম। কাজটি শেষ হলে আমি বিবেচনা করে দেখতাম, আমার কর্তব্য কীভাবে সম্পন্ন হয়েছে। যদি সুসম্পন্ন হয়ে থাকত, শ্রীভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতাম, আর যদি না হয়ে থাকত, তবে তাঁর ক্ষমা ভিক্ষা করতাম।···

'আমি সঙ্কল্প করলাম যে, সর্বস্ব অর্পণ করেই সর্বস্ব লাভ করব। যদি শ্রীভগবানের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিলিয়ে দিতে পারি তাহলে তাঁকে আমার সমস্ত পাপের বোঝা নিয়ে নিতেই হবে। এই ভেবে তাঁরই প্রীত্যর্থে ঈশ্বর-বর্জিত সবকিছু বিসর্জন দিয়ে দিলাম। পৃথিবীতে তিনিও আমি ভিন্ন অন্য কেউই নেই, এইভাবে জীবন যাপন করতে আরম্ভ করলাম।'

শংকরাচার্য কৃত 'দক্ষিণামূর্তি স্তোত্রম্'-এ আছে—'তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নমঃ ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে।' (সেই শ্রীগুরুরূপধারী শ্রীদক্ষিণামূর্তিকে আমার এই নমস্কার।)

'নমঃ' এই শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এখানে পাওয়া যায় (ভট্টভাস্কর কৃত রুদ্রাধ্যায়ভাষ্য)—'বাক্য, মন ও শরীর দ্বারা আপনার (নিজের) স্বরূপ আরাধ্য দেবতার অধীন অর্থাৎ তৎস্বরূপ হইতে পৃথক নহে—এই অবধারণ।'* এরই নাম শরণাগতি, অপর অর্থে এর নাম ব্রহ্মত্ব। অর্থাৎ তাঁহাতেই আমি শরণাগত হচ্ছি অথবা তাঁহাকেই আমার স্বরূপ বলে অনুসন্ধান করছি।

মহর্ষি রমণ বলেন (শ্রীরমণ রত্নাবলী)—'আমরা তাঁর ওপর যে কোন ভারই দেই না কেন, ঈশ্বর তা বহন করেন। এক পরমেশ্বরের শক্তিমত্তাই সব কিছু বহন করে, তাঁর কাছে নিজেকে সমর্পণ না করে, 'আমরা এই করব বা ঐ করব' এরূপ জল্পনা করব কেন? ট্রেন সব মাল বহন করে জেনেও, তাতে ভ্রমণকালে মালপত্র ট্রেনে রেখে আরাম না করে আমরা নিজের মাথায় বইব কেন?'

'সমর্পণ করার দুটি পথ। একটি—একটি 'আমি'র উৎস খোঁজা আর সেই উৎসে লয় হয়ে যাওয়া।' অন্যটি—'আমি একান্ত অক্ষম। ঈশ্বরই সর্ব-শক্তিমান, একমাত্র তাঁর কাছে সম্পূর্ণ সমর্পণ করা ছাড়া আমার রক্ষার আর কোন উপায় নেই'—অনুভব করা এবং ঈশ্বরই একমাত্র আছেন, অহংকারের কোন মূল্য নেই, এরূপ দৃঢ় প্রত্যয়ে ক্রমশ স্থির হওয়া। উভয় পন্থা একই লক্ষ্যে নিয়ে যায়। পূর্ণ সমর্পণ জ্ঞান বা মুক্তিরই নামান্তর।'

স্বামী তুরীয়ানন্দ বলেছেন, 'নিরুৎসাহ বা হতাশ হইও না। কেন সর্বদা সুদিন ও সুসময় আশা কর? মায়ের ইচ্ছা পূর্ণ হউক। সুদিনে দুর্দিনে আমরা যেন মাকে না ভুলি।'

তিনি পত্রাবলীতে বলেছেন, '...শরণাগত হওয়া অর্থাৎ তিনি যেরূপ রাখেন তাহাতেই শুভবুদ্ধি করিয়া সন্তুষ্ট থাকা অভ্যাস করা, আপনার ইচ্ছা ঈশ্বরেচ্ছায় মিশাইয়া দেওয়া, সুখ-দুঃখ লাভালাভ প্রভৃতিতে সমবুদ্ধি রাখার অভ্যাস করা—এই আর কি। অর্থাৎ মুক্ত হলেই ঠিক ঠিক শরণাপন্ন হওয়া হয়। তার পূর্বে অভ্যাসযোগ। ঠিক ঠিক ভগবানে নির্ভরের

* 'অপরোক্ষানুভূতিঃ'—এর ব্যাখ্যা দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়

নামই মুক্তি। সরলভাবে নিষ্কপটে ঐ ভাব অভ্যাস করিলে, তাঁহার কৃপায় একদিন উহা আসিয়াই যায়।'

ফরাসী দেশের খ্রীষ্টীয় সাধক সতত ঈশ্বরের ওপর নির্ভরশীল ব্রাদার লরেন্স সম্বন্ধে স্বামী অতুলানন্দ (গুরুদাস মহারাজ) বলেছেন, " 'ঈশ্বরের ইচ্ছা', 'অন্তরের বাণী'—এগুলো বিভ্রম সৃষ্টি করতে পারে। সুতরাং এর অপব্যবহার হতে পারে। কেবলমাত্র, খাঁটি, উদ্যোগী, আন্তরিক ও অধ্যবসায়ী মানুষই ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুভব করতে পারেন। ব্রাদার লরেন্সের এত সব কাজ করতে হতো, তাঁকে মঠের সমস্ত সাধুদের জন্যে রান্না করতে হতো। কিন্তু তাঁর সর্বদা এই গভীর ভাবটি ছিল, 'তোমার ইচ্ছা, হে ভগবান, সবই তোমার ইচ্ছা, আমার নয়।' এমনকি যখন একটি সূচ কুড়িয়ে নিতে হবে, তখনও তিনি ভাবতেন, 'এ তোমার ইচ্ছা, আমার নয়।' এই ভাবে তিনি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর মনের এক অংশ ঈশ্বরে স্থাপিত ছিল, আর এক অংশ কাজে নিযুক্ত থাকত।"*

ব্রাদার লরেন্সের 'ঈশ্বর-সান্নিধ্যবোধের সাধনা' পুস্তকে অনুবাদগ্রন্থে উপক্রমণিকায় শ্রীহরিশ্চন্দ্র সিংহ লিখেছেন, 'সাধু লরেন্স ধর্মজীবনের প্রারম্ভেই ঈশ্বরের নিয়ত সান্নিধ্যবোধ অনুশীলনের সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। কি উপায়ে এই সাধনার অনুশীলন করতে পারবেন, এটি বিশেষ করে জেনে নেবার জন্যেই তিনি সেই সময়ে প্রচলিত নানা ধর্মগ্রন্থ ও সাধকগণের জীবনী পাঠ করতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তিনি লিখেছেন যে ঐগুলি তাঁকে কোনো সাহায্য না করে বরং বিভ্রান্তই করে তুলেছিল। তাই দেখা যায় তিনি শাস্ত্রবর্ণিত কোনো বিধিবদ্ধীয় পদ্ধতি অবলম্বন করেন নি। শ্রীভগবান তাঁর কাছে কাছে—এমন কি তাঁর অন্তরে থেকে এ বিষয়ে স্বয়ং তাঁকে যে প্রেরণা দিতেন, তিনি অতঃপর শুধু তারই অনুসরণ করে যেতেন। এইরূপে সম্পদে-বিপদে, সুখে-দুঃখে, নির্দিষ্ট প্রার্থনাকালে অথবা কাজকর্মে ব্যাপৃত থাকার সময়ে—সর্বাবস্থায় নিরন্তর এই অনুশীলনের ফলে তিনি দিব্য

* স্বামী ধীরেশানন্দ অনুলিখিত 'Atman Alone Abides' গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ১

আনন্দের অধিকারী হয়েছিলেন।'

আত্মসমর্পণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, (শান্তিনিকেতন ১ম)—'ব্রহ্মকে পাওয়ার কথাটা ঠিক বলা চলে না। কেননা, তিনি তো আপনাকে দিয়েই বসে আছেন, তাঁর তো কোনখানে কমতি নেই—এ কথা তো বলা চলে না যে, এই জায়গায় তাঁর অভাব আছে, অতএব আর এক জায়গায় তাঁকে খুঁজে বেড়াতে হবে।

অতএব, ব্রহ্মকে পেতে হবে এ কথাটা বলা ঠিক চলে না—'আপনাকে দিতে হবে' বলতে হবে। ওইখানেই অভাব আছে, সেইজন্যেই মিলন হচ্ছে না। তিনি আপনাকে দিয়েছেন, আমরা আপনাকে দিই নি। আমরা নানাপ্রকার স্বার্থের অহংকারের ক্ষুদ্রতার বেড়া দিয়ে নিজেকে অত্যন্ত স্বতন্ত্র, এমন-কি বিরুদ্ধ করে রেখেছি।

কিন্তু আসল কথা এই যে, যিনি পরিপূর্ণরূপে নিজেকে দান করেছেন আমরাও তাঁর কাছে পরিপূর্ণরূপে নিজেকে দান না করলে তাঁকে প্রতিগ্রহই করা হবে না। আমাদের দিকেই বাকী আছে।

তাঁর উপাসনা তাঁকে লাভ করবার উপাসনা নয়—আপনাকে দান করবার উপাসনা। দিনে দিনে ভক্তি-দ্বারা, ক্ষমা-দ্বারা, সন্তোষের দ্বারা, সেবার দ্বারা, তাঁর মধ্যে নিজেকে মঙ্গলে ও প্রেমে বাধাহীনরূপে ব্যাপ্ত করে দেওয়াই তাঁর উপাসনা।

...শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ। শর যেমন লক্ষ্যের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রবেশ করে তন্ময় হয়ে যায় তেমনি করে তাঁর মধ্যে একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে যেতে হবে। এই তন্ময় হয়ে যাওয়াটা কেবল যে একটা ধ্যানের ব্যাপার, আমি তা মনে করি নে। এটা হচ্ছে সমস্ত জীবনেরই ব্যাপার, সকল অবস্থায় সকল চিন্তায়, সকল কাজে এই উপলব্ধি যেন মনের এক জায়গায় থাকে যে, আমি তাঁরই মধ্যে আছি, কোথাও বিচ্ছেদ নেই।

আমি আছি তাঁরই মধ্যে, আমি করছি তাঁরই শক্তিতে এবং আমি ভোগ করছি তাঁরই দানে। এই জ্ঞানটিকে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো সহজ করে তুলতে হবে—এই আমাদের সাধনার লক্ষ্য।'

শরণাগতির সাধন সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন (মা)—'ভগবানের কাছে, ভাগবতী শক্তির কাছে আপনাকে সমর্পণ—আপনি যা, আপনার কাছে যা কিছু, আপনার চেতনার প্রতি স্তর, প্রতি বৃত্তির সমর্পণ। সমর্পণ ও আত্মনিবেদন যে পবিমাণে বৃদ্ধি পায়, সাধকও তত সজ্ঞান হইয়া উঠে, অনুভব করে যে ভাগবতী শক্তিই সাধনা করে চলেছেন, তার মধ্যে ক্রমেই আপনাকে সমধিক ঢেলে দিতেছেন, তার মধ্যে দিব্য প্রকৃতির মুক্তি ও পূর্ণতা স্থাপন করে চলেছেন। এই সজ্ঞানতার ক্রিয়া যতই তার নিজস্ব চেষ্টার স্থান অধিকার কববে, তার উন্নতিও ততই দ্রুত ও সত্য হয়ে উঠবে। কিন্তু সমর্পণ ও নিবেদন যতদিন ঊর্ধ্বপ্রান্ত হতে অধঃপ্রান্ত পর্যন্ত নির্দোষ সম্পূর্ণ না হয়, ততদিন ব্যক্তিগত প্রয়াসের প্রয়োজন সর্বতোভাবে অগ্রাহ্য করতে সে পারে না। স্মরণে রেখ, তামসিক যে সমর্পণ—সমর্পণের সর্ত যে পালন করতে চায় না, ভগবানকে যে আহ্বান করে তিনি সব কাজ করে দেবেন বলে, যে চায় সকল ক্লেশ দ্বন্দ্ব এড়িয়ে চলতে—তা আত্মপ্রতারণা —মুক্তির পূর্ণতার দিকে তা নিয়ে যায় না।'

শ্রীঅরবিন্দ আরও বলেছেন (মা)—'তোমার শ্রদ্ধা, তোমার আন্তরিকতা, তোমার সমর্পণ যত পূর্ণতর হয়ে উঠবে, মায়ের করুণা ও অভয় ততই তোমাকে ঘিরে রাখবে। আর মা ভগবতীর করুণা ও অভয়ের মধ্যে তুমি যখন, তখন কী আছে এমন যা তোমাকে স্পর্শ করতে পারে, আর কাকেই বা তুমি ভয় করবে? ও বস্তুটির স্বপ্নও তোমাকে সকল বাধা বিপত্তি ও সংকট পার করে দেবে। তাঁর আশ্রয় যদি তোমাকে আবৃত করে রাখে তবে নিরাপদে তুমি তোমার পথে চলে যেতে পারবে, কারণ সে পথ মায়েরই।'

যোগরহস্যম্ বা পাতঞ্জল যোগদর্শন সমাধিপাদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রীযোগেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, '…যখন জ্ঞানে বা অজ্ঞানে জীব-মাত্রই তাঁহাতে সর্বতোভাবে সমর্পিত হইয়া রহিয়াছে, তখন আর ভয় কি, আত্মসমর্পণ তো আর করিতে হইবে না, নিত্যসিদ্ধ সমর্পণটি শুধু বুঝিতে হইবে, অনুভব করিতে হইবে, প্রতি কর্মে সার্থকতা লক্ষ্য করিতে হইবে।'

একটি প্রশ্নের উত্তরে লাটু মহারাজ (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) বলেছিলেন—'দেখো! এইটুকু বুঝেছি যে, এক ভাঁড় জল আলাদা করে রেখে দিলে তা শুকিয়ে যায়, বাকী সেই ভাঁড়কে যদি গঙ্গার জলে ডুবিয়ে রাখতে পারি, তাহলে জল আর শুকোতে পারে না। তেমনি এই জগতে আমাদের মনকে যদি ভগবানের পায়ে সঁপে দিতে পারি, তাহলে বিষয় বাতাসে হামাদের মন আর শুকিয়ে উঠতে পারে না। জগত আর হামাদের কাছে নিরানন্দ বোধ হবে না।'

আর একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'দেখো! গঙ্গার জলে ডুব দিলে মাথার উপর হাজার মন জল থাকলেও ভারটা বোঝা যায় না, তেমনি ভগবানের সংসারে ভগবানকে ধরে ডুব দিলে সংসারের বোঝা আর বোঝা বলে মনে হয় না। সংসার তখন আনন্দের খেলা মনে হয়।'

(শ্রীশ্রীলাটুমহারাজের স্মৃতিকথা)

বিশিষ্ট সাধক শ্রীরামঠাকুর শরণাগতির সাধন সম্বন্ধে বলেছেন—'শরণাগত ভাবকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে শাস্ত্রে এ ভাবে কর্তব্যবোধে নিয়ম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন—

(১) ভগবান অবশ্যই আমার মঙ্গলবিধান করবেন এবং আমাকে রক্ষা করবেন, এ ভাব হৃদয়ে পোষণ।

(২) কর্তৃত্ব-অভিমান-শূন্য হইয়া অর্থাৎ নিজের সামর্থ্যবিধি সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া ভগবানে সমস্ত ভার ন্যস্ত করা। যাবতীয় কর্মকে ভগবৎ-কর্ম জানিয়া কর্তব্য সম্পাদন করা।

(৩) শয়নে, স্বপনে, ভোজনে, দানে—সকল কর্মানুষ্ঠানে ভগবৎ-স্মরণ ও দিবানিশি নামের দাস হইলেই স্বভাব—অর্থাৎ স্বরূপ প্রকাশ হয়।'

'আত্মদর্শন ও সাধনতত্ত্ব' গ্রন্থে 'ঈশ্বরার্পণ' সম্বন্ধে বলতে গিয়ে 'তীর্থ-স্বামী' বলেছেন, 'ঈশ্বরাত্মা মায়াধীশ বলিয়া নিত্যমুক্ত ও নিত্যতত্ত্বস্থ। তিনি তত্ত্বদৃষ্টিতে জীব-কর্মের কারয়িতা ও তৎফলের ভোজয়িতা নহেন বলিয়া কারয়িতৃত্ব ও ভোজয়িতৃত্বের অভিমান রাখেন না এবং তজ্জন্য তিনি জীবের কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাভিমানের দায়িত্ব গ্রহণে তত্ত্বতঃ অনিচ্ছুক।...দায়িত্ব গ্রহণে

তত্ত্বতঃ অনিচ্ছুকের উপর দায়িত্বভার চাপিয়া দেওয়ার প্রচেষ্টার ফলেই সাধন-সমর আরম্ভ। এই সাধন-সমর-কৌশল বা সাধন-সমরে জয়লাভের কৌশল হইল—ঈশ্বরাদেশ রূপ শাস্ত্র-বিধান অনুসারে ভৃত্যবৎ স্ববর্ণাশ্রমোচিত ধর্মপরিচালনাত্মক নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠান দ্বারা ঈশ্বরার্চনা। ইহাকেই ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কর্মানুষ্ঠান বলিয়া বলা হইয়া থাকে।'

স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্য 'আত্মনিবেদন' প্রবন্ধে বলেছেন, 'এই সাধনের এক প্রণালী, হৃদয়স্থ ঈশ্বরের দ্বারা যেন প্রেরিত হইয়া আমার এই কর্ম হইতেছে—প্রতি কর্মে এইরূপ স্মরণ করিতে থাকা।···যোগ-কারিকায় বলা হয়েছে—ঈশ্বরের দ্বারা প্রেরিত হইয়া যেন আমার সমস্ত কর্ম হইতেছে, এইরূপ ভাবনা করা কর্মযোগীদের ঈশ্বর-প্রণিধান।'

স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্য আরও বলেছেন (আত্মনিবেদন)—'আত্মনিবেদন অর্থে নিজেকে উপাস্যের উদ্দেশে নিবেদন করা।···নিজস্ব বা যাহা 'আমার' এরূপ দ্রব্য দুই প্রকার—আধ্যাত্মিক ও বাহ্য। আধ্যাত্মিক নিজস্ব—করণবর্গ বা মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও তদাধার দেহ। আর, বাহ্য—ধনাদি। ধনাদি দ্রব্য উপাস্যের উদ্দেশ্যে বা সাধুকার্যে দান করা সুসাধ্য ও সাধারণ নিজস্ব নিবেদন। কিন্তু আধ্যাত্মিক দ্রব্য যে ইন্দ্রিয়াদি তাহা দান করা রূপক অর্থে দান বুঝিতে হইবে।···'আমি'র এই করণ-শক্তি আছে, যথা—মন, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ। মনকে দান করার কি অর্থ হইতে পারে? মনের কার্য যে চিন্তা তাহা উপাস্যে ব্যাপৃত করা, যথা—উপাস্যের চিন্তন, উপাস্যের ধ্যান, উপাস্যের জন্য সংকল্প ইত্যাদি, এইরূপ করাই মনকে নিবেদন করা হইবে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে নিবেদনও সেইরূপ হইবে।

আনন্দময়ী মার শরণাগতি ভাবের নিজস্ব একটি উক্তি একজন সাধু মহারাজ স্বকর্ণে শুনে বর্ণনা করেছেন (১৭।১২।১৯৭৩)—মা বলেছেন, 'আমি ভগবানের একটি শিশু মেয়ে মাত্র। আমি কিছু জানি না। আমি লেখাপড়া জানি না, শাস্ত্র জানি না, আমার গুরু নেই। এর ভেতর থেকে যা বলায় তাই বলি। আমাকে সকলে বসিয়ে নানা কথা, ঈশ্বরীয় কথা

জিজ্ঞেস করে—আমি কিছু জানি না—যা বলায় তাই বলি। ভগবানের জন্য যদি কেউ আন্তরিক কামনা করে, ভগবান পেতে চায়, তবে তার উদ্দেশ্য নিশ্চয় সফল হবে।···আমি রাস্তার অনাথ শিশু বালিকা মাত্র। আমাকে যে যেখানে যেমন ভাবে নিয়ে যায়, আমি সেখানে যাই। কখন কোথায় যাব আমি কিছু জানি না। অনাথ মেয়েকে যেমন সকলে দেখা-শুনা করে—এই ভাবে আছি। আমি যন্ত্র তিনি যন্ত্রী—এর ভেতর দিয়ে যেমন চালান তেমনি চলি। এ শরীরটা যন্ত্র মাত্র—কানে হাত দাও বুঝতে পারবে যন্ত্র চলছে।···এই ঘর বাড়ি আশ্রম, এ কি আমি করেছি? আমি কিছুই জানি না। রেজিস্টারী করি নি, সই করি নি, টিপসইও দিই নি। আমি নিরাশ্রয় ক্ষুদ্র বালিকা।'

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত-প্রসঙ্গে (১ম)' স্বামী ভূতেশানন্দ নারদীয় ভক্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন—'ঠাকুর বলেছেন, ঋষিদের মতো কঠোর তপস্যা করবে তোমাদের সে সময় কোথায়। তোমরা অল্পায়ু, অন্নগত প্রাণ। সময় নেই। যাগ-যজ্ঞ অত বিরাট করে করা তোমাদের দরকার হবে না।

'কী দরকার হবে তা নানাভাবে বলেছেন, নারদীয়া ভক্তির কথা বলেছেন। সে ভক্তি কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের নয়। নারদীয়া ভক্তির অর্থ—শুদ্ধা ভক্তি, শরণাগতি সহকারে ভক্তি, যাতে ভক্ত ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করে। কি করে' করে ঠাকুর দেখিয়ে দিচ্ছেন: মা, আমি কিছু জানি না; তুমি আমাকে সব জানিয়ে দাও, বুঝিয়ে দাও। কেমন করে তোমাকে পেতে হয়, তার সাধন ভজন আমি জানি না। যা করবার আমাকে দিয়ে করিয়ে নাও।—এই যে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ, এরই নাম নারদীয়া ভক্তি।'

কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন (৩।১০।১)—'দেহের সুখ দুঃখ আছেই। যার ঈশ্বর লাভ হয়েছে সে মন, প্রাণ, দেহ, আত্মা সমস্ত তাঁকে সমর্পণ করে। পম্পা সরোবরে স্নানের সময় রাম-লক্ষ্মণ সরোবরের নিকট মাটিতে ধনুক গুঁজে রাখলেন। স্নানের পর উঠে লক্ষ্মণ তুলে দেখেন যে ধনুক রক্তাক্ত হয়ে রয়েছে। রাম দেখে বললেন, ভাই, দেখ দেখ, বোধ হয় কোন

জীবহিংসা হলো। লক্ষ্মণ মাটি খুঁড়ে দেখেন, একটা বড় কোলা ব্যাঙ। মুমূর্ষু অবস্থা। রাম করুণ স্বরে বলতে লাগলেন, 'কেন তুমি শব্দ কর নাই, আমরা তোমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করতাম। যখন সাপে ধরে তখন তো খুব চীৎকার করো'। ভেক বললে, 'রাম! যখন সাপে ধরে তখন আমি এই বলে চীৎকার করি—'রাম রক্ষা করো, রাম রক্ষা করো। এখন দেখছি রামই আমায় মারছেন! তাই চুপ করে আছি।'

ভেকের শরণাগতির এটি পূর্ণ অবস্থা বলা যায়—যেখানে মন প্রাণ দেহ আত্মা সবই রামকে সমর্পণ করা হয়েছে।

যজ্ঞের পূর্ণাহুতির মন্ত্রটি উল্লেখ করে একজন স্বামীজী বলেন, 'আমার সব কিছু জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার মধ্যে স্থিত আমার মন, বুদ্ধি, দেহ, ইন্দ্রিয়, আমার দ্বারা কৃত কর্ম, উক্ত বাক্য, শ্রুত বিষয়—সবই মায়ের পায়ে সমর্পণ করলুম। তখন আমার আর কিছু রইল না। তাহলে আমার কাজকর্ম সংসার নির্বাহ হবে কেমন করে? আমি তো সব কিছু মাকে দিয়ে দিলুম।

'তখন মায়ের কাছে প্রার্থনা করতে হয়, মা, আমার জীবন রক্ষার প্রয়োজনে তোমাকে যা দান করেছি তা থেকে চেয়ে নিচ্ছি, সংসার প্রতিপালনের জন্যে। একে বলে দান-প্রতিগ্রহ। শরণাগতির এ ভাবটি বেশ।'

'শরণাগতির সাধন বলতে, তাঁকে আশ্রয় করা। ভাবের দিক থেকে তাঁতে নির্ভর করা। এই ভাব নিয়ে থাকা—তিনিই সব করছেন, করাচ্ছেন।'*

১। (গ) সমর্পণে প্রার্থনা

পাঞ্চরাত্র সংহিতার মধ্যে লক্ষ্মীতন্ত্রে বলা হয়েছে—'প্রতিদিন শেষ রাত্রে উঠে শুদ্ধ পবিত্র হয়ে ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করবে—'সর্বভূতের প্রতি মৎ কর্তৃক যথাশক্তি ও যথামতি প্রাতিকূল্য পরিত্যক্ত এবং আনুকূল্য সংশ্রিত হইয়াছে। অলস, অল্পশক্তি এবং যথাবৎ অবিজ্ঞাতা আমার দ্বারা

* স্বামী জ্যোতিঃস্বরূপানন্দ

ক্রিয়মাণ (তোমাকে প্রাপ্তির) উপায়সমূহ আমাকে তারণকারী নিশ্চয় হইবে না। সুতরাং আমি কৃপণ, দীন, নির্লেপ এবং অকিঞ্চন। কারুণ্যরূপা দেবী লক্ষ্মীসহ হৃষীকেশ রক্ষক বলিয়া সর্বসিদ্ধান্ত—এমন কি, বেদান্তেও গীত হয়। আমার পুত্রদারাদি যাহা কিছু ত্যাজ্য আছে, তৎসমস্তই আত্মা সহ, হে শ্রীপতি, তোমার পাদপদ্মে ন্যস্ত হইল। হে দেবেশ, হে লক্ষ্মীপতি, হে নাম, আমার শরণ হও।'*

শরণাগতিতে প্রার্থনা একটি মূল্যবান সাধন। প্রার্থনার মহিমা সর্বশাস্ত্রেই, সকল মতের ও পথের সাধনায় বর্ণিত আছে।

আচার্য যামুন দাস-ভাবকে প্রাধান্য দিতেন। তিনি 'স্তোত্ররত্নে' কাতরভাবে ভগবান নারায়ণের নিকট প্রার্থনা করেছেন*—'হে হরি, হাজার হাজার অপরাধে অপরাধী এবং (সেই হেতু) অতি ঘোর সংসার সাগরে নিমগ্ন (আমি তাহা হইতে নিস্তারের অপর) উপায়-রহিত হইয়া তোমার শরণাগত হইয়াছি। আমাকে কৃপা করিয়া আত্মসাৎ কর। তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি দয়িত পুত্র, তুমি প্রিয় সুহৃদ্, তুমি মিত্র, তুমি গুরু এবং তুমি জগতের সকলের গতি। আমি তোমার—তোমার ভৃত্য, তোমার পরিজন, তুমিই আমার একমাত্র গতি এবং তোমাতে প্রপন্ন। তোমার সহিত এই প্রকার সম্বন্ধ হইলেও আমি তোমারই দাস, তুমি আমাকে রক্ষা কর।' ইত্যাদি

শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠের পূর্বে দেবী-কবচ পাঠ বিধেয়। এই দেবী-কবচ সম্বন্ধে রাসমোহন চক্রবর্তী তাঁর সম্পাদিত চণ্ডীতে লিখেছেন—'এই দেবী-কবচে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির উল্লেখ আছে এবং সেই সকল স্থান রক্ষা করিবার জন্য জগন্মাতার বিভিন্ন নাম স্মরণপূর্বক প্রার্থনার বিধান আছে। ইহার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য এই যে, সাধক তাঁহার সত্তার বিভিন্ন অংশকে মায়ের দিব্যশক্তি ও জ্যোতির দিকে খুলিয়া ধরিবেন, যেন মায়ের কৃপায় আধারের সর্বাঙ্গীণ রূপান্তর সম্ভব হয়। পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও আত্ম-উন্মীলনের দ্বারা ভাগবতী শক্তিকে আধারের মধ্যে কাজ করিতে দিলেই দিব্য রূপান্তর

লাভ সম্ভব।'

গীতাতে ভগবান বলেছেন, 'চতুর্বিধ সুকৃতিশালী ব্যক্তি আমার ভজনা করেন।' তার মধ্যে প্রথম হলো—আর্ত। যে আর্তিগ্রস্ত অর্থাৎ শত্রু, ব্যাধি প্রভৃতিতে আপদ্‌গ্রস্ত, সে তা থেকে নিবৃত্তি লাভের জন্য ভগবানের ভজনা, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে। ভগবান কৃপাপরবশ হয়ে সেই আর্তকে রক্ষা করেন। আর্ত ভক্ত ঠিক ঠিক শরণাগত হতে পারে।'

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে 'দেবীমাহাত্ম্য' অধ্যায়ে (২৬-২৯) বলা হয়েছে—'অরণ্যে দাবাগ্নি দ্বারা পরিবেষ্টিত হলে, প্রান্তরে দস্যুদল কর্তৃক বেষ্টিত হলে, নির্জন স্থানে শত্রুদল কর্তৃক আক্রান্ত হলে, বনমধ্যে সিংহ, ব্রাঘ্র বা বন্য-হস্তিগণ কর্তৃক অনুসৃত হলে, ক্রুদ্ধ রাজা কর্তৃক বধার্থ আদিষ্ট বা কারারুদ্ধ হলে, মহাসমুদ্রে জাহাজে অবস্থিত হয়ে ঝড়ের দ্বারা আকুলিত হলে, অতি ভীষণ যুদ্ধে শস্ত্রসমূহ পতিত হতে থাকলে, অথবা সর্ববিধ ভীষণ উপদ্রবে যন্ত্রণায় অভিভূত হলে মনুষ্য আমার চরিত্র স্মরণ করে সংকট থেকে মুক্ত হয়ে থাকে।'

এখানে দেখা যায় সাধকের প্রাণের আকুল আর্তি, মায়ের সর্বশক্তিমত্তায় দৃঢ় বিশ্বাস এবং তাঁর প্রতি ঐকান্তিক শরণাগতি—এই তিনের একত্র সমাবেশ হলেই মায়ের কৃপাশক্তি অবাধে ক্রিয়াশীল হয়, মা অবশ্যই ভক্তকে সর্বসঙ্কট থেকে মুক্ত করেন।

শুধু বাহ্যিক সঙ্কট নয়, মানুষের অন্তরেও এক ভীষণ সঙ্কট চলছে। সাধকের নিকট এই সঙ্কট আরও তীব্র। সেখানেও উপায় আর্তি ও শরণাগতি :

'সংসার অরণ্যে নিরন্তর অশান্তির দাবানল জ্বলিতেছে, কামক্রোধাদি রিপুবর্গ পথিকের সর্বস্ব কাড়িয়া লইতে উদ্যত ; হিংসাদ্বেষাদি আসুরিক বৃত্তিসমূহ হিংস্র জন্তুর ন্যায় তাঁহার প্রাণ নাশার্থ পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে—এই অনুধ্যানের দ্বারা সাধককে অন্তরে প্রবল আর্তি জাগাইতে হইবে। জীব এই ভবকারাগারে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত শৃংখলিত বন্দীতুল্য জীবনযাপন করিতেছে—ইহা উপলব্ধি করিতে পারিলে সাধক নিশ্চয়ই একান্ত ব্যাকুল

হইয়া ভবপাশনাশিনী মোক্ষদায়িনী জগদম্বার শ্রীচরণযুগলে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। সমুদ্রে ঝটিকাগ্রস্ত পোতারোহী ব্যক্তি যেমন নিজের জীবন রক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া আর্তনাদ করে, এই ভীমভবার্ণবে নিমজ্জমান সাধককেও তেমনি আর্তি লইয়া 'দুর্গভবসাগরনৌরসঙ্গা' শ্রীদুর্গাকে স্মরণ করিতে হইবে। ভীষণ সংগ্রাম ক্ষেত্রে সৈনিকের উপর চতুর্দিক হইতে শত্রুগণ মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছে, তাহার সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত। এইরূপ ঘোর সঙ্কটে নিপতিত সৈনিক স্বীয় জীবনরক্ষার জন্য যেমন ব্যাকুল হয়—জীবন সংগ্রামে শত আঘাতে জর্জরিত, অশেষ বেদনাক্লিষ্ট সাধককেও তেমন আর্তি লইয়া সর্বদুঃখার্তহারিণী জগজ্জননীর শরণাপন্ন হইতে হইবে। মা স্বমুখে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, এইরূপ আর্তি লইয়া যে কেহ তাঁহাকে স্মরণ করে, তিনি তাঁহার সকল সঙ্কট মোচন করিয়া দেন—'স্মরণ্ মমৈতচ্চরিতং নরো মুচ্যেত সঙ্কটাৎ'। (শ্রীশ্রীচণ্ডী—রাসমোহন চক্রবর্তী সম্পাদিত)

বিশ্বসারতন্ত্রে আপদ্ উদ্ধারকল্পে 'শ্রীদুর্গাস্তবরাজ' নামক স্তোত্রে আর্ত-ভক্তের ঐকান্তিক শরণাগতি ধ্বনিত হয়েছে—

'হে দেবি, অপার দুরতিক্রমণীয়, অতি ভীষণ বিপদসমুদ্রে যাহারা ডুবিয়া যাইতেছে, সেই জীবগণের তুমিই একমাত্র আশ্রয়, তুমি তাহাদের উদ্ধারের তরণীস্বরূপ।···তুমিই দেবগণের এবং সিদ্ধ ও বিদ্যাধরগণের আশ্রয়। মুনি, অসুর ও মনুষ্যগণের, ব্যাধিপীড়িত ব্যক্তিদিগের, রাজদ্বারে অভিযুক্ত লোকদিগের এবং দস্যুদল পরিবেষ্টিত ব্যক্তিগণের তুমিই একমাত্র আশ্রয়। হে দুর্গে, প্রসন্না হও, তুমি আমাকে রক্ষা কর।'

আর্ত ভক্ত ঠিক ঠিক শরণাগত হতে পারে এবং প্রার্থনা তার বড় সম্বল। রাজগৃহের পরাক্রান্ত রাজা জরাসন্ধ ৮৬ জন ক্ষুদ্র রাজাকে বন্দী করে রেখেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে আরও ১৪ জন রাজাকে বন্দী করে একশত রাজাকে নিয়ে নরমেধ যজ্ঞ করবেন। বন্দী রাজারা শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়ে ঐকান্তিক প্রার্থনা জানাতে লাগলেন। ভীম ও অর্জুন সহায়ে শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধকে বধ করে রাজাদের উদ্ধার করেছিলেন।

ঈশানুশরণে প্রার্থনা করা হয়েছে—'হে প্রভু, আমার যাহা কিছু লাভ করিবার আছে বা যাহা কিছু আমার আকাঙ্ক্ষা করা উচিত, তাহার সবই তোমার কাছে আছে। তুমিই আমার মুক্তি, আমার আশা, আমার শক্তি, আমার মান যশ—সব। সুতরাং অদ্যকার দিনে তুমি তোমার সেবককে আনন্দ দান কর। হে প্রভু যীশু, আমি তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম। হে প্রভু, আমি তোমার কৃপালাভের আশায় তোমার হস্তে আমাকে সমর্পণ করিতেছি।'

খ্রীষ্টধর্মে প্রার্থনাই বড় অনুষ্ঠান। প্রভু যীশুর নিকট, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা দ্বারা ভজনা করা হয়ে থাকে। যে কোন কামনা বাসনা পূরণের জন্যে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করলে তিনি পূরণ করে দেন, এই বিশ্বাস খ্রীষ্টানগণ সর্বদা পোষণ করেন।

মুসলমান ধর্মেও প্রার্থনার মূল্য অত্যন্ত বেশী। দিনের মধ্যে যে পাঁচ বার নামাজ পড়বার প্রথা মুসলমানদের রয়েছে—সে অনুষ্ঠান প্রার্থনা ছাড়া আর কিছুই নয়। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানানো—সে ধর্মের একটি বড় অনুষ্ঠান।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'জীবের কর্তব্য কী?—আর কি, তাঁর শরণাগত হওয়া, আর তাঁকে যাতে লাভ হয়, দর্শন হয়, সেইজন্য ব্যাকুল হয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করা।'

'আমি বলি উপায় থাকবে না কেন? তাঁর শরণাগত হয়ে প্রার্থনা কর, যাতে অনুকূল হাওয়া বয়—যাতে শুভ যোগ ঘটে।'

এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ একটি গল্প বললেন—'একজনের ছেলেটি যায় যায় হয়েছিল। সে ব্যাকুল হয়ে এর কাছে ওর কাছে উপায় জিজ্ঞাসা করে বেড়াচ্ছে। একজন বললেন, তুমি যদি এইটি যোগাড় করতে পার তো ভাল হয়—স্বাতী নক্ষত্রের জল পড়বে মড়ার মাথার খুলির ওপর। সেই জল একটি ব্যাঙ খেতে যাবে। সেই ব্যাঙকে একটি সাপ তাড়া করবে। ব্যাঙকে কামড়াতে গিয়ে সাপের বিষ মড়ার মাথার খুলিতে পড়বে, আর ব্যাঙটি পালিয়ে যাবে। সেই বিষজল একটু লয়ে রোগীকে খাওয়াতে হবে।

'লোকটি অমনি ব্যাকুল হয়ে সেই ঔষধ খুঁজতে স্বাতী নক্ষত্রে বেরুল। এমন সময় বৃষ্টি হচ্ছে। তখন ব্যাকুল হয়ে ঈশ্বরকে বলছে, ঠাকুর এইবার মড়ার মাথা জুটিয়ে দাও। খুঁজতে খুঁজতে দেখে একটি মড়ার খুলি, তাতে স্বাতী নক্ষত্রের জল পড়েছে। তখন সে আবার প্রার্থনা করে বলতে লাগল, দোহাই ঠাকুর, এইবার আর কটি জুটিয়ে দাও—ব্যাঙ ও সাপ। তার যেমন ব্যাকুলতা তেমনি সব জুটে গেল। দেখতে দেখতে একটি সাপ ব্যাঙকে তাড়া করে আসছে, আর কামড়াতে গিয়ে তার বিষ ঐ খুলির ভিতর পড়ে গেল।

'ঈশ্বরের শরণাগত হয়ে তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাকলে, তিনি শুনবেনই শুনবেন—সব সুযোগ করে দেবেন।'

এখানে দেখা যাচ্ছে, শরণাগতের অবলম্বন হলো প্রার্থনা। শরণাগত তার স্বাভাবিক কাজকর্মের মধ্যে প্রার্থনার ভাবটুকু নিয়ে থাকবে—শুভ যোগ ঘটার জন্যে ব্যাকুল ভাবে প্রার্থনা। শরণাগতের নিজস্ব ইচ্ছা নেই, নিজস্ব ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হয়ে কিছু করবার নেই—সব ইচ্ছা সব কর্ম সমর্পিত। কিন্তু নিজের বলতে আছে শুধু প্রার্থনা। সে আর্তভক্ত, প্রার্থনাই তার একমাত্র সম্বল, প্রার্থনাই তার একমাত্র শক্তি।

কথামৃতের একদিনের বর্ণনা—

'সন্ধ্যা হয়েছে, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর হাততালি দিয়ে হরিনাম করছেন, তারপর প্রার্থনা করছেন—'ও রাম! ও রাম! আমি ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন—আমি ক্রিয়াহীন! রাম শরণাগত! ও রাম শরণাগত! দেহসুখ চাই নে রাম! লোকমান্য চাই নে রাম। শরণাগত, শরণাগত! কেবল এই করো—যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হয় রাম! আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হই না রাম! ও রাম শরণাগত!'

'ঠাকুর প্রার্থনা করছেন, সকলে একদৃষ্টে তাঁর দিকে চেয়ে রয়েছেন। তাঁর করুণামাখা স্বর শুনে অনেকে অশ্রু সংবরণ করতে পারছেন না।'

ঠাকুর এখানে শেখাচ্ছেন, প্রার্থনা কীরূপ ব্যাকুলতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে করতে হয়।

প্রার্থনা কীরূপ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন (বাণী ও রচনা ৪)—প্রকৃত ভক্ত নিজের জন্য কখন কিছু ইচ্ছা করেন না বা কোন কার্য করেন না। 'প্রভু, লোকে তোমার নামে বড় বড় মন্দির নির্মাণ করে, তোমার নামে কত দান করে। আমি দরিদ্র, আমার কিছু নাই, তাই আমার এই দেহ তোমার পাদপদ্মে সমর্পণ করিলাম। প্রভু, আমায় ত্যাগ করিও না।' ইহাই ভক্তহৃদয়ের গভীর প্রদেশ হইতে উত্থিত প্রার্থনা।'

বরানগর মঠে তীব্র বৈরাগ্য নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানেরা যখন তপস্যায় মগ্ন তখন একদিনের চিত্র কথামৃতকার ফুটিয়ে তুলেছেন—

'নরেন্দ্রনাথ তাঁর গুরুভাই প্রসন্নকে গীতা থেকে এবং গান গেয়ে শরণাগতির কথা বারবার উল্লেখ করে বলেছেন, 'পড়ে থাক্, তাঁর শরণাগত হয়ে পড়ে থাক্।···ঈশ্বর দয়ার সিন্ধু, তাঁর শরণাগত হয়ে থাক্। তিনি কৃপা করবেন! তাঁকে প্রার্থনা কর—'যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্···।

'নরেন্দ্র বাসুদেবাষ্টক সুর করে বলছেন—'হে মধুসূদন! আমি তোমার শরণাগত। আমাকে কৃপা করে কামনিদ্রা, পাপ, মোহ, স্ত্রী-পুত্রের মোহ-জাল, বিষয় তৃষ্ণা থেকে ত্রাণ কর। আর পাদপদ্মে ভক্তি দাও।'

এখানেও শরণাগতের প্রার্থনার কথাই বলা হয়েছে।

স্বামী শিবানন্দ বলেন (শিবানন্দ-বাণী)—'তোমরা সংসারে রয়েছ, নানা কাজকর্ম আছে, তোমাদের তো সাধন-ভজন করবার মতন সময় নেই। তোমরা তাঁর শরণাগত হয়ে পড়ে থাক আর কাঁদ। কেবল কাঁদ আর প্রার্থনা কর, 'প্রভু, দয়া কর দয়া কর।'

একজন সন্ন্যাসীকে তিনি একদিন বলছেন, 'বাবা, শরণাগত হয়ে পড়ে থাক। তাঁর কৃপা না হলে কিছুই হবার নয়। জপধ্যান করে কি তাঁকে ধরতে পারে মানুষ? তিনি যদি দয়া করে ধরা দেন তবেই, নইলে আর তাঁকে পাবার জো নেই। কার সাধ্য যে তাঁকে ধরে? সাধনভজন মানুষ কতক্ষণ করবে? দু ঘণ্টা, চার ঘণ্টা কি জোর আট ঘণ্টা। আর সেই

সাধনার প্রবৃত্তিও তিনিই দেন। সব শক্তির আধার যে তিনি। তাঁর দয়া না হলে তিনি শক্তি না দিলে কি করে সাধন ভজন করবে? তাই বলছি, শরণাগত হয়ে পড়ে থাক। তবেই তিনি কৃপা করবেন।···দয়া দয়া। দয়া কর প্রভু।···খুব কাঁদ আর প্রার্থনা (করজোড়ে), ঠাকুর, আমাদের ত্যাগ বৈরাগ্য বাড়িয়ে দাও, আমাদের পবিত্র কর, পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ভালোবাসা বাড়িয়ে দাও। তুমি হাত ধরে থাক।'

স্বামী তুরীয়ানন্দ এক পত্রে লিখেছেন, 'প্রভুর শরণ, ইহাই সার। তাঁহার চরণে একান্ত ভক্তি, তাঁহার ভক্তে প্রীতি, তাঁহার নামে রুচি—এই সব আসল প্রার্থনা।'

খৃষ্টধর্মের সাধক ব্রাদার লরেন্স তাঁর 'ঈশ্বর-সান্নিধ্যবোধের সাধনা'য় প্রার্থনা সম্বন্ধে বলেছেন, 'শ্রীভগবানের সঙ্গে নিরন্তর যুক্ত থাকা এবং তাঁর শ্রীচরণে আমাদের যাবতীয় কাজকর্ম নিবেদন করার অভ্যাসের জন্য প্রথম অবস্থাতে একটু প্রযত্ন সহকারে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়। কিন্তু এই ভাবে অল্প প্রয়াসের পরেই তাঁর কৃপা অন্তর থেকে আমাদের এই বিষয়ে সহজেই প্রবুদ্ধ করে।'

কথামৃতে (৪।২০।৪) আছে (প্রার্থনার দর্শন)—'ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইয়া মার সহিত কথা কহিতেছেন—বলিতেছেন, 'মা, আমি বলবো তবে তুমি করবে—এ কথাই নয়।

'কথা কওয়া কি? কেবল ইসারা বই তো নয়! কেউ বলছে, 'আমি খাবো,' —আবার কেউ বলছে, 'যা, আমি শুনব না।'

'আচ্ছা, মা! যদি না বলতাম 'আমি খাবো' তা হলে কি যেমন খিদে তেমন খিদে থাকতো না? তোমাকে বললেই তুমি শুনবে, আর ভিতরটা শুধু ব্যাকুল হলে তুমি শুনবে না—তা কখন হতে পারে?

'তুমি যা আছ তাই আছ—তবে বলি কেন—প্রার্থনা করি কেন?

'ও! যেমন করাও তেমনি করি।

'যা! সব গোল হয়ে গেল!—কেন বিচার করাও।···'

শ্রীরামকৃষ্ণের সবটুকুই ছিল শরণাগতি। প্রার্থনাও যে শরণাগতি তাঁর

এই তাত্ত্বিক অনুভূতির মধ্যে তা নিহিত রয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীবালাজী রাওকে চিঠিতে (নং ৬২, ৬ষ্ঠ)শরণাগতিতে প্রার্থনা কেমন হবে, তা শেখাচ্ছেন। 'ভ্রাতঃ! দিবারাত্র তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে ভুলিও না। দিবারাত্র বলিতে ভুলিও না, 'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।'

'কেন' প্রশ্নে আমাদের নাই অধিকার।

কাজ কর, করে মর—এই হয় সার।

হে প্রভো! তুমি আমাদিগকে বল দাও। তুমি আমাদিগকে শিখাইয়াছ, সৈনিককে কেবল আজ্ঞা পালন করিতে হইবে, তাহার কথা কহিবার অধিকার নাই। এস প্রভো! এসো হে পার্থসারথি! অর্জুনকে তুমি এক-সময় শিখাইয়াছিলে যে, তোমার শরণ লওয়াই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য, তেমনি আমাকেও শিখাও—যেন প্রাচীনকালের মহাপুরুষগণের সহিত আমিও দৃঢ়তা ও শরণাগতির সহিত বলিতে পারি 'ওঁ শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু!'

প্রার্থনার তত্ত্ব সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন (বাণী ও রচনা ৮ম) —'প্রতি শ্বাসে প্রশ্বাসে তুমি ভগবানেরই উপাসনা করছ। আমি যে কথা বলছি, এও এক উপাসনা। আর তোমরা যে শুনছ, সেও এক রকম পূজা। তোমাদের কি এমন কোন মানসিক বা শারীরিক ক্রিয়া আছে, যার দ্বারা তোমরা সেই অনন্ত শক্তিমান ঈশ্বরের ভজনা করছ না? সব ক্রিয়াই তাঁর নিরন্তর উপাসনা। যদি ভেবে থাকো, কতকগুলি শব্দই হচ্ছে পূজা, তাহলে সে পূজা নিতান্তই বাহ্য। এমন পূজা-প্রার্থনা মোটেই ভাল নয়, তাতে কখন কোন প্রকৃত ফল পাওয়া যায় না।'

'প্রার্থনা মানে কি কোন যাদু মন্ত্র, কোন রকম পরিশ্রম না করে শুধু তা উচ্চারণ করলেই তুমি আশ্চর্য ফল পেয়ে যাবে? কখনই না। সকলকেই পরিশ্রম করতে হবে। অনন্ত শক্তির গভীরে সকলকেই ডুব দিতে হবে। ধনী দরিদ্র সবারই ভিতর সেই একই অনন্ত শক্তি। একজন কঠোর শ্রম করবে, আর একজন কয়েকটি কথা বারবার বলে ফল লাভ করবে—এ মোটেই সত্য নয়। এ বিশ্বজগতও একটি নিরন্তর প্রার্থনা। যদি এই

অর্থে প্রার্থনাকে বুঝতে চেষ্টা করো, তবেই তোমাদের সঙ্গে আমি একমত। কথার প্রয়োজন নেই—নীরব পূজা বরং ভাল।'

স্বামীজীর প্রার্থনার ব্যাখ্যা থেকে হৃদয়ঙ্গম হয় যে প্রার্থনা একটি স্বাভাবিক প্রেরণাশক্তি বা ঈশ্বরের উপাসনা যা আন্তরিকতা ও ব্যাকুলতা দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করে।

প্রার্থনার তত্ত্ব সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন (মন ও মানুষ)—'ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছাই আসল, তাঁর ইচ্ছা না হলে মানুষের সাধ্য কি ইচ্ছা করে। এ হল মানুষের উচ্চ অবস্থার কথা। তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়। প্রার্থনা করতে হয় এই বলে—'মা, আমায় অবসর দাও, সুযোগ সুবিধা দাও ভাল কাজ করার জন্যে।' এই প্রার্থনা করা মানে আপনার পুরুষকার রূপ শক্তির কাছে 'সাজেসশান' (ইঙ্গিত বা প্রেরণা) পাঠানো। প্রার্থনা মানেই নিজের ইচ্ছার দ্বারে 'নক' (আঘাত) করা।···আঘাত থেকে ইচ্ছার স্পন্দন জাগে ও সেই স্পন্দন অন্তরে প্রেরণা সৃষ্টি করে। প্রেরণা থেকে হয় শক্তির স্ফুরণ ও শক্তির স্ফুরণে কর্মের স্পৃহা জাগে।'

প্রার্থনা কীভাবে শরণাগতিতে পরিণত হয়, লাটু মহারাজের উপদেশে তা পরিষ্কার পাওয়া যায়। (লাটু মহারাজের স্মৃতিকথা, পৃঃ ২৮০)

লাটু মহারাজ (জনৈক ভক্তকে)—'আরে! নাম জেনেই তো তোমরা আপিসে সাহেবের কাছে চিরকুট পাঠাও। চিরকুট পাঠালে তবে তো সাহেবের সাথে তোমাদের দেখা হয়।···ভগবানের কাছে তেমনি কোরে দরখাস্ত পাঠাও। বাকী এ দরখাস্ত (কাগজে) লিখে পাঠাতে হয় না। নিজের মনের পাতায় লিখে ভগবানকে জানাতে হয়। মনের পাতায় আগে নামের মুসাবিদা করতে হয়। নামের মুসাবিদায় ভুল হলে সে চিঠি পৌঁছাবে না, জানো ত? তেমনি কোরে তুমি লিখতে থাকো—'হে ভগবান! আপুনার নাম আমি যেন না ভুলি। হামি আপুনার শরণ নিলুম। হামায় আপুনার কাজে লাগিয়ে দিন, কাজে লাগিয়ে হামার সব বখেরা মিটিয়ে দিন। সব সংশয় নাশ করুন। আপুনি হামার স্বামী, হামার গুরু, হামার বাপ মা সব কুছু। হামি আপুনার সন্তান। যাতে

আমার কল্যাণ হয়, হামায় সেই পথে আপুনি নিয়ে চলুন। হামায় দিয়ে আপুনার যা কাজ সব করিয়ে নিন। বাকী আপুনার মায়া দিয়ে হামায় ভুলাবেন না। প্রভু! হামি ত আপুনাকে দেখি নি, শুধু আপুনার নাম শুনেছি। হামায় দয়া করে আপুনার করে নিন।' এমনি ভাবে হররোজ বলতে হবে। বলতে বলতে তবে একদিন তাঁর নেক নজরে পড়বে। তাঁর নজরে পড়লে আর কোনো ভাবনা নেই। তখন তিনিই তোমায় চালাবেন, কোনো কাজ করতে হবে না। কি করতে হবে সব বলে দেবেন।'

শুম্ভ নিশুম্ভ বধের পরে দেবীর শক্তি ও মাহাত্ম্য দর্শনে আর্ত ও শরণাগত দেবগণ যে 'নারায়ণী স্তুতি' করেছিলেন সকল শরণাগতেরও সেই প্রার্থনা—

শরণাগতদীনার্তপরিত্রাণপরায়ণে।
সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

১। (ঘ) সমর্পণ—বিবিধ

সমর্পণ বা নির্ভরতার সাধন বিষয়ে আরও কয়েকটি দিক আলোচনা করা যেতে পারে যা থেকে সাধন-রহস্যের ইঙ্গিত পাওয়া সম্ভব।

এক ভদ্রলোক দুঃখ করে বললেন, 'আমি এখানে বাড়ী করে কী ভুলই করেছি। তখন সস্তা দামে জমি পেয়ে গেলুম, আমার এক আত্মীয় আছেন কাছেই, তিনিও জোর করলেন—তাই এখানে বাড়ী করার সিদ্ধান্ত করলুম। কিন্তু এখন এখানকার যে পরিবেশ হয়েছে, চুরি, রাহাজানি এখানে যেভাবে বেড়েছে, ছেলেরা যেভাবে মস্তানি করছে—আর এখানে ছেলেপুলেদের নিয়ে বাস করা যায় না। আমার এক বন্ধু অমুক জায়গায় আছে, আমাকে অনেকবার বলেছিল ওখানে বাড়ী করতে, তা না করে দেখছি এখন ভুলই করেছি। এখানে এখন এমন অবস্থা হয়েছে যে আমাকে বাড়ীঘর বিক্রী করে চলে যেতে হবে। কী ভুলই করেছি আমি।'

এরূপ ভুল অনেকেই অনেক কাজে করে থাকেন। কাজ করার প্রথমে হয়তো ভেবে চিন্তে বিচার করেন যাতে নির্ভুল হয়, যাতে ঠিক ঠিক ফল

আসে সেভাবে কর্মের অনুষ্ঠান করেন। পরে দেখা গেল যে কর্মের ফল হয়েছে বিপরীত, অথবা পারিপার্শ্বিক অবস্থা হয়েছে অত্যন্ত প্রতিকূল—ফলে হতাশা, নৈরাশ্যে মন ভরে ওঠে। এই ভুল করার নানারকম কাহিনী প্রায় প্রতিটি মানুষের কাছে কোন না কোন ভাবে শোনা যাবে। এই ভুলের জন্য দুঃখ আপশোষের পরিসীমা থাকে না।

সত্যিই কি সকলে ভুল করে? ইচ্ছে করে কি সকলে ভুল করে? বিচার করলে দেখা যাবে যে—না, কেউ ভুল করে না। ইচ্ছে করে তো ভুল করেই না।

যখন যে কাজ আমরা আরম্ভ করি, তার পূর্বে অনেক ভেবে চিন্তে নানা-দিক বিবেচনা করে, কী ফলাফল হতে পারে ভেবে ভাল মন্দ, উভয় দিক চিন্তা করে তবে কাজে অগ্রসর হই। ভবিষ্যত অন্ধকার—ভবিষ্যত আমরা জানতে পারি না, দেখতে পারি না বলেই কার্যকারণ সম্বন্ধ মোটামুটি নির্ণয় করে, পরে কর্ম দ্বারা কী কী ফল লাভ হতে পারে ভেবেই কর্ম করি। কাজেই কাজের পরিকল্পনার মধ্যে ভুল থাকার কথা নয়—অজ্ঞাতে কিছু ত্রুটি থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু ফল যখন কোন কারণে অন্য রকম হয়, তখন আমরা বলি ভুল হয়েছে। ভুলটা প্রথমে ছিল না, ফল দেখেই ভুলের কথা বলা হয়ে থাকে।

অন্য দিক থেকেও যদি বিচার করা যায় তবে এই 'ভুল বলা'টা যুক্তিতে টেঁকে না। কাজের প্রারম্ভ ঠিক ছিল, কার্য-কারণ সম্বন্ধও বিচার করা হয়েছিল—কাজেই ফল যখন অন্যরূপ হল তখন বুঝতে হবে যে মাঝখানে পরিবেশের প্রভাব বা দৈবের প্রভাবে এমন কিছু ঘটে গেছে যার ফলে ফলাফল অন্যরূপ হতে বাধ্য হয়েছে। নানা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া যা আমাদের অজ্ঞাত অথচ ভবিতব্য ছিল, তার টানাপোড়েনে রেজালটেন্ট (মিলিত) শক্তি অন্য ফল প্রদান করেছে যার মধ্যে আমাদের হাত ছিল না। এটিও কার্যকারণ নিয়মেই হয়েছে। কাজেই বিচারবান ব্যক্তির ফলের জন্যে দুঃখ আপশোষ না থাকারই কথা।

যারা শরণাগত তাদের তো ভুল ফলের জন্যে মোটেই দুঃখ বেদনা থাকবে

না, থাকতে পারে না। ঈশ্বরের ইচ্ছায় সব কিছু হচ্ছে, ভাল মন্দ সবই তো তাঁরই দান। অতএব তিনি যখন যে কোন ফল দেবেন, যখন যেমন রাখবেন, তাতেই খুশী থাকতে হবে। সেখানে দুঃখ নেই, শোক নেই, আপশোষ নেই। আছে শুধু আনন্দ, ঈশ্বরের কৃপায় সদা সুখী সন্তুষ্ট ভাব। অতএব শরণাগতিতে সবই হবে গ্রহণ। ভগবান আমার জন্য যা পাঠাচ্ছেন, যে ব্যবস্থা করেছেন—সবই মেনে নিতে হবে। এখানে ভাল মন্দের বিচার তো থাকে না। তিনি যদি মন্দই পাঠান তবে তিনি উপযুক্ত মনে করলে সেই মন্দেরও পরিবর্তন করে দেবেন।

ঠাকুর হরিদাসের ব্রতভঙ্গের জন্যে বারবনিতা পাঠানো হয়েছিল। হরিদাস বললেন, তুমি অপেক্ষা কর, আমি জপ শেষ করে তোমার কথা শুনব। ইতিমধ্যে বারবনিতার মনের পরিবর্তন হতে লাগল। ভগবানে শরণাগত হলে তিনি সব ব্যবস্থা করে দেবেন, মন্দকেও ভাল করে দেবেন যাতে গ্রহণে অসুবিধে না হয়। বারবনিতাও ঠাকুর হরিদাসের ভক্ত হয়ে গেল।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সন্ন্যাস গ্রহণের পর পুরীতে অবস্থান করতেন। সেখানে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর জটার জন্যে তিনি জটিয়া-বাবা নামে প্রখ্যাত হন। পুরীতে ক্রমে তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়ে যায়। এজন্যে শোনা যায় অন্য সম্প্রদায় ও পাণ্ডাদের মধ্যে একদল ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন। জগন্নাথের প্রসাদের মধ্যে বিষ মিশিয়ে পাণ্ডারা গোস্বামীজীর কাছে পাঠান। গোস্বামীজী তাঁর দিব্যশক্তিবলে সবই জানতে পেরেছিলেন এবং ভক্তদের বলেছিলেন, 'জগবন্ধুর নিকট থেকে আহ্বান এসেছে।' সেই প্রসাদরূপী গরল তিনি প্রভুর দান হিসাবে শান্তভাবে গ্রহণ করেন। এই বিষক্রিয়ায় তাঁর দেহপাত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব কথামৃতে বলেছেন—'যাদের ঈশ্বর সৎ আর সব অসৎ অনিত্য বলে বোধ হয়েছে, তাদের আর এক রকম ভাব। তারা জানে যে, ঈশ্বরই একমাত্র কর্তা আর সব অকর্তা।···তারা দেখে ঈশ্বরই সব করছেন।'

তারপর তিনি একটি গল্প বললেন, 'এক জায়গায় একটি মঠ ছিল। মঠের

সাধুরা রোজ মাধুকরী (ভিক্ষা) করতে যায়। একদিন একটি সাধু ভিক্ষা করতে করতে দেখে যে একটি জমিদার একটি লোককে ভারী মারছে। সাধুটি বড় দয়ালু। সে মাঝে পড়ে জমিদারকে মারতে বারণ করলে। জমিদার তখন ভারী রেগে রয়েছে, সে সমস্ত কোপটা সাধুর ওপর ঝাড়লে। এমন প্রহার করলে যে সাধুটি অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইল। কেউ গিয়ে মঠে খবর দিলে, তোমাদের একজন সাধুকে জমিদার ভারী মেরেছে। মঠের সাধুরা দৌড়ে এসে দেখে সাধুটি অচৈতন্য হয়ে পড়ে রয়েছে! তখন তারা পাঁচজনে ধরাধরি করে তাকে মঠের ভিতর নিয়ে গিয়ে একটি ঘরে শোয়ালে। সাধু অজ্ঞান, চারিদিকে মঠের লোক ঘিরে বিমর্ষ হয়ে বসে আছে। কেউ কেউ বাতাস কচ্চে। একজন বললে, মুখে একটু দুধ দিয়ে দেখা যাক। মুখে দুধ দিতে দিতে সাধুর চৈতন্য হলো। চোখ মেলে দেখতে লাগলো। একজন বললে, ওহে দেখি, জ্ঞান হয়েছে কিনা? লোক চিনতে পারছে কিনা? তখন সে সাধুকে খুব চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলে, মহারাজ তোমাকে কে দুধ খাওয়াচ্ছে? সাধু আস্তে আস্তে বলছে, ভাই! যিনি আমাকে মেরেছিলেন, তিনিই দুধ খাওয়াচ্ছেন।'

অদ্বৈতবাদের ভাব থেকে গল্পটির তাৎপর্য থাকলেও শরণাগতির দিক থেকে 'তিনিই সবকিছু করছেন, করাচ্ছেন—সমানভাবে তা অনুভব করতে হবে' —এই ভাবটিও বিশেষভাবে নিহিত। তিনিই 'সাপ হয়ে কাটছেন, ওঝা হয়ে ঝাড়ছেন।'

অনির্বাণ শরণাগতির বিষয়টি আর এক দিক থেকে বলেছেন, 'সমর্পণের সাধনাতেও ওই কথা, 'যৎ করোষি যদশ্নাসি···তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।' 'যৎ করোমি জগন্মাতঃ তদেব তব পূজনম্।' কাকে সমর্পণ করছি, সেটি স্মরণে থাকা চাই। এ তো কবুলিয়ৎ লিখে দেওয়া নয় যে, একদিন সাক্ষী-সাবুদ ডেকে এনে দলিল সম্পাদন করে রেজেস্ট্রী করে দিলেই হল! প্রতি পলে পলে স্মরণ—প্রতি শ্বাসে শ্বাসে জপঃ 'নাহং নাহং ত্বমেব'। সে-'তুমি' কেমন, তা-ও আস্বাদন করবার, অনুভব করবার অবিরত প্রয়াস চাই।'

'ঈশ্বরের চিন্তায় ও ধ্যানে মানুষের মন থেকে বাজে (বিজাতীয়) ও মিথ্যা বিষয়চিন্তা দূর হয় ও মন নির্মল হয়। সর্বদা ঈশ্বরচিন্তা এবং ঈশ্বরার্পিত মন ও বুদ্ধি এক কথা। ক্রমাগত ঈশ্বরের চিন্তায় ও ধ্যানে মনে শুদ্ধ সংস্কাররূপ জ্ঞান ও ভক্তির উদয় হয়। ঐ জ্ঞান ও ভক্তি মানুষকে সংসার-সাগর থেকে উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করে।···'সদা তদ্‌ভাবভাবিত'—সর্বদা বা সর্বকালে ঈশ্বরচিন্তায় থাকায় অভ্যস্ত হলে তখনই শরণাগতি, বলতে 'ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ' বা ঈশ্বরে নিবেদিত মন ও বুদ্ধি হয়। তখনই মানুষ হয় 'অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতনান্যগামিনা',—কোন দিকেও কোন বিষয়ে মন না গিয়ে তখন কেবল ঈশ্বরেই আসক্ত (যুক্ত) হয়। ঐ অভ্যাসযোগই মানুষকে সর্ববন্ধনরূপ অজ্ঞান থেকে মুক্ত করে।'*

প্রতি ক্ষণে প্রতি মুহূর্তে তাঁকে স্মরণ, তাঁর মনন—শরণাগতির একটি অপর সাধন। কারণ আমার প্রতিটি পদক্ষেপ তো তাঁরই ইচ্ছায় পরিচালিত হচ্ছে। তিনি যেমন আমার দেহ মন ব্যাপে আছেন আমাকে চালাচ্ছেন, তেমনি সর্ব ব্যাপে আছেন। আমি তাঁতেই আছি, তাঁতেই চলছি, তাঁতেই সমুদয় কাজ নির্বাহ করছি। এই স্মরণ মননে আমাকে ভুলে গিয়ে তাঁতেই মগ্ন হবার চেষ্টা করতে হবে। এইভাবেও অহং নাশ হতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেন, 'যাকে চিন্তা করবে তার সত্তা পাওয়া যায়। অহর্নিশি ঈশ্বর চিন্তা করলে ঈশ্বরের সত্তা লাভ হয়।····রাম জিজ্ঞাসা করলেন, হনুমান, তুমি সীতার সংবাদ এনেছো? কিরূপ তাঁকে দেখে এলে আমাকে বলো। হনুমান বললে, রাম, দেখলাম সীতার শুধু শরীর পড়ে আছে। তার ভিতর মন-প্রাণ নেই। সীতার মন-প্রাণ যে তিনি তোমার পাদপদ্মে সমর্পণ করেছেন! তাই শরীর পড়ে আছে।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'আপনাকে অকর্তা জেনে কর্তার ন্যায় কাজ করবে।' অতএব শরণাগতের কর্মত্যাগ নয়, কর্মের মধ্যে মূল রহস্য জেনে সবই তাঁর কর্ম হিসাবে কর্ম করতে বাধা নেই। নিত্য কর্ম ও নৈমিত্তিক কর্ম সবই তাকে করতে হবে, আবার সামনে যা আসবে এ রকম কর্তব্য

* স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ (বাণী ও বিচার, বিশ্ববাণী ১৩৯১)

কর্মও করতে হবে। কর্ম করা হবে, আর ফল যা আসে মনে প্রাণে তাকে গ্রহণ করা হবে—তাঁরই দান হিসাবে। কাজেই শরণাগতের পুরুষকারও থাকবে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'পুরুষকার ব্যতীত কৃপা সম্যক উপলব্ধি হয় না। চেষ্টা করছে দেখে কৃপা হয়, তাই চেষ্টা করতে হয়। তাই কৃপা বুঝবার জন্যও পুরুষকার প্রয়োজন। পুরুষকারও তাঁর দান। পুরুষকার ও কৃপা পৃথক বস্তু নহে। একই জিনিস অবস্থাভেদে দুরকম দেখায়। পুরুষকারের স্থান ধর্ম-জীবনে অতি উচ্চে। এ চাই-ই, এছাড়া ধর্মজীবন গঠিত হতে পারে না।'

তিনি পুরুষকার সম্বন্ধে আরও বলেছেন, 'ঋষিরা সর্বদা হয় নির্জনে, নয় সাধুসঙ্গে থাকতেন—তাই তাঁরা অনায়াসে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করে ঈশ্বরেতে মনোযোগ করেছিলেন—নিন্দা, ভয় কিছু নাই।

'ত্যাগ করতে হলে ইশ্বরের কাছে পুরুষকারের জন্য প্রার্থনা করতে হয়। যা মিথ্যা বলে বোধহয় তৎক্ষণাৎ ত্যাগ।

'ঋষিদেব এই পুরুষকার ছিল। এই পুরুষকারের দ্বারা ঋষিরা ইন্দ্রিয় জয় করেছিলেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানেরা একবার পুরুষকার ও স্বাধীন ইচ্ছা প্রসঙ্গে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ, সাধকভাব)

'তবে মহাশয়, সাধনভজন করাতে তো মানুষের হাত নাই। সকলেই তো বলিতে পারে—আমি যাহা কিছু করিতেছি, সব তাঁহার ইচ্ছাতেই করিতেছি।'

'ঠাকুর—মুখে শুধু বললে কি হবে রে? কাঁটা নেই খাঁচা নেই, মুখে বললে কি হবে। কাঁটায় হাত পড়লে কাঁটা ফুটে 'উঃ' করে উঠতে হবে। সাধন-ভজন করাটা যদি মানুষের হাতে থাকত, তবে তো সকলেই তা করতে পারত—তা পারে না কেন? তবে কি জানিস, যতটা শক্তি তিনি তোকে দিয়েছেন, ততটা ব্যবহার না করলে তিনি আর অধিক দেন না। ঐ জন্যই পুরুষকার বা উদ্যমের দরকার। দেখ্ না, সকলকেই কিছু না কিছু উদ্যম

করে তবে ঈশ্বরকৃপার অধিকারী হতে হয়। ঐরূপ করলে তাঁর কৃপায় দশ জন্মের ভোগটা এক জন্মেই কেটে যায়। কিন্তু (তাঁর উপর নির্ভর করে) কিছু কিছু উদ্যম করতেই হয়। ঐ বিষয়ে একটা গল্প শোন্—

'গোলোক-বিহারী বিষ্ণু একবার নারদকে কোন কারণে অভিশাপ দেন যে, তাকে নরকভোগ করতে হবে। নারদ ভেবে আকুল। নানারূপে স্তবস্তুতি করে তাঁকে প্রসন্ন করে বললে—আচ্ছা ঠাকুর, নরক কোথায়, কিরূপ, কতরকমই বা আছে, আমার জানতে ইচ্ছা হচ্ছে, কৃপা করে আমায় বলুন। বিষ্ণু তখন ভুঁয়ে খড়ি দিয়ে স্বর্গ, নরক, পৃথিবী যেখানে যেরূপ আছে এঁকে দেখিয়ে বললেন, 'এইখানে স্বর্গ, আর এইখানে নরক।' নারদ বললে, 'বটে? তবে আমার এই নরক ভোগ হল'—বলেই ঐ আঁকা নরকের উপর গড়াগড়ি দিয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করলে! বিষ্ণু হাসতে হাসতে বললে, 'সে কি? তোমার নরকভোগ হল কই?' নারদ বললে, 'কেন ঠাকুর, তোমারই সৃজন তো স্বর্গ নরক! তুমি এঁকে দেখিয়ে যখন বললে—এই নরক, তখন ঐ স্থানটা সত্যসত্য নরক হল, আর আমি গড়াগড়ি দেওয়াতে আমার নরকভোগ হয়ে গেল।' নারদ কথাগুলি প্রাণের বিশ্বাসের সহিত বললে কিনা! বিষ্ণু তাই 'তথাস্তু' বললেন। নারদকে কিন্তু তাঁর উপর ঠিক ঠিক বিশ্বাস করে ঐ আঁকা নরকে গড়াগড়ি দিতে হল, (ঐ উদ্যমটুকু করে) তবে তার ভোগ কাটল।' এইরূপে কৃপার রাজ্যেও যে উদ্যম ও পুরুষকারের স্থান আছে, তাহা ঠাকুর ঐ গল্পটি সহায়ে কখনও কখনও আমাদিগকে বুঝাইয়া বলিতেন।'

অনির্বাণ বলেছেন (প্রবচন ২য়)—'এক তরফা ইচ্ছায় কাজ হয় না। প্রত্যেক মহাপুরুষই তো ইচ্ছা করেছেন, সবার চৈতন্য হোক। হচ্ছে কোথায়? 'প্রসাদ' যেমন দরকার 'পুরুষকার'ও তেমনি দরকার। কৃপার বাতাস তো বইছেই কিন্তু পাল তুলে দিতে হবে যে আমাকেই।'

'কেহ যেন এরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী না হন যে, মাতৃচরণে যাঁহারা আত্মসমর্পণ করিতে সমর্থ হয়, তাহাদের আর পুরুষকার বলিয়া কিছুই থাকে না। বাস্তবিক কিন্তু আত্মসমর্পণ যোগসিদ্ধ ব্যক্তিগণই যথার্থ

পুরুষকার জিনিসটার স্বরূপ বুঝিতে পারে। তাহারা কখনও তামসিক জড়তাগ্রস্ত হইয়া পড়ে না। ··সাধনা প্রথম অবস্থা হইতেই তীব্র পুরুষকারের প্রয়োজন, এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উহাকে ধরিয়া রাখিতে হয়। যে মুহূর্তে সর্বভাবের বিলয় হয়, সেই মুহূর্তেই পুরুষকারের পরিসমাপ্তি ও কেবল পুরুষ স্বরূপে স্থিতি হয়।' (ব্রহ্মর্ষি সত্যদেব কৃত সাধন-সমর ৮।৮) বিড়াল-ছানা মা ছাড়া কিছু জানে না—মা যখন যেখানে রাখে। কিন্তু তাকেও মিউ মিউ করে কাঁদতে হয়, প্রার্থনা করতে হয়। এই মিউ মিউ করার মতো পুরুষকার প্রয়োজন, পাল তুলে দেবার মতো পুরুষকার প্রয়োজন। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'সমস্ত সাধনার লক্ষ্য হল সত্ত্বগুণ লাভ।' উৎসাহ, উদ্যম সত্ত্বগুণীর লক্ষণ। তমোগুণী নিশ্চেষ্ট হয়, অলস কুঁড়ে হয়। রজোগুণীর কর্মপ্রবণতা সত্ত্বগুণীর থাকে না বটে, কিন্তু তমোগুণীর নিরুৎসাহ নিস্তেজ ভাবও থাকে না। শরণাগতি সাধকের উৎসাহ আগ্রহ থাকবে, যথাকর্তব্য, সম্মুখে প্রাপ্ত কর্ম গ্রহণ করে সে এগিয়ে যাবে। তাঁর কৃপালাভের জন্যে এবং ঈশ্বরেচ্ছা অনুভব করে সে কর্ম করে যেতে পারে। কর্মের ফল যা আসে সে তা মেনে নেবে। মনে কোন অশান্তি থাকবে না, কর্মের ফলে কোন দায়িত্বও তার থাকবে না।

কর্মানুষ্ঠানের রহস্য সম্বন্ধে মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'সদুদ্দেশ্যে কর্ম অবশ্যই করতে হবে এবং অনুষ্ঠেয় কর্ম সুসম্পাদনের জন্য যথোচিত পৌরুষ যথাশক্তি সততই করতে হবে। ঐ পৌরুষ সজ্ঞানে অতি উৎসাহে আনন্দে ধৈর্যের সঙ্গে হবে। এরূপ কর্মের কর্তা সিদ্ধিতে হর্ষিত ও অসিদ্ধিতে ব্যথিত হয় না অথবা কর্মের বিপর্যয়ে বিষাদ বা গ্লানিগ্রস্ত হয় না—এরূপ কর্তাই সাত্ত্বিক কর্তা।'*

'শ্রীভগবানই অন্তর্যামিরূপে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া জীবকে যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকায় ন্যায় মায়াদ্বারা চালাইতেছেন, সুতরাং সর্বতোভাবে তাঁহার শরণ লইলেই তাঁহার প্রসাদে মুক্তিলাভ হয়। ইহাই কৃপাবাদ। মনে রাখা

প্রয়োজন, কৃপাবাদ অর্থ নিশ্চেষ্টতা তা নয়, আত্মচেষ্টা ব্যতীত, ভগবৎকৃপা হয় না। 'ন ঋতে শ্রান্তস্য সংখ্যায় দেবাঃ' (ঋক্ ৪।৩৩।২১)—নিজে শ্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত দেবতারাও সাহায্য করেন না। (শ্রীমদ্ভগবতদ্গীতা - জগদীশ চন্দ্র ঘোষ, পৃঃ ৬৩১)

শরণাগতির সাধক কর্মরহস্য জেনে ঈশ্বর নির্ভরতা নিয়েও এরূপ পৌরুষ সহ কর্ম করতে পারে। স্কন্দপুরাণে বলা হয়েছে (কাশীখণ্ড ৩২।৩০-৩২) —'প্রাক্তন অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব জন্মার্জিত স্বকৃত কর্মের ফল ও সংস্কার ভিন্ন দৈব আর কিছুই নহে। অতএব দৈবের শান্তির জন্য বা দৈবের পরাজয়ের জন্য তীব্র পুরুষকার অবলম্বন পূর্বক সর্বকারণ-কারণ ঈশ্বরের শরণাগতিই মনুষ্যের পক্ষে সর্বতোভাবে সমীচীন।'

স্বামী বিবেকানন্দ শিষ্যকে উপদেশ দিয়ে বলছেন, 'যতটা পারিস তাতে মন লাগিয়ে থাক। তাহলেই এই জগৎ ভেল্কি আপনা থেকেই ভেঙে যাবে। তবে লেগে থাকতে হবে।···এইরূপে লেগে থাকার নামই পুরুষকার। ঐরূপে পুরুষকার সহায়ে তাঁতে নির্ভর আসবে—সেটাই হল পরমপুরুষার্থ।'

স্বামী তুরীয়ানন্দ বলেছেন, 'কাঁচা তেল পাকাইতে হইলে আগুনের মধ্য দিয়াই সে অবস্থা লাভ হয়। চিনি সাফ করতে হলে অনেক গাদ কাটাতে হয়, তারপর সাফ হয়। মন শুদ্ধ করতে হলে তেমনি কাজের মধ্য দিয়াই মনকে নিষ্কাম করে শুদ্ধ করতে হয়—শুধু কূর্মের ন্যায় হাত পা গোটালে হয় না।'

স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন (মন ও মানুষ)—'শরণাশতি মানে এই নয় যে, কুঁড়েমি করে বসে থাকব আর ভগবানকে বলব, হে ভগবান, তুমি আমায় কৃপা করো। এটা তো মহা দুর্বলতা ও স্বার্থপরতার চিহ্ন।···আমরা সাধারণতঃ যে কৃপা পাবার আশা করি, সে আশার ভেতর উদ্যম থাকে না, আত্মবিশ্বাস বা শরণাগতির ভাব থাকে না, থাকে কেবল নিশ্চেষ্টতা ও চালাকী করে বাজীমাৎ করার মতলব। এ সবে কি আর হয় বাপু?'

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ (বেলুড় মঠ) বলেন, 'কখনও কখনও অনেককে বলতে

শোনা যায়, 'আমি ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করেছি, আমার আর কিছু করবার নাই।' কিন্তু আত্মসমর্পণ এত সহজ নয়, খুবই কঠিন। যথার্থ আত্মসমর্পণের ভাব আনতে সুদীর্ঘকালের হয়তো জীবনব্যাপী সাধনারই প্রয়োজন হয়। প্রাণপণ চেষ্টা ছাড়া তা হয় না। ভগবান লাভের জন্য নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করে সুদীর্ঘকাল তীব্র সাধনা করার পর যখন দেখা যায় তাতেও তাঁকে পাওয়া গেল না, তখনই ভক্ত ঠিক ঠিক আত্ম-সমর্পণ করতে পারে, আর তখনই ভগবান কৃপা করেন। কিন্তু নিজের চেষ্টা না থাকলে তাঁর কৃপালাভ আশা করা যায় না।'

পঞ্চদশীতে এই পুরুষকার নিয়ে একটি প্রশ্ন তোলা হয়েছে (সরল পঞ্চদশী, চিত্রদীপ ১৭৭—অনুঃ অমূল্যপদ চট্টোপাধ্যায়)—'প্রশ্ন উঠতে পারে—ঈশ্বর যদি সব করান, তবে তো জীবের চেষ্টা বা পুরুষকার ব্যর্থ।

'এতদুত্তরে বলা যাইতেছে যে—এরূপ আশংকা হইতে পারে না। কারণ ঈশ্বরই পুরুষকার রূপে পরিণত হন।'

অতএব বোঝা যাচ্ছে যে তাঁর ইচ্ছাই পুরুষকাররূপে পরিণত হয়ে জীবকে কর্মের ভেতর দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে পরিণামে তাঁর ইচ্ছাকেই অনুভব করার জন্য। পুরুষকারের ভেতর দিয়ে ইচ্ছা অনুভবের অধিকার জন্মাতে পারে।

একজন সাধু মহারাজ একবার বললেন, 'গুরু মহারাজ আমায় সন্ন্যাস প্রদান করে বললেন, তুমি এবার শরণাগতির সাধন নিয়ে থাক। তারপর থেকে আমি সারা ভারতবর্ষ ঘুরেছি, তীর্থে তীর্থে গেছি—কখনও পায়ে হেঁটে, কখনও ট্রেনে বাসে, যখন যেমন ভিক্ষা পেয়েছি। আমি কারো কাছে কিছু চাই নি—অর্থ চাই নি, খাবার চাই নি। কেউ নিজে এসে দিলেই তবে তা গ্রহণ করেছি। নিজেকে পরীক্ষা করেছি বারে বারে—তাঁর শরণাগত হয়ে আছি, তিনি ব্যবস্থা করবেন, আমায় কিছু চেষ্টা করতে হবে না। কোন কোন দিন অসুবিধায় পড়েছি, কষ্ট হয়েছে—কিন্তু দেখেছি শরণাগত হয়েছিলুম বলে তিনিই পরে সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। অনেক সমস্যা মিটে গেছে আশ্চর্যভাবে।'

স্বামী বিবেকানন্দ যখন পরিব্রাজক অবস্থায় ছিলেন তখন কোন টাকা পয়সা সঙ্গে রাখতেন না—কেউ টিকিট কিনে দিলে তবে ট্রেনে উঠেছেন, নতুবা পায়ে হেঁটেই চলেছেন। কারো কাছে খাবার চান নি, কিন্তু অযাচিত ভাবেই খাবার পেয়েছেন। দৈবপ্রেরিত হয়ে ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত স্বামীজীর কাছে কেউ কেউ খাবার নিয়ে হাজির হয়েছে—এরূপ ঘটনাও ঘটেছে। কন্যা-কুমারীতে সমুদ্রের মধ্যে শেষ শিলাখণ্ডে যাবার নৌকা-ভাড়ার পয়সা দিতে পারেন নি বলে পরে নিজেই সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কেটে রকে গিয়েছেন। প্রভু তাঁকে হাত ধরে পরিচালনা করছেন কিনা স্বামীজী তা নানাভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন।

স্বামী শিবানন্দ (মহাপুরুষ) মহারাজ তাঁর পরিব্রাজক জীবনের কথায় বলেছেন (শিবানন্দ-বাণী হয়)—' ··কত নিঃসম্বল অবস্থায় বেড়িয়েছি। কিন্তু কখনও কোন বিপদে পড়তে হয় নি। ঠাকুরই সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে থেকে সব বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করেছেন, কমনও অভুক্ত রাখেন নি।···তখন প্রাণে খুব ব্যাকুলতা ও অশান্তি ভগবানকে পাবার জন্য। চলতে চলতে ভগবানের স্মরণ মনন হত, আর ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করতুম।···এইভাবে অনেকদিন কাটিয়েছি। এই রকম নিঃসম্বল অবস্থায় কিছুদিন কাটালে ভগবানের উপর একটা পূর্ণ নির্ভরতা আসে। সম্পদে বিপদে তিনিই যে একমাত্র রক্ষাকর্তা—এ ভাবটা বেশ পাকা হয়ে যায়।'

শরণাগতির এও একটি সাধন-পথ। নিঃসম্বল অবস্থায় কাটাতে পারলে ঈশ্বরের স্মরণ-মনন যেমন বেশী হয় তেমনি নির্ভরতার ভাব বৃদ্ধি হয়। গীতায় ভগবান বলেছেন, 'অনন্য-চিত্ত হয়ে যে আমার ভজনা করে সেই নিত্যযুক্ত ভক্তের আমি যোগ ও ক্ষেম বহন করি।' ঈশ্বর-নির্ভরে তার স্মরণ মনন যেমন বৃদ্ধি হয়, তেমনি তিনি সতত সাধককে রক্ষা করেন, তার প্রয়োজনীয় সব জিনিস দেন বা ব্যবস্থা করেন—এই বিশ্বাস এবং ভক্তি সাধকের বৃদ্ধি হতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে নির্ভরও ক্রমশ বৃদ্ধি হয়।

শরণাগতির আর একটি দিক হলো গুরুতে শরণাগতি। শরণাগতি অর্থে ঈশ্বরের ওপর শরণাগত থাকার কথাই বলা হয়। যাঁকে জানি না, যাঁকে

দেখি নি, যাঁকে সহজে বুঝা যায় না, তাঁর প্রতি শরণাগতি আনা কঠিন ব্যাপার সন্দেহ নাই। তাই ভক্তি-শাস্ত্রে সাধন-রহস্যে বলা হয়ে থাকে—গুরুর ওপর শরণাগতির ভাব আরোপ করে নিজেকে প্রস্তুত করা যায়। একে বলা হয় গুরুসপত্তি।

আচার্য নিম্বার্ক 'মন্ত্ররহস্যষোড়শী'তে বলেছেন, 'সর্বাগ্রে গুরুতেই আত্ম-সমর্পণ করিতে হয় এবং শ্রীগুরুর মধ্যেই ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিতে হয়। শিষ্য হবিঃস্থানীয়, যে-হত্যার সাহায্যে আহুতি দেওয়া হয়, গুরু সেই অর্পণ স্থানীয় এবং ব্রহ্ম অগ্নি-স্থানীয়। সাধক ব্রহ্মে আত্ম-নিক্ষেপ করিবেন প্রথমে গুরুতে আত্মনিক্ষেপ করিয়া। সুতরাং সাধকের সাধনযজ্ঞ আদ্যন্ত প্রপত্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই দ্বিবিধা প্রপত্তির ফলে তিনি ভব-বন্ধন হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করেন।'

যাঁরা গুরু-সেবার সুযোগ পেয়ে থাকেন, তাঁরা গুরুতে শরণাগত হয়ে, গুরুর আদেশ নির্দেশ যথাযথ পালন করে জীবন পরিচালনায় সচেষ্ট হন। এমন কি গুরুতে, গুরুর প্রতিমূর্তি বা প্রতিচ্ছবিতে ইষ্টের আরোপ করে এই সাধনা চলে। এই ভাবে গুরুর ওপর নির্ভরতা এনে ঈশ্বরের নির্ভরতায় তা পরিণতি লাভ করতে পারে। শরণাগতির মানসিকতা এই ভাবে ঠিক ঠিক গড়ে উঠতে পারে।

২। ইচ্ছালয়

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন—'সংসারে রেখেছেন তা কি করবে? সমস্ত তাঁকে সমর্পণ করো—তাঁকে আত্মসমর্পণ করো। তা হলে আর কোন গোল থাকবে না। তখন দেখবে, তিনিই সব করছেন। সবই রামের ইচ্ছা।'

এই বলে তিনি একটি গল্প বললেন—'কোন এক গ্রামে এক তাঁতি থাকে। বড় ধার্মিক, সকলেই তাঁকে বিশ্বাস করে আর ভালবাসে। লোকটি ভারী ভক্ত। রাত্রিতে খাওয়া-দাওয়ার পরে অনেকক্ষণ চণ্ডীমণ্ডপে বসে ঈশ্বর চিন্তা করে তার নামগুণ কীর্তন করে।

'একদিন অনেক রাত হয়েছে, লোকটির ঘুম হচ্ছে না, বসে আছে, এক এক একবার তামাক খাচ্ছে। এমন সময় সেই পথ দিয়ে একদল ডাকাত ডাকাতি করতে যাচ্ছে। তাদের মুটের অভাব হওয়াতে ঐ তাঁতিকে এসে বললে, আয় আমাদের সঙ্গে। এই বলে হাত ধরে টেনে নিয়ে চললো। তারপর একজন গৃহস্থের বাড়ী গিয়ে ডাকাতি করলে। কতকগুলো জিনিস তাঁতির মাথায় দিলে, এমন সময় পুলিশ এসে পড়লো। ডাকাতেরা পালালো, কেবল তাঁতিটি মাথায় মোটসহ ধরা পড়লো। সে রাত্রি তাকে হাজতে রাখা হলো।

'পরদিন ম্যাজিষ্টার সাহেবের কাছে বিচার। গ্রামের লোক জানতে পেরে সব এসে উপস্থিত। তারা সকলে বললে, হুজুর এ লোক কখনো ডাকাতি করতে পারে না। সাহেব তাঁতিকে জিজ্ঞাসা করলে, কিগো, তোমার কি হয়েছে বল। তাঁতি বললে, হুজুর! রামের ইচ্ছা আমি রাত্রিতে ভাত খেলুম। তারপর রামের ইচ্ছা আমি চণ্ডীমণ্ডপে বসে আছি, রামের ইচ্ছা অনেক রাত হল। আমি রামের ইচ্ছা তাঁর চিন্তা করছিলাম আর তাঁর নাম গুণগান করছিলাম। এমন সময় রামের ইচ্ছা একদল ডাকাত সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। রামের ইচ্ছা তারা আমায় ধরে টেনে লয়ে গেল। রামের ইচ্ছা তারা এক গৃহস্থের বাড়ী ডাকাতি করলে। রামের ইচ্ছা আমার মাথায় মোট দিলে। এমন সময় রামের ইচ্ছা পুলিশ এসে পড়ল। রামের ইচ্ছা আমি ধরা পড়লুম। তখন রামের ইচ্ছা পুলিশের লোকেরা হাজতে দিলে। আজ সকালে রামের ইচ্ছা হুজুরের কাছে এনেছে।

'অমন ধার্মিক লোক দেখে সাহেব তাঁতিটিকে ছেড়ে দেবার হুকুম দিলেন। তাঁতি রাস্তায় বন্ধুদেব বললে, রামের ইচ্ছা আমায় ছেড়ে দিয়েছে।

'সংসার করা, সন্ন্যাস করা সবই রামের ইচ্ছা। তাই তাঁর উপর সব ফেলে দিয়ে সংসারে কাজ করো।'

নিজের ইচ্ছাকে ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে হলে, নিজের ইচ্ছাকে লয় করতে হলে 'সবই তাঁর ইচ্ছা' এই ভাবটি মনে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। প্রতি কাজে প্রতি চিন্তায় 'তাঁর ইচ্ছায় সব হচ্ছে' এই স্মরণ

মনন রাখতে হবে—উপরে বর্ণিত গল্প থেকে এ ভাবটি পাওয়া যায়।

কথামৃতে আছে (৫ম)—

'ঈশান (ভবানীপুরের ঈশান মুখুজ্যে)—আপনি সংসার ত্যাগ করিয়াছেন কেন? শাস্ত্রে সংসার আশ্রমকে শ্রেষ্ঠ বলেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি ভাল কি মন্দ অত জানি না। তিনি যা করান—তাই করি, যা বলাম তাই বলি।

ঈশান—সবাই যদি সংসার ত্যাগ করে তা হলে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কাজ করা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সবাই ত্যাগ করবে কেন? আর তাঁর কি ইচ্ছা যে, সকলেই শেয়াল কুকুরের মত কামিনী কাঞ্চনে মুখ জুবড়ে থাকে? আর কি কিছু ইচ্ছা তাঁর নয়? কোন্‌টা তাঁর ইচ্ছা কোন্‌টা অনিচ্ছা কি সব জেনেছ?

'তাঁর ইচ্ছা সংসার করা তুমি বলছ। যখন স্ত্রী পুত্র ঘরে তখন ভগবানের ইচ্ছা দেখতে পাও না কেন? যখন খেতে পাও না—দারিদ্র্য—তখন ভগবানের ইচ্ছা দেখতে পাওনা কেন?

'তাঁর কি ইচ্ছা মায়াতে জানতে দেয় না। তাঁর মায়াতে অনিত্যকে নিত্য বোধ হয়, আবার নিত্যকে অনিত্য বোধ হয়। সংসার অনিত্য এই আছে এই নাই, কিন্তু তাঁর মায়াতে বোধ হয়, এই ঠিক।...'

ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝতে পারা কঠিন—তবে কিছু কিছু ইঙ্গিত কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাওয়া যায় যেখানে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুভব করা যায়—এ কথা সাধকেরা অনেকে বলে থাকেন।

একজন ভক্ত একদিন তাঁর বৈষ্ণব গুরুদেবের সঙ্গে আলোচনার কথা বললেন। ভক্তটি গুরুদেবকে বলেছিলেন, 'সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা একথা ঠিক, কিন্তু আমরা দেখছি আমরা ইচ্ছামত নানা কাজ করছি, ঈশ্বরেচ্ছা তো সেখানে কিছু বুঝতে পারছি না। কোন্‌টা আমার ইচ্ছা ও কোন্‌টা ঈশ্বরেচ্ছা তা ঠিক ঠিক বুঝবার কোন উপায় আছে কি?'

গুরুদেব বললেন, 'কোন কাজ করতে গিয়ে যদি বাধাবিঘ্ন কম আসে, স্বাভাবিক ভাবে পরিকল্পনা মত কম বাধায় কাজটি সুসম্পন্ন হয়। তবে

বুঝতে হবে সেই কাজের পেছনে ঈশ্বরেচ্ছা রয়েছে। যে কাজ করতে গিয়ে নানা বাধাবিঘ্ন আসে, নানা সমস্যার উদ্ভব হয়, তবে বুঝতে হবে সে কাজ মানুষের ইচ্ছায় হচ্ছে—ঈশ্বরের ইচ্ছা সেখানে নেই।'

ভক্তটি বললেন যে তিনি এভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, তিনি যে কাজ অহং বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়ে নিজের সংকল্প নিয়ে কাজ করেছেন, প্রায়ই তাতে বিফল হয়েছেন। এবং যে কাজের কল্পনা নিয়ে তাঁর উপর নির্ভর করে সর্বদা প্রার্থনার ভাব নিয়ে রয়েছেন, 'হে ঠাকুর, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক'—এরকম ভাব নিয়ে কাজ করে গেছেন—অনেক সময়েই তা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে।

ঈশ্বরেচ্ছাও স্ব-ইচ্ছাকে এইভাবে পৃথক করা যেতে পারে। নিজের ইচ্ছা পরিপূরণ না হলে ঈশ্বরেচ্ছায় তা হয় নি মনে করে দুঃখ বেদনাকে আসতে দেওয়া উচিত হবে না।

বেলুড় মঠের একজন প্রবীণ সন্ন্যাসী একবার বলেছিলেন, 'আমি initiative নিয়ে ঋষিকেশে দুবার কুঠিয়া করতে গিয়েছিলুম, দুবারই repulsion এল। নানা বাধা আসায় আর কুঠিয়া করা হলো না। ভাবলাম, ভগবানের ইচ্ছা নয়, তাই হল না।'

প্রশ্ন : ভগবানের ইচ্ছা অনিচ্ছা কীভাবে বুঝা যায়?

উঃ যে কাজ করতে অনেক বাধা-বিপত্তি আসে বুঝতে হবে ভগবানের ইচ্ছা তাতে নেই। Initiative (উদ্যোগ) নিয়ে কোন কাজ না করাই উচিত। যা সামনে আসবে তাই করা হবে।

কাশীধামের জনৈক প্রবীণ দশনামী বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী উপদেশপ্রার্থী একজন সন্ন্যাসীকে বললেন, 'সংকল্প করে কোন কাজ করবেন না।' সংকল্প না করে কি কোন কাজ হয়? কোন পরিকল্পনা থাকবে না, কোন উদ্যোগ থাকবে না—তাহলে সে কাজ কীভাবে সম্পন্ন হবে?

গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলা হয়েছে—'সর্বসংকল্প ত্যাগী হলেই সে যোগী হতে পারে, সংকল্প ত্যাগ না হলে যোগী হওয়া যায় না।' এখানে যোগী অর্থে জ্ঞানযোগী, কর্মযোগী—উভয় যোগীকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে।

শ্রীভগবানের সমস্ত বাক্য উপদেশ শ্রবণ করে অর্জুন সব শেষে বললেন, 'আমার মোহ দূর হয়েছে, আমি তোমার কথামতই কাজ করব।' এই শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ডঃ রাধাকৃষ্ণণ বর্ণনা করেছেন—'তাঁর মোহ বিনষ্ট হয়েছে, সন্দেহ ঘুচে গেছে। ঈশ্বর-নির্বাচিত যন্ত্র ঈশ্বর-নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনের কাজ সুরু করছেন। তিনি এখন ঈশ্বরের আদেশ মান্য করবেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন যে ঈশ্বর তাঁর উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য আমাদের সৃষ্টি করেছেন, আমাদের নিজেদের উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য নয়। ...যীশু বলেছেন, 'আমি আমার নিজ সংকল্পের খোঁজ করি না, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর সংকল্পই চাই। ঈশ্বর তাঁর নিত্যজীবনে আমাদের যে ভূমিকা দিতে চান, আমাদের তাই গ্রহণ করতে হবে। ঈশ্বরের সংকল্পানুযায়ী নিজের সংকল্পকে গঠন করাই দিব্য জীবনের গুহ্য তত্ত্ব।'

যাঁরা জ্ঞানী, জীবন্মুক্ত—যাঁদের তত্ত্বজ্ঞান, বাসনাক্ষয় ও মনোনাশ হয়েছে, তাঁদের সংকল্পাদি না থাকতে পারে—কিন্তু সাধারণ সাধক বা ভক্তগণ কীভাবে সংকল্পহীন হয়ে কর্ম করবে?

স্বামী বিবেকানন্দ পত্রাবলীতে বলেছেন, 'আমি মতলব করে কোন কাজ করি নি।' তাহলে আজকের এত বড় যে বেলুড় মঠ, রামকৃষ্ণ মিশন তার প্রতিষ্ঠা কী করে সম্ভব হল? স্বামীজী তখন কত কাজ করেছেন—সেগুলো তাহলে কীভাবে সম্পন্ন হলো?

একজন পাশ্চাত্য শিষ্য কোন একটি বিষয়ে স্বামীজীকে সংসারের অভিজ্ঞতা সম্ভূত পরামর্শ দিলে স্বামীজী বিরক্তির সহিত বললেন (বাণী ও রচনা ১০ম)—'পরিকল্পনা আর পরিকল্পনা! এই জন্যই পাশ্চাত্যবাসীরা কখনও কোন ধর্মমত গঠন করিতে পারে না। তোমাদের মধ্যে যদি কেহ কখনও পারিয়া থাকে, তবে তাহা কয়েকজন ক্যাথলিক সন্ন্যাসী মাত্র, যাহাদের পরিকল্পনা বলতে কিছু ছিল না। পরিকল্পনাকারীদের দ্বারা কখনও ধর্মপ্রচার হয় নাই।'

সংকল্প থাকবে না, মতলব থাকবে না, কোন পরিকল্পনা থাকবে না, অথচ

কাজ হবে—এই রহস্যের সন্ধান স্বামীজীদের বাণীর মধ্যেই পাওয়া যায়। স্বামী তুরীয়ানন্দ পত্রাবলীতে বলেছেন, 'কোন চিন্তা নাই, যেমন চলিতেছে, চলিয়া যাও। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সব তাঁতে সমর্পণ কর। নিজে কিছু কল্পনা করিও না। দেখিবে, তিনিই তোমার জন্য সকল ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।'

ভগিনী নিবেদিতাকে স্বামী বিবেকানন্দ একটি পত্রে লিখছেন (৭ জুন ১৮৯৬)—'আমার অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিস্তৃত কর্মপন্থা আসিয়া পড়িবে। আমি কোন পরিকল্পনা করি না। কর্মপ্রণালী আপনি গড়িয়া ওঠে ও কার্যসাধন করে। আমি শুধু বলি, জাগো, জাগো।'

অন্যত্র তিনি আবার বলেছেন, 'আহা, পরমাত্মার স্বরূপ যিনি জানিয়াছেন, তাঁহার কাজ কতই না শান্ত! বাস্তবিকপক্ষে লোকের দৃষ্টি খুলিয়া দেওয়া ছাড়া তাঁহাদের অন্য কিছু করণীয় থাকে না। আর যাহা কিছু তাহা আপনিই হইতে থাকে।'

স্বামী বিবেকানন্দ পত্রাবলীতে বলেছেন (নং ৪৬৭ ও ৪৭১—রচনাবলী) —'...আর আমার আকাংক্ষা বা উচ্চাভিলাষ নাই। মায়ের নাম ধন্য হউক। আমি শ্রীরামকৃষ্ণের দাস। আমি যন্ত্র মাত্র—আর কিছু জানি না, জানবার আকাংক্ষাও নেই।

মায়ের কাজ মা-ই করছেন। সেজন্য এখন বেশী মাথা ঘামাই না।... মায়ের ইচ্ছাস্রোতে গা ভাসিয়ে একলা আজীবন চলে এসেছি। যখনই এর ব্যতিক্রম করেছি, তখনই আঘাত পেয়েছি। মায়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।...

আমি মুক্ত। আমি মায়ের সন্তান। মা-ই সব কর্ম করেন, সবই মায়ের খেলা। আমি কেন মতলব আঁটতে যাব? আর কি মতলবই বা আঁটব? আমার পরিকল্পনার অপেক্ষা না রেখেই মা-র যেমন অভিরুচি, তেমনি ভাবে যা-কিছু আসবার এসেছে ও চলে গেছে। মা-ই তো যন্ত্রী, আমরা তাঁর হাতের যন্ত্র ছাড়া আর কি?'

ঈশ্বর-সান্নিধ্য বোধের সাধনায় ব্রাদার লরেন্স বলেছেন, 'এখন আর আমার

স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাই, ঈশ্বরের ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। সকল বিষয়ে সেই ইচ্ছা পূরণের জন্যই আমি যত্নবান। এই ব্যাপারে আমি তাঁতে এতই সমর্পিত যে, তাঁর আদেশ অবহেলা করে তো নয়ই, এমন কি তাঁর প্রতি নিছক প্রেম নিবেদন ভিন্ন অন্য কোন অভিসন্ধি নিয়ে সামান্য তৃণটি পর্যন্ত আমি মাটি থেকে তুলতে পারি নে।'

'যুগনায়ক বিবেকানন্দ (১ম)' গ্রন্থে স্বামী গম্ভীরানন্দ কাশীপুরকে কেন্দ্র করে 'শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ' প্রতিষ্ঠায় শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকা সম্বন্ধে লিখেছেন —'শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরানী এক সময়ে বলিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর মতলব করিয়া কিছু করিয়াছিলেন, এইরূপ তাঁহার কখনও মনে হয় নাই।' শ্রীমায়ের এই উক্তি সর্বতোভাবে শিরোধার্য; কেন না লোকাতীত পুরুষ কখনও মানবীয় মতিগতি লইয়া অহঙ্কারপূর্বক কার্যে ব্রতী হন না। শ্রীশ্রীজগদম্বার বিরাট আমিত্বের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের আমিত্ব একীভূত হইয়া যাওয়ায় তাঁহার পক্ষে সসীম মানবসুলভ বৌদ্ধিক সিদ্ধান্তমাত্র অবলম্বনে কোন কিছু করা সম্ভব ছিল না। তবে ইহাও স্বীকার্য যে, জগদম্বার অচিন্ত্য বিধানে শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহমন অবলম্বনে নবীন যুগের বাণী ও কার্যধারা মূর্তিপরিগ্রহ করিতেছিল, এবং তাই লোকদৃষ্টিতে বলা চলে যে ঠাকুরের উৎসাহ, উদ্দীপনা, ইঙ্গিত ও কার্যাবলীর ফলস্বরূপে তাঁহার ভক্তসংঘ গড়িয়া উঠিতেছিল।'

কাশ্মীর পরিদর্শনকালে স্বামী বিবেকানন্দ ক্ষীরভবানী দেবীকে দর্শন করিতে যান এবং সাত দিন তথায় অবস্থান করে ক্ষীর দিয়ে দেবীর উদ্দেশে পূজা ও হোম করেছিলেন। একদিন পূজা করতে করতে স্বামীজীর মনে এই চিন্তার উদয় হয়েছিল (স্বামী-শিষ্য সংবাদ)—

'মা ভবানী এখানে সত্যসত্যই কতকাল ধরিয়া প্রকাশিত রহিয়াছেন! পুরাকালে যবনেরা আসিয়া তাঁহার মন্দির ধ্বংস করিয়া যাইল, অথচ এখানকার লোকগুলো কিছুই করিল না। হায়, আমি যদি তখন থাকিতাম, তবে কখনও চুপ করিয়া দেখিতে পারিতাম না'—ঐরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মন যখন দুঃখে ক্ষোভে নিতান্ত পীড়িত, তখন স্পষ্ট শুনিতে

পাইলেন, মা বলিতেছেন—

'আমার ইচ্ছাতেই যবনেরা মন্দির ধ্বংস করিয়াছে, আমার ইচ্ছা আমি জীর্ণ মন্দিরে অবস্থান করিব। ইচ্ছা করিলে আমি কি এখনি এখানে সপ্ততল সোনার মন্দির তুলিতে পারি না? তুই কি করিতে পারিস? তোকে আমি রক্ষা করিব, না তুই আমাকে রক্ষা করিবি?'

স্বামীজী বলিলেন, 'ঐ দৈববাণী শোনা অবধি আমি আর কোন সংকল্প রাখি না। মঠ-ফঠ করবার সংকল্প ত্যাগ করেছি। মায়ের যা ইচ্ছা তাই হবে।'

'স্বামি-শিষ্য সংবাদে' আছে যে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের পয়লা মে বাগবাজারে বলরাম বসুর বাটিতে তিনটার পর রামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তগণ মিলিত হলেন। স্বামী বিবেকানন্দের উদ্দেশ্য একটি সমিতি গঠন করা। ঠাকুরের নামে একটি সংঘ গড়ার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি বললেন এবং সকলের অনুমোদনে 'রামকৃষ্ণ মিশন' নামে একটি সমিতি গঠিত হলো।

সভা শেষ হয়ে গেলে স্বামীজী স্বামী যোগানন্দকে বললেন, 'এভাবে তো কাজ আরম্ভ করা গেল। এখন দেখ্ ঠাকুরের ইচ্ছায় কতদূর হয়ে দাঁড়ায়।' কিছু কথাবার্তার পর স্বামীজী আবার বললেন, 'তাঁর কৃপাকটাক্ষে লাখো বিবেকানন্দ এখনি তৈরী হতে পারে। তবে তিনি তা না করে ইচ্ছা করে এবার আমার ভেতর দিয়ে আমাকে যন্ত্র করে এরূপ করাচ্ছেন—তা আমি কি করব—বল্?'

অতএব রামকৃষ্ণ মিশনের পরিকল্পনা বিবেকানন্দের নয়—শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছায় তাঁর ভিতর দিয়ে হচ্ছে মাত্র।

'যোগবাসিষ্ঠসারঃ' গ্রন্থে স্বামী ধীরেশানন্দ বলেছেন (৩।৫)—'প্রারব্ধ পরিচালিত হইয়া আপাতদৃষ্টিতে বিদ্বান ও সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় ইচ্ছাদি করিয়া থাকেন এবং ব্যবহারে তাঁহাদিগকে সময়ানুযায়ী ক্রোধাদিও করিতে দেখা যায়। কিন্তু ঐ সকলে তাঁহার কোন সত্যত্ব বুদ্ধি না থাকায় তিনি তাহাতে বদ্ধ হন না। তিনি সদা দ্রষ্টারূপেই থাকেন। তাঁহার

ইচ্ছাদি ভর্জিত বীজের ন্যায়। উহা দ্বারা কেবল প্রারব্ধভোগমাত্রই নির্বাহ হয়, কোন ব্যসন উৎপন্ন হয় না।'

গীতায় দ্বাদশ অধ্যায়ে প্রিয় ভক্তের কথা ভগবান বলেছেন যে, সর্বারম্ভ-পরিত্যাগী সে তাঁর প্রিয়। সর্বারম্ভপরিত্যাগী অর্থে 'যিনি ফলকামনা করিয়া কোন কর্ম অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন না, যথাপ্রাপ্ত কর্তব্য কর্ম নিষ্কাম ভাবে করিয়া থাকেন।' অর্থাৎ যিনি উদ্যোগ না নিয়ে কর্ম করেন, কাম্য কর্ম পরিত্যাগ করেন, যে কর্ম সামনে এসে উপস্থিত হয় তা সম্পাদন করেন—তিনি হবেন সর্বারম্ভপরিত্যাগী।

পঞ্চদশীতে (চিত্রদীপ ২৬২) আছে—'যখন অহংকার ও চিদাত্মাকে মিশাইয়া ফেলা হয়, তখনই ইচ্ছার উদয় হয়। বিবেক দ্বারা উভয়কে পৃথক করিয়া ফেলিলে কিরূপে কাহার ইচ্ছা উদয় হইবে? সুতরাং বুঝিতে হইবে, জ্ঞানীর ব্যবহারে যে ইচ্ছা, অনিচ্ছাদি দৃষ্ট হয়, উহা বাহ্য লোক-দৃষ্টির কথা, উহা জ্ঞানীর নিজ দৃষ্টির কথা নয়।'

অতএব লোকদৃষ্টিতে বিবেকানন্দকে দেখা যেত যে তিনি বেলুড়মঠের পরিকল্পনা করছেন, নানা সমাজসেবার পরিকল্পনা করছেন—কিন্তু তাঁর নিজের দৃষ্টিতে তিনি জানেন যে তিনি মতলব করে কোনো কাজ করছেন না, তাঁর পরিকল্পনা বা সংকল্প বলতে কিছু নেই।

স্বামী সারদানন্দ বলতেন, 'মেলা কিছু কাজ জুটাবে না, যা সামনে আসছে তাই করবে। আপনা থেকে যে কাজ আসে তাই করবে।'

স্বামী তুরীয়ানন্দ সংকল্প করার ঘোর বিরোধী ছিলেন। আমেরিকায় 'শান্তি আশ্রমে' শিষ্যদের যা উপদেশ দিতেন সে বিষয়ে তিনি বলেছেন, 'তোমরা সংকল্প কর কেন? মতলব আঁট কেন? ভবিষ্যতের কথা এত ভাব কেন? মাকে সংকল্প করতে দাও। তাঁর সংকল্পসকল সহজে সত্য হয়। তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত মানুষের সংকল্প সবই বৃথা। তিনি জানেন কি ঘটবে। তাঁর কাছে ভবিষ্যৎ একখানি খোলা পুস্তকের মতো। বর্তমানে বাস কর, সময় ও সুযোগের সদ্ব্যবহার কর। ভবিষ্যতের কথা ভেবো না। নিশ্চিত জেনো মায়ের ইচ্ছা পূর্ণ হবেই। তাঁকে বিশ্বাস কর। দেহমন তাঁর চরণে অর্পণ

কর, তোমাকে নিয়ে তিনি যা ইচ্ছা করুন।'

'শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা' গ্রন্থে একটি ছোট ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে (পৃঃ ৫০৫)—

'পৌষ মাসে কাশীতে সেবার ভয়ানক ঠাণ্ডা পড়িয়াছিল। সেই সময় জনৈক সাধু লাটু মহারাজের আশ্রমে কয়েকদিন ছিলেন। সাধুটি কলিকাতার আশেপাশে একটি মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। মঠ সম্বন্ধে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন—'ভগবানের ইচ্ছা হয় ত হবে।' একদিন লাটু মহারাজ হাসিতে হাসিতে তাহাকে বলিলেন—'এটা ভগবানের ইচ্ছা না তোমার ইচ্ছা।' সাধুটি গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'আমি উপলক্ষ্য মাত্র।' লাটু মহারাজ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—'তুমিই যে উপলক্ষ্য সেটা কেমন করে বুঝলে ভাই!' সাধু আপনার গাম্ভীর্য আরও গম্ভীরতর করিয়া বলিলেন—'তাঁরই প্রেরণায় আমার প্রাণে এই মঠ করবার ইচ্ছা জেগেছিল, তা না হলে আমার কি সাধ্য যে, আমি ভগবানের মঠ তৈরী করবার সংকল্প করতে পারি?' লাটু মহারাজ শুধু বললেন, 'তিনি (ঠাকুর) বলতেন—'যে কাজ না করলে নয়, সেই কাজই কামনাশূন্য হয়ে করতে হয়। ইচ্ছা করে বেশী কাজ জড়ান ভাল নয়, তাতে ভগবানকে ভুলে যেতে হয়। যেমন কালীঘাটে দানই করতে লাগলে, কালী-দর্শন আর হল না।' সেই সাধুটিকে তিনি বলেছিলেন, 'আসলি সাধু যেদিকে যায়, সেই দিক থেকেই সে ভগবানের ডাক শুনতে পায়। বাকী তার মধ্যে যদি একটুও খাদ থাকে, তাহলে সে সংসারের ডাককে (অর্থাৎ ভোগের পথকে) ভগবানের ডাক বলে ভুল শুনে থাকে।'

এ থেকে এই বোঝা যায় যে শরণাগত সাধকের ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝে কাজে অগ্রসর হওয়া উচিত, নিজের ইচ্ছায় বেশী কাজে জড়ানো ঠিক নয়। ঠিক ঠিক সাধক হলে তাঁর ইচ্ছা সে অনুভব করতে পারে যা কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে ইঙ্গিত পেতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ত্যাগী সন্তানদের মধ্যে কেউ কেউ ঠাকুরের কি ইচ্ছা জানবার জন্যে মন্দিরে ঠাকুরের কাছে চলে যেতেন এবং কোনো ইঙ্গিত

বা প্রেরণায় তাঁর ইচ্ছা অনুভব করতে পারতেন। একজন প্রবীণ সন্ন্যাসী বলেন, 'মহাপুরুষ মহারাজ অদ্বৈতবাদী ছিলেন, তিনি ব্রাহ্মসমাজে ছিলেন কিনা। কিন্তু শেষে তাঁরও ঈশ্বর দর্শনাদি হয়েছিল। ঠাকুরকে তিনি সাক্ষাৎ দেখতে পেতেন। রাখাল মহারাজ অসুস্থ হলে মহাপুরুষ মহারাজ ঠাকুর ঘরে গিয়ে ঠাকুরের কাছে তাঁর জন্যে প্রার্থনা জানাতে গেলেন। ঠাকুরের অতি গম্ভীর মূর্তি দেখে তিনি কিছু বলতে সাহস পেলেন না। বার বার তিনবার এ রকম হলো। তাতে বুঝলেন যে মহারাজের শরীর থাকবে না। সেবার ব্রহ্মানন্দ স্বামীর দেহ যায়।'*

স্বামী প্রেমানন্দ প্রসঙ্গে স্বামী বীরেশ্বরানন্দ বলেছেন, 'একবার পূর্ববঙ্গ যাবার জন্য তৈরি হয়ে তিনি (স্বামী প্রেমানন্দ) ঠাকুরকে প্রণাম করতে উপরে গেলেন। পূর্ববঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যে ভক্তেরা সব এসেছেন। সব তৈরি। এমন কি নৌকো পর্যন্ত ঘাটে বাঁধা হয়ে গেছে—নিয়ে যাবে কোলকাতায়। ঠাকুর ঘর থেকে নীচে নেমে এসে তিনি বললেন, 'না, আর যাওয়া হবে না। যে ব্যক্তি সেই সময় ঠাকুর ঘরে ছিল, সে দেখল যে, বাবুরাম মহারাজ ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলছেন আর শেষে বললেন, 'তা হলে আমি যাব না?' সে ব্যক্তি বাবুরাম মহারাজের কথাই শুধু শুনতে পেয়েছিল। ঠাকুর কি বললেন, শুনতে পায় নি। বাবুরাম মহারাজ নীচে এসে যখন বললেন, 'না, আর যাওয়া হবে না,' তখন অনুমান করে বোঝা গেল যে, ঠাকুর যেতে নিষেধ করেছিলেন। সবাই অবাক হয়ে গেলেন। সব ব্যবস্থা তৈরি, অথচ তিনি বলছেন যাবেন না। অগত্যা সেদিন যাওয়া হল না। পরে শোনা গেল যে, যে স্টীমারে তাঁর গোয়ালন্দ থেকে ঢাকা যাবার কথা ছিল সেই স্টীমারটা ঝড়ে পড়ে ডুবে গিয়েছিল।'

বেলুড় মঠের একজন প্রাচীন সন্ন্যাসী বলেছেন, 'কোন্ কাজ ঈশ্বরের ইচ্ছা, কোন্ কাজ তাঁর ইচ্ছা নয়—এ বিষয়ে প্রেরণা পাওয়া যেতে পারে। স্বামীজী যেমন প্রেরণা পেয়ে আমেরিকা গেলেন।'

অতএব দেখা যাচ্ছে যে অনেক মহাপুরুষ ও সাধকগণের কর্ম করার

* স্বামী জ্যোতিঃস্বরূপানন্দ

পেছনে 'প্রেরণা' হচ্ছে একটি বিশেষ উৎস। তাঁরা শরণাগতের ভাব নিয়ে থাকেন এবং যেন প্রেরিত হয়ে লোককল্যাণার্থে কর্ম করেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকায় ধর্মপ্রচার কালে একবার ইংল্যাণ্ডে এসেছিলেন। সেখান থেকে আমেরিকা ফিরে যাবার কালে যে ঘটনা ঘটেছিল স্বামীজী সে সম্বন্ধে বলেছেন (মন ও মানুষ)—'লণ্ডন থেকে সেবার আমেরিকা যাব। জাহাজের টিকিট কেনার সব ঠিক। ইংল্যাণ্ডের বন্দর থেকে যে জাহাজ ছাড়বে তার নাম ছিল 'লুসিটেনিয়া'। টিকিট কিনতে গিয়ে (৬ই মে ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দ) এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটলো। টিকিট কিনবো এমন সময় শুনতে পেলাম কে যেন টিকিট কাটতে আমায় স্পষ্ট নিষেধ করলো। আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। ভাবলাম মনের ভুল। এদিকে সেদিকে তাকালাম, কাকেও দেখতে পেলাম না। সুতরাং আবার গেলাম টিকিট কিনতে, কিন্তু সেবারেও ঠিক সে রকম। তখন টিকিট কেনা আর হল না, বাসায় ফিরে আসাই ঠিক করলাম। ভাবলাম—কালই না হয় যাওয়া যাবে। কিন্তু পরের দিন সকালে খবরের কাগজ খুলে দেখি বড় বড় হরফে লেখা—S. S. Lusitania is no more, অর্থাৎ লুসিটেনিয়া আটলান্টিক মহাসাগরের বুকে কাল রাত্রে ডুবে গেছে। আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম। চোখে জল এলো। বুঝলাম, শ্রীশ্রীঠাকুরই আমাকে রক্ষা করেছেন।'

ইঙ্গিত, প্রেরণা এই ভাবেও আসে।

শ্রীরামকৃষ্ণ কীভাবে শরণাগত হয়ে থাকতেন, ঈশ্বরের ইচ্ছার ওপর কীভাবে নির্ভর করতেন, তাঁর জীবনের ঘটনা স্বামী সারদানন্দ 'লীলাপ্রসঙ্গে' এইভাবে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করেছেন—

'ঠাকুরকে বিবাহিত জানিয়া শ্রীমদাচার্য তোতাপুরী তাঁহাকে এক সময় বলিয়াছিলেন, 'তাহাতে আসে যায় কি? স্ত্রী নিকটে থাকিলেও যাহার ত্যাগ, বৈরাগ্য, বিবেক, বিজ্ঞান সর্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ থাকে, সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মে যথার্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কে যিনি সমভাবে আত্মা বলিয়া সর্বক্ষণ দৃষ্টি ও তদনুরূপ ব্যবহার করিতে পারেন, তাঁহারই

যথার্থ ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ হইয়াছে। স্ত্রী-পুরুষে ভেদদৃষ্টিসম্পন্ন অপর সকলে সাধক হইলেও ব্রহ্মবিজ্ঞান হইতে বহুদূরে রহিয়াছে।

'...ব্রহ্মবিজ্ঞানে দৃঢ়প্রতিষ্ঠা লাভ সম্বন্ধীয় আচার্য শ্রীমৎ তোতাপুরীর কথা আলোচনাপূর্বক তিনি ঐকালে নিজ সাধনালব্ধ বিজ্ঞানের পরীক্ষা করিতে এবং পত্নীর প্রতি নিজ কর্তব্য পরিপালনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সময়ে তদুভয় অনুষ্ঠানের আরম্ভ মাত্র করিয়াই তাঁহাকে (কামারপুকুর হইতে) কলিকাতায় ফিরিতে হইয়াছিল। শ্রীমতী মাতা ঠাকুরাণীকে নিকটে পাইয়া (৪ বছর পরে) তিনি এখন পুনরায় ঐ দুই বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন।

'প্রশ্ন উঠিতে পারে—পত্নীকে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া তিনি ইতঃপূর্বেই তো ঐরূপ করিতে পারিতেন, ঐরূপ করেন নাই কেন? উত্তরে বলিতে হয়—সাধারণ মানব ঐরূপ করিত সন্দেহ নাই: ঠাকুর ঐ শ্রেণীভুক্ত ছিলেন না বলিয়া ঐরূপ আচরণ করেন নাই। ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া যাহারা জীবনে প্রতিক্ষণ প্রতি কার্য করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন, তাঁহারা স্বয়ং মতলব আঁটিয়া কখন কোন কার্যে অগ্রসর হন না। আত্মকল্যাণ বা অপরের কল্যাণ সাধন করিতে তাঁহারা আমাদিগের ন্যায় পরিচ্ছিন্ন, ক্ষুদ্র বুদ্ধির সহায়তা না লইয়া শ্রীভগবানের বিরাট বুদ্ধির সহায়তা বা ইঙ্গিতের প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। সেজন্য স্বেচ্ছায় পরীক্ষা দিতে তাঁহারা সর্বদা পরাঙ্মুখ হন। কিন্তু বিরাটেচ্ছার অনুগামী হইয়া চলিতে চলিতে যদি কখন ঐ পরীক্ষা দিবার কাল স্বতঃ উপস্থিত হয়, তবে তাহারা ঐ পরীক্ষা প্রদানের জন্য সানন্দে অগ্রসর হন। ঠাকুর স্বেচ্ছায় আপন ব্রহ্মবিজ্ঞানের গভীরতা পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হয়েন নাই।'

শ্রীরামকৃষ্ণের শরণাগতির কথা বলতে গিয়ে লীলাপ্রসঙ্গকার লিখেছেন—'ঠাকুরের মনে জগৎকারণের প্রতি 'গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ' বলিয়া একান্ত অনুরাগ, বিশ্বাস ও নির্ভরতার এখন সীমা ছিল না।'

শ্রীরামকৃষ্ণ নানা ভাবে নানা মতে সাধন করেছিলেন। তিনি বলেছেন, 'অনন্তভাবময়ী অনন্তরূপিণী তাঁহাকে নানাভাবে ও নানারূপে দেখিব।

বিশেষ কোন ভাবে তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা হইলে উহার জন্য তাঁহাকে ব্যাকুল হইয়া ধরিতাম। কৃপাময়ী মাও তখন তাঁহার ঐ ভাব দেখিতে বা উপলব্ধি করিতে যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা যোগাইয়া এবং আমার দ্বারা করাইয়া লইয়া সেইভাবে সেইভাবে দেখা দিতেন। ঐ রূপেই ভিন্ন ভিন্ন মতের সাধন করা হয়েছিল।'

তাই দেখি যখন যে ভাবের বা মতের সাধন হবে, তার পূর্বেই সেই পথ-প্রদর্শক গুরু এসে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হতেন। ঠাকুরকে চেষ্টা করে গুরুর সন্ধান করতে হয় নি। যেন কারো দ্বারা চালিত হয়ে গুরুই নিজে হাজির হয়েছেন। এইরূপে দেখা যায় ভৈরবী ব্রাহ্মণী, জটাধারী, তোতাপুরী, সুফী গোবিন্দ রায় ঠাকুরের গুরু হয়ে এসেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পূর্ণ মায়ের ওপর নির্ভরশীল—মায়ের প্রেরিত গুরুদের কাছে তিনি তাঁদের নির্দেশিত পথে নানা সাধন করেছিলেন, নিজের মতলবে তাঁকে কিছু করতে হয় নি। নিজের ইচ্ছাকে সম্পূর্ণভাবে মায়ের ইচ্ছার উপর বিসর্জন দিয়েছিলেন।

পুরনো পঞ্চবটীতে শ্রীরামকৃষ্ণের স্বহস্তরোপিত পঞ্চবটীর চারাগাছগুলো ও তুলসী অপরাজিতা ছাগলে গরুতে ক্ষতি করছে, বেড়া দিতে পারলে ভালো হত। কিন্তু বেড়া কীভাবে হবে, বাস্তবে সম্ভব হবে কিনা—এ সব সংশয়ও ছিল। তাঁর তো শরণাগতি। তাঁর ইচ্ছা মায়ের দরবারে পৌঁছে গেল। এ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন (কথামৃত ২য়)—'পঞ্চবটীতে তুলসী কানন করেছিলাম জপ ধ্যান করব বলে। বাখারির বেড়া দেবার জন্যে বড় ইচ্ছা হলো। তার পরেই দেখি জোয়ারে কতকগুলি বাখারির আঁটি, খানিকটা দড়ি, ঠিক পঞ্চবটীর সামনে এসে পড়েছে। ঠাকুরবাড়ীর একজন ভারী ছিল, সে নাচতে নাচতে এসে খবর দিলে, ঐ আঁটিতে গরানের খুঁটি, কাটারি সব ছিল। পরে ভর্তাহরির সাহায্যে ঐ দিয়ে পঞ্চবটীতে বেড়া দেওয়া হল।'

তিনি বলেছেন, 'যখন এই অবস্থা হলো, পূজা আর করতে পারলাম না। বললাম, মা, আমায় কে দেখবে? মা! আমার এমন শক্তি নাই যে

নিজের ভার নিজে লই। আর তোমার কথা শুনতে ইচ্ছা করে, ভক্তদের খাওয়াতে ইচ্ছা করে। এ সব মা কেমন করে হয়। মা, তুমি একজন বড় মানুষ পেছনে দাও! তাই তো সেজোবাবু এত সেবা করলে।

'আবার বলেছিলাম, মা, আমার তো আর সন্তান হবে না, কিন্তু ইচ্ছা করে একটি শুদ্ধ ভক্ত ছেলে আমার সঙ্গে সর্বদা থাকে। সেইরূপ একটি ছেলে আমায় দাও। তাই তো রাখাল হলো।'

তিনি চেয়েছিলেন নানা রকমের ভক্ত আসবে, তাদের নিয়ে নানাভাবে ধর্মপ্রসঙ্গ করবেন। তার কিছুদিন পর থেকে কেশব সেন এবং আরো আরো ভক্ত সব আসতে লাগলো। তিনি বলেছেন, 'মাকে কেঁদে বলতাম, মা, ভক্তদের জন্যে আমার প্রাণ যায়, তাদের শীঘ্র আমায় এনে দে। যা যা মনে করতাম তাই হতো।'

শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্ণ শরণাগতি বলে নিজের ইচ্ছাকে সম্পূর্ণরূপে মায়ের ইচ্ছায় লয় করেছিলেন, তাই এরূপ হওয়াই সম্ভব।

ইচ্ছালয়ের সাধনার পথনির্দেশ করতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন (মা, ৫), 'ভাগবত চেতনায় তোমাকে পূর্ণতর হয়ে উঠতে হবে যেন শেষে তোমার ইচ্ছায় ও তাঁর ইচ্ছায় কোনো পার্থক্য আর না থাকে, তাঁর প্রেরণা ব্যতীত আর কোনো সংকল্পই তোমার মধ্যে স্থান না পায়, তাঁরই সজ্ঞান কর্ম ছাড়া তোমার মধ্যে এবং তোমাকে আশ্রয় করে আর কোন কর্মই যেন না হয়।

'যে পর্যন্ত তুমি এই সম্পূর্ণ সক্রিয় একত্ব স্থাপন করতে না পেরেছ ততদিন মনে করবে তোমার দেহ ও আত্মা নিয়ে তুমি সৃষ্ট মায়েরই সেবার জন্যে, তোমার সর্ব কর্ম তাঁরই প্রীত্যর্থে। পৃথক কর্তৃত্ববোধ যদি তোমার মধ্যে প্রবল থাকে, যদি তোমার অনুভব হয় তুমিই কর্ম করে চলেছ, তবুও সে কর্ম করবে তাঁরই উদ্দেশ্যে। ···ফলের জন্য কোন দাবি থাকবে না, পুরস্কারের জন্য কোন স্পৃহা থাকবে না। ···সেবার আনন্দ, কর্মের সহায়ে অন্তরের পুষ্টির আনন্দ—নিরহঙ্কার কর্মীর পক্ষে এই যথেষ্ট প্রতিদান।

'কিন্তু একদিন আসবে যখন ক্রমেই তোমার এ অনুভব বৃদ্ধি পাবে যে

তুমি যন্ত্র, কর্মী নও। ···এর পরে তোমার উপলব্ধি হবে, ভাগবতী শক্তি কেবল প্রেরণা দেন না, পথ দেখিয়ে চলেন না, পরন্তু তোমার কর্মের প্রবর্তন ও উদ্‌যাপন তিনিই করেন। তোমার সকল গতিবিধির উৎস তিনি, তোমার সকল শক্তি তাঁরই, তোমার মন প্রাণ দেহ তাঁর ক্রিয়ার চৈতন্যময় আনন্দময় যন্ত্র, তাঁর লীলার উপকরণ, স্থূল জগতে তাঁর প্রকাশের আধার।'

আমরা কোনো কিছু ইচ্ছা করলে তারপর সেই ইচ্ছাকে রূপ দেবার জন্যে পরিকল্পনা করি এবং সেভাবে কাজে অগ্রসর হই, ইচ্ছা পূরণের চেষ্টা করি। কিন্তু অনেক সময়ই দেখা যায় ফল আংশিক হয়, কখনও মোটেই অভিপ্রেত ফল পাওয়া যায় না অথবা কখনও বিপরীত ফল দেখা দেয়। এক ভদ্রলোক দিল্লী যাওয়ার পরিকল্পনা করেছেন—সেভাবে দিনক্ষণ দেখে ট্রেনের টিকিট কাটা হলো। বাড়ী থেকে রওনা হলেন—কিন্তু পথে এমন ঘটনায় আটকে পড়লেন যে স্টেশনে পৌঁছবার একটু আগেই ট্রেন ছেড়ে চলে গেল। হতাশ হয়ে এই অবস্থায় আমরা বলে থাকি—Man proposes God disposes।

কাজের একটি ফল পেতে হলে যে ইচ্ছাশক্তিতে, প্রচেষ্টায় কাজ হয় তার উপর পরিবেশের বা দৈবের প্রভাব পড়ে অর্থাৎ অজ্ঞাত অন্য অনেক শক্তিও তাতে কাজ করে। অন্যান্য শক্তির প্রভাব বিরুদ্ধ ও শক্তিমান হলে মিলিত শক্তির ফলস্বরূপ বিপরীত ফল বা আংশিক ফল আনয়ন করতে পারে। কার্য-কারণ সম্বন্ধ প্রত্যেক ফলেরই থাকে। ঈশ্বর সকল কর্মের ফলদাতা হিসাবে তাঁর ইচ্ছা মেনে নিতে হবে। আমার ইচ্ছা সর্বাংশে পূর্ণ হলো না বলে ঈশ্বরের ওপর দোষ দিয়ে লাভ নেই।

ইচ্ছা থাকবে না, পরিকল্পনা থাকবে না, অথচ কর্ম ঠিক ঠিক হবে—এ তো সিদ্ধ অবস্থায়। সাধন অবস্থায় আমার ইচ্ছাকে কীভাবে ঈশ্বরেচ্ছায় মিলিয়ে দেওয়া যায়, কীভাবে তাঁর ইচ্ছা অনুভব করা যায় তার উপায় সম্বন্ধে মহাপুরুষদের জীবন-বেদ থেকে যা পাওয়া যায় তার সার-সংক্ষেপ এভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে—

নিজের মনে কোনো ইচ্ছা জাগলে ঈশ্বরের কাছে তা মনে মনে নিবেদন করা হলো, প্রার্থনা করা হলো—তারপর অপেক্ষা করা প্রয়োজন, ঐ বিষয়ে কোনো যোগাযোগ হয় কিনা, ঐ কাজে অগ্রসর হবার কোনো ইঙ্গিত বা প্রেরণা আসে কিনা। যদি অনুকূল যোগাযোগ হয় বা কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তবে সেই কাজে অগ্রসর হওয়া যায়, চেষ্টা করা যায়। চেষ্টায় রত থাকার ফলে আরো শুভ যোগ দেখা দিতে পারে, আরো ইঙ্গিত এবং সঙ্গে সঙ্গে আনন্দও দেখা দিতে পারে। তাঁর ইচ্ছায় কাজটি সফল হচ্ছে মনে করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং আরো প্রার্থনা চলবে। ক্রমে দেখা যাবে কাজের অগ্রগতিতে বাধা খুবই কম আসছে, যোগাযোগ খুব ভালো হচ্ছে, কাজের সফলতাও ঠিক ঠিক হচ্ছে। যদি ঠিকমত যোগাযোগ না হয়, বেশী বাধা আসতে থাকে, তবুও প্রার্থনা চলবে—তখন অন্য পথে বা অন্যভাবে কাজটি করার চিন্তা আনা যেতে পারে বা চেষ্টা করা যেতে পারে। তীব্র বাধা এলে তাঁর ইচ্ছা নয় ভেবে ওই কাজে অগ্রসর না হওয়াই ভালো—এইরূপ মানসিকতা রাখা যেতে পারে।

পরিকল্পনা বা সংকল্প না রেখে কাজ করার ব্যাপারে যে উপদেশ নির্দেশ উপলব্ধির কথা পাওয়া গেল তাতে সাধারণভাবে এই কথা বলা যায় যে —শরণাগতির সাধক নিজের অহং ভাব থেকে কোনো সংকল্প না করে অপরের কাছ থেকে বা নিজের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের কাছ থেকে কাজের যে পরিকল্পনা বা চিন্তাধারা আসবে তা গ্রহণ করে পরে তা ঈশ্বরের কাছে মনে মনে নিবেদন করে উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে অগ্রসর হতে পারেন। যদি নিজের মনে কখনও সংকল্প বা পরিকল্পনা জাগে তবে তাকে রূপ দিতে নিজে অগ্রসর হবার আগে অপরের কাছে বর্ণনা করা উচিত হবে। অপরের মতামত বুঝে, অপরের উৎসাহ উদ্দীপনা আগ্রহের ভাব লক্ষ্য করে এগিয়ে যাওয়া যায়। কাজের গতিতে বিঘ্ন কম থাকলে, যোগাযোগ, অর্থযোগ প্রভৃতি সহজ হলে তাকে ঐশ্বরিক প্রেরণা হিসাবে গ্রহণ করা যায়। কাজের বিষয়ে নিজের রুচি, অভিজ্ঞতা, দূরদৃষ্টি থাকতে পারে এবং তা প্রয়োগ করা যায়। যখন যেমন পুরুষকার দরকার তা করতেই হবে—

কিন্তু গোঁ ভরে, জেদ করে, তীব্র পুরুষকার সহায়ে করতে গেলে 'আমিত্ব' প্রকাশ হয়ে পড়বে। কাজের বেলা সর্বদা মনে রাখতে হবে—প্রতি পদক্ষেপেই যেন তাঁর উপর নির্ভর করে চলছি, নিজের ইচ্ছায় নয় তাঁর ইচ্ছায় করছি।

নতুন নতুন কর্মের ঝোঁক না রেখে কাজের গতিতে যে সব কর্ম কর্তব্যবোধে বা দায়িত্ব পালনে এসে উপস্থিত হবে ঈশ্বরেচ্ছায় তা এসেছে মনে করে করতে হবে। উপরে কথিত প্রণালীতে কর্মাদি করলে স্মরণ মনন যেমন থাকবে, তাঁর উপর নির্ভরতাও বৃদ্ধি হবে, তাঁর ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে—এ ভাবটিও দৃঢ় হবে। মনে আনন্দ থাকবে, সন্তোষ থাকবে।

একজনের ইচ্ছা হলো তীর্থভ্রমণে যাবেন হরিদ্বারে। তাঁর ইচ্ছা মনে মনে ভগবানের কাছে নিবেদন করে প্রার্থনা জানাতে লাগলেন। এদিকে খোঁজখবর নিতে লাগলেন, কীভাবে যাওয়া যায়, কোথায় থাকা যায়, ইত্যাদি। একজনের সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে হয়তো তিনি বলে দিলেন, হরিদ্বারে তাঁর জানা স্থান আছে, থাকার সব ব্যবস্থা করে দেবেন। এ ইঙ্গিত পেয়ে টিকিট কাটতে গেলেন এবং তা সহজে হয়ে গেল। সব যোগাযোগ শুভ দেখে আনন্দিত মনে রওনা হলেন। তাঁর মনে মনে সর্বদা প্রার্থনা আর নিবেদন। ভালোভাবে তিনি ফিরেও এলেন। বললেন, ঈশ্বরের ইচ্ছায় তীর্থ ভ্রমণ খুব ভালো হয়েছে।

এরূপ প্রণালীতে চললে বা কর্ম করলে নিজের ইচ্ছাকে ঈশ্বরেচ্ছায় সমর্পণের একটি কৌশল বলে গৃহীত হতে পারে। অবশ্য সাধক নিজেই বুঝতে পারবেন তাঁর শরণাগতি হচ্ছে কিনা। কারণ এ যে স্বসংবেদ্য।

এক ভদ্রলোক মেয়ে বিয়ে দেবেন, অনেক চেষ্টা করতে লাগলেন। চিঠি লেখালেখি, মেয়ে দেখানো অনেক হলো—কিন্তু পাকাপাকি কোথাও হয় না। পরে অপ্রত্যাশিতভাবে অতি সহজেই একস্থানে বিয়ে স্থির হয়ে গেল। বিয়ে যদি যথানির্দিষ্ট স্থানেই হবে তবে এত চেষ্টার প্রয়োজন ছিল কি? পূর্বের চেষ্টা সব কি অযথা নয়? চুপ করে থাকলে সময়মত এই বিয়েই হত। ভদ্রলোকের এই প্রশ্ন ছিল।

এরূপ মনে হওয়া স্বাভাবিক বটে, কিন্তু শরণাগতির সাধক জানবেন যে মেয়ে বিয়ে দেবার ইচ্ছাটি মনে মনে তাঁকে নিবেদন করার পর শুভ যোগাযোগের জন্য যেমন প্রার্থনা জানাতে হবে, তেমনি চেষ্টাও রাখতে হবে। সময় না হলে যেমন ফল লাভ হয় না, তেমনি কর্মফলও চেষ্টা দ্বারা ক্ষয় হতে থাকে। এভাবে বিঘ্নকর কর্মফল কেটে গেলে পুরুষকার ও প্রার্থনায় ঠিক সময় উপস্থিত হলে শুভ যোগ ঘটে। শরণাগতের নৈরাশ্য থাকবে না, শরণাগত বিফলতায় ভেঙে পড়বে না—আবার তাঁরই ইচ্ছা রূপদানের জন্যে প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই সে শান্তভাবে অগ্রসর হবে।

একজন প্রবীণ সন্ন্যাসীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'আপনি যে তাঁর ইচ্ছায় কাজটি হলো বললেন, তা আপনি কীভাবে বুঝলেন যে ভগবানের ইচ্ছায় এটি হলো?'

সন্ন্যাসী বললেন, 'তাঁর ইচ্ছা ছাড়া তো কোন কাজ হয় না, তাই এই কাজটিও তাঁর ইচ্ছাতেই হয়েছে।'

প্রশ্ন : কাজটি করলেন আপনি নিজের ইচ্ছায়, বললেন ঈশ্বরেচ্ছায় এ রকমও তো হতে পারে?

উঃ : আমি যে কাজ করি না কেন, তাঁর ইচ্ছা ছাড়া হতে পারে না। আমি সর্বদাই মনে করি তাঁর ইচ্ছাতেই সব করছি। কোন কাজ করার আগে তাঁকে স্মরণ করি, তাঁর কাজ বলে সেটি গ্রহণ করি, আবার কাজ শেষ হয়ে গেলে তাঁর দেওয়া কাজটি করলুম—এই ভাবটি মনে রাখি। কাজের সময়ে যদি কখনও এই চিন্তা বা ভাবটি যদি ভুলেও যাই, অজ্ঞাতসারে 'আমি করছি' মনে আসে—পরে আবার ভাবনা করি, ঠাকুরের ইচ্ছাতেই কাজটি হলো, তা না হলে আমার সাধ্য ছিল না কাজটি করার। তাই তো বলি, সব কাজ তাঁর ইচ্ছাতেই করি। সবই রামের ইচ্ছা।

এই ভাবেও কোনো কোনো সাধক নিজের ইচ্ছাকে ঈশ্বরেচ্ছায় লয় করার চেষ্টা করেন। দেখা গেছে তাঁরা বেশ শান্তভাবে অবস্থান করেন, কোনো বিষয়েও উত্তেজিত হন না, উদ্বিগ্ন হন না।

৩। কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয়

শরণাগতির সাধনে কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয় বা সিদ্ধান্ত (Decision) গ্রহণ একটি বড় প্রশ্ন। কোনো একটা ব্যাপারে যখন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হয়, কোন্‌টা করা উচিত—এটা অথবা সেটা—তখন ঈশ্বরের ইচ্ছা কী তা বুঝে মতামত দেওয়াই ঠিক। কিন্তু এরূপ ব্যাপারে ঈশ্বরেচ্ছা বুঝবার কোনো উপায় আছে কি? কোনো কোনো সময় হয়তো এমন জটিল, জরুরী সমস্যার উদ্ভব হয় যে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্তের ওপর লাভ-লোকসান, ক্ষয়-ক্ষতি, ভালো-মন্দ অনেকখানি নির্ভর করে। তাছাড়া প্রতি-দিনের অতি সাধারণ বিষয়েও সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হয়। কখনও জরুরী তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তও গ্রহণ করতে হয়। এ সমস্ত ক্ষেত্রেই শরণাগতির প্রশ্ন থাকা স্বাভাবিক।

সাধারণভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে কয়েকটি নিয়ম বা প্রণালীতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে। যথা—(১) আদর্শ নিরূপণ, (২) নিয়ম-নীতি নির্ধারণ, (৩) অভিজ্ঞতা ও সংস্কার, (৪) যৌগিক পন্থা, (৫) ঐশ্বরিক বা দৈব প্রেরণা, (৬) বিচার বিবেচনা।

এই বিষয়গুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে—

(১) **আদর্শ নিরূপণ**—কোনো একটি আদর্শ নিরূপণ করে তার পরি-প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয়। কেউ সারা জীবন ব্যাপী একটি আদর্শ মেনে চলেন। যেমন—অহিংসা। এই অহিংসার বিরোধী কোনো কাজ বা ভাব তিনি বর্জন করেন, অহিংসার অনুকূল যে কোনো বিষয়ে আগ্রহ দেখান। কেউ ধর্মজীবন যাপনের আদর্শ গ্রহণ করেন, তার প্রতিকূল বিষয় ত্যাগ করেন, অনুকূল বিষয় গ্রহণ করেন। ভারত ধর্মনিরপেক্ষ, স্বাধীন, সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ভারতের কর্ণধারগণ এই আদর্শের বিরোধী কাজকে শাসন করেন, এর সমর্থকদের উৎসাহ দেন। তেমনি যে কোনো সংঘ, প্রতিষ্ঠানের আদর্শ, উদ্দেশ্য থাকে এবং সে আদর্শও উদ্দেশ্য অনুযায়ী কর্মকর্তা ও সদস্যগণ কাজ করে থাকেন। আদর্শকে সামনে রেখেই উদ্দেশ্য স্থিরীকৃত হয়। এই আদর্শের সঙ্গে মিলিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়—

আদর্শ যেন একটি মাপকাঠি।

এখানে ন্যায় অন্যায়ের প্রশ্নটিও আসতে পারে। ধর্মীয় বা নৈতিক ন্যায় অন্যায় আছে, সামাজিক ন্যায় অন্যায় আছে, আর রাষ্ট্রীয় ন্যায় অন্যায় রয়েছে। অন্যায়কে পরিহার করে ন্যায়ের পথে চলার নির্দেশ সর্বক্ষেত্রেই থাকে। কোন্‌টা ন্যায় কোন্‌টা অন্যায় তা পূর্ব থেকে নির্ধারিত থাকে এবং তা নিরূপিত হয় কোনো আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতেই। ন্যায় অন্যায় সম্বন্ধে সচেতনতা থাকলে তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে অসুবিধে হয় না। শরণাগতির সাধক ন্যায়ের পক্ষপাতী সহজেই হবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মথুরবাবুর সঙ্গে তীর্থদর্শনে বৃন্দাবন গিয়েছিলেন। সেখানে নিধুবনের নিকটে এক কুটিরে গঙ্গামায়ী থাকতেন। তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণের খুব ভালো লেগেছিল। উচ্চস্তরের সাধিকা ছিলেন তিনি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন (কথামৃত ৩য়)—

'তাঁকে পেলে আমার খাওয়া দাওয়া, বাসায় ফিরে যাওয়া সব ভুল হয়ে যেতো।···গঙ্গামায়ীর কাছ থেকে দেশে চলে আসবার ইচ্ছা আমার ছিল না। সব ঠিক ঠাক, আমি সিদ্ধ চালের ভাত খাব—গঙ্গামায়ীর বিছানা ঘরের এদিকে হবে, আমার বিছানা ওদিকে হবে। সব ঠিকঠাক। হৃদে তখন বল্লে, তোমার এত পেটের অসুখ—কে দেখবে। গঙ্গামায়ী বল্লে, কেন, আমি দেখবো, সেবা করবো। হৃদে এক হাত ধরে টানে আর গঙ্গামায়ী এক হাত ধরে টানে—এমন সময়ে মাকে মনে পড়ল!—মা সেই একলা দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ির নবতে। আর থাকা হল না। তখন বললাম, না, আমায় যেতে হবে।'

এখানে 'মাতৃসেবার আদর্শ' পরিস্ফুট। আদর্শের ভিত্তিতেই শ্রীরামকৃষ্ণের সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হল।

(২) **নিয়ম-নীতি নির্ধারণ**—আইন-কানুন, নিয়ম-নীতি (Policy) নির্ণয় করে অনেক ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কার্যের পরিচালনায় কতকগুলো নিয়ম বা আইন-কানুন গ্রহণকরতে হয়, কখনও বা কোনো কাজের ব্যাপারে নীতি-নির্ধারণ করতে হয়। এইগুলো স্থির হয়ে গেলে এই সব নিয়ম

নীতির পরিপ্রেক্ষিতে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজ হয়। ২১ বছর বয়সের আগে ভোটার হওয়া যাবে না—এই আইন হলে সে অনুযায়ী অনেক সমস্যায় সিদ্ধান্ত নিতে অসুবিধে নেই। সংবিধান অনুযায়ী বিচার বা সিদ্ধান্ত নিলে অনেক সমস্যা দূর হয়। কোনো কাজে নীতি নির্ধারণ করা হলো—'যে প্রথম আসবে সে প্রথম সুযোগ পাবে', এরূপ নীতিতে কোনো সিদ্ধান্ত সহজেই গ্রহণ করা যায়।

রাষ্ট্রপরিচালনায় মন্ত্রিসভা প্রত্যক্ষভাবে বা সোজাসুজি দেশ শাসন করেন না। মন্ত্রিসভা প্রয়োজনীয় বিষয়ে নীতি-নির্ধারণ (Policy) করেন মাত্র। সেই নীতিতে অফিসার ও সরকারী কর্মচারিগণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাজে রূপদান করেন। কোনো কাজ করতে গিয়ে অফিসার বা কর্মী কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে মন্ত্রিসভা নির্ধারিত নীতি তাঁকে তা সমাধান করতে সাহায্য করে এবং সেভাবে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, নিজস্ব ইচ্ছা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিয়ে কর্ম করতে তাঁকে হয় না।

উপরের ১নং বা ২নং ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ইচ্ছা প্রকাশের সুযোগ কম বা নেই। কারণ, কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হলে তা পূর্বনির্ধারিত আদর্শের সঙ্গে বা নিয়ম-নীতির সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েই মতামত ব্যক্ত করা যায়। তবে এই আদর্শ বা নিয়ম-নীতি পূর্ব থেকে কেউ একজন বা দশজন মিলে স্থির করে দেন—কাজেই সে সব ক্ষেত্রে 'আমার ইচ্ছা' প্রকাশের সুযোগ নেই, আমার 'অহং' নিয়ে কিছু করতে বা বলতে হয় না। শরণাগতি নিয়ে যাঁরা চলতে চান তাঁদের পক্ষে নিজের ইচ্ছাকে অনেকের ইচ্ছার মধ্যে তথা ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যে ডুবিয়ে দেবার এটি একটি সহজ পথ। শুধু ঠিক ঠিক আদর্শ বা নিয়ম-নীতি বিচার করবার চেতনাটুকু চাই।

(৩) অভিজ্ঞতা ও সংস্কার—কারো অভিজ্ঞতা ও সংস্কার কোনো বিশেষ বিচার বিবেচনা ছাড়াই মতামত গ্রহণে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। কোনো বিষয়ে যদি পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে থাকে তবে কোনো কাজের বা বিষয়ের দোষ ত্রুটি, ভালো মন্দ আগেই জানা যায়। সে সব ক্ষেত্রে পূর্ব অভিজ্ঞতা সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে থাকে।

অভ্যাসই সংস্কারে পরিণত হয়। কোনো কোনো কাজে, আচরণ-ব্যবহারে সংস্কারের প্রতিফলন দেখা যায়। পূর্বকৃত অভ্যাসেই এই ফল আসে। স্বামী বিবেকানন্দ এই বিষয়ে একটি উদাহরণ দিয়েছেন (জ্ঞানযোগ)—

'মনে কর একজন পিয়ানো বাজাইতে শিখিতে আরম্ভ করিল। প্রথমে তাহাকে প্রত্যেক পরদার দিকে নজর রাখিয়া তবে উহার উপর অঙ্গুলি প্রয়োগ করিতে হয়। কিন্তু অনেক মাস, অনেক বৎসর অভ্যাস করিতে করিতে উহা স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়, আপনা-আপনি হইতে থাকে। এক সময়ে ইহাতে জ্ঞানপূর্বক ইচ্ছার প্রয়োজন হইত। এখন আর উহার প্রয়োজন থাকে না, জ্ঞানপূর্বক ইচ্ছা ব্যতীতই ইহা নিষ্পন্ন হইতে পারে। ইহাকেই বলে স্বাভাবিক জ্ঞান। প্রথমে ইহা ইচ্ছাসহ কৃত ছিল, পরিশেষে উহাতে আর ইচ্ছার প্রয়োজন রহিল না।'

অতএব বুঝা যায় যে নিজস্ব সংস্কার অনুযায়ী মতামত গঠন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ অনেক সময় এমনভাবে হয় যে সেখানে নিজস্ব ইচ্ছার প্রতিফলন নেই বা কম। আবার সংস্কার নানারকম হতে পারে—ধর্মীয়, সামাজিক, জাতীয় বা অন্য ধরনের সংস্কারও থাকে। ফলে অনেক ব্যাপারেই সংস্কারের প্রভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয়।

এই সঙ্গে আর একটি বিষয় আসে, তা হলো 'রুচি'। প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব একটা রুচি আছে। সে রুচি দ্বারা চলাফেরা, খাওয়াদাওয়া, পোশাক-আশাক, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতিতে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়। এই রুচি সাধারণত তৈরি হয় এবং পরিচালিত হয় সংস্কার দ্বারা। যে সংস্কারের ফলে এ জীবন লাভ হয়েছে, সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশে যে সংস্কার তৈরি হয়েছে তারই প্রভাবে রুচি নির্ধারিত হয়।

সংস্কার দ্বারা পরিচালিত বলে এখানে নিজস্ব ইচ্ছা দ্বারা বিচার বিবেচনার সুযোগ কম। অবশ্য রুচিদ্বারা ছোটখাট ব্যাপারে, ব্যক্তিগত প্রয়োজনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রশ্নই বেশী আসে। তাই এখানে ঈশ্বরেচ্ছা অনুভবের ব্যাপার থাকে না—সংস্কারের প্রভাবেই সে কাজ সম্পন্ন হয়। অবশ্য নিজস্ব ইচ্ছা দ্বারা অভিমত গঠন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে পূর্ব

অভিজ্ঞতার মূল্য ও সংস্কারের প্রভাব প্রতিফলিত হতে পারে।

(৪) যৌগিক পন্থা—যৌগিক পন্থায় অর্থাৎ যৌগিক ক্রিয়ানুষ্ঠানের মাধ্যমে—যেমন ক্রিয়াযোগ, ধ্যান, প্রাণায়াম, সমাধি ইত্যাদি প্রণালী অবলম্বনে কোনো ইঙ্গিত বা প্রেরণা লাভ করে সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কোনো কোনো সময়ে হয়ে থাকে। যোগের প্রণালীতে দূরদর্শন, দূরশ্রবণ হয় আবার আলৌকিক শক্তি বা সিদ্ধাই লাভ হতে পারে। বড় বড় সাধকের অষ্টসিদ্ধিও লাভ হয়। এই সব শক্তি বা সিদ্ধাই প্রয়োগ করে সাধক তাঁর ইচ্ছামত কর্মে সুফল বা আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করতে পারেন। তান্ত্রিক পদ্ধতিতে সাধনা দ্বারাও অনেকে সাধক সিদ্ধাই লাভ করেন। কোনো কোনো তান্ত্রিক মতে নানা অভিচার ক্রিয়াও থাকে—যেমন, মারণ, উচাটন, বশীকরণ প্রভৃতি। এই সব ক্রিয়া দ্বারাও অনেকে অভীষ্ট সিদ্ধি লাভের চেষ্টা করেন। এই ক্রিয়া বা শক্তিদ্বারা এই পথের কোনো কোনো সাধক ভবিষ্যত জেনে সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন।

এ সব ক্ষেত্রে যোগের দ্বারা উপলব্ধ অথবা তন্ত্র সাধনা দ্বারা উপলব্ধ সিদ্ধান্ত সমূহ কর্মক্ষেত্রে বা প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়—এখানে শরণাগতির প্রশ্ন নিয়ে বিচার বিবেচনার বিষয় আসে না। শ্রীঅরবিন্দ যোগী ছিলেন। তিনি যোগদৃষ্টিতে ভারতের ভবিষ্যত, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভবিষ্যত সম্বন্ধে কিছু উপলব্ধি করেছিলেন এবং এ সব ব্যাপারে নাকি তিনি যৌগিক শক্তি প্রয়োগ করেছিলেন।

বর্তমান কালে বিভিন্ন দেশে পরামনোবিদ্যা (Parapshycology) নিয়ে খুব গবেষণা হচ্ছে। মনোজগতের রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্যে এই গবেষকগণ চেষ্টা করেছেন এবং এর বাস্তব প্রয়োগ দ্বারা রোগ নিরাময়, অপরের মনের কথা জানা, ভবিষ্যত দর্শন প্রভৃতি ভাবে মানুষের ও সমাজের উপকারের চেষ্টা করছেন। রহস্যময় অন্তর্জগতের অনেক শক্তি উদ্‌ঘাটনের ও তার প্রয়োগের চেষ্টা এসব স্থলে হচ্ছে। তাঁদের আবিষ্কৃত পদ্ধতি অনুসারে তাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

স্বামী সারদানন্দ বলতেন, কোন একটি সমস্যা এসেছে, একটা সিদ্ধান্ত

নেওয়া দরকার। এই সিদ্ধান্তের ওপর অনেকখানি নির্ভর করছে ভবিষ্যত কর্মপন্থা বা জটিলতার মীমাংসা। তখন ঘরে বা ঠাকুর ঘরে ধ্যান করতে বসে মনটাকে নিরপেক্ষ করে দেওয়া দরকার। মনেতে সমস্যার বিষয়ে কোন চিন্তা থাকবে না—সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। তারপর মনে ঐ বিষয়ে প্রথম যে মীমাংসার সূত্র জাগবে, তাই সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করা ভাল। শ্রীশ্রীমাও এইরূপ বলতেন। স্বামী সারদানন্দ এইভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন।*

লাটু মহারাজ কীভাবে কোনো সমস্যা সমাধানে শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশের অপেক্ষা করতেন তার বর্ণনায় পাওয়া যায় (লাটু মহারাজের স্মৃতিকথা, পৃঃ ৩৪৫)—

'যখনই যে কোন সমস্যায় পড়িতেন, তখনই তিনি (লাটু মহারাজ) শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে চাহিয়া থাকিতেন, তাঁহারই নির্দেশের অপেক্ষা করিতেন। যতক্ষণ না তাঁহার নিকট হইতে স্পষ্ট কোন নির্দেশ পাইতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি সেই সমস্যাবহুল কার্যে অগ্রসর হইতেন না। এমন কতদিন কাটিয়া গিয়াছে যখন তাঁহার নির্দেশ পাইবার জন্য তাঁহাকে মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অপেক্ষা করিতে হইয়াছে। বলরাম মন্দিরে তিনি একদিন আমাদের নিকট বলিয়াছিলেন—'তোমাদের আবার নির্ভরতা! দুদিন তাঁকে ডেকে সাড়া না পেলে এমনি নিজের মতে কাজ করতে লেগে যাও, যেন ভগবানের চেয়ে তুমি বেশী বোঝ! তাঁর উপর নির্ভর করা মানে তাঁর আদেশে চলা—তাঁর হুকুমে না পেলে কোন কিছু করতে যাবে না, এমন কি তাতে যদি তোমাদের হাজারো ক্ষতি হয় তাতেও টলবে না। তবে তো তাঁর উপর নির্ভর করেছো বলতে পার!'

অতএব যৌগিক পন্থা ঈশ্বরেচ্ছা অনুভবের বিশেষ পথ বলে সে পন্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয়। কিন্তু এ পথ বিশেষ অধিকারীর জন্যে, সাধারণের জন্যে নয়—সাধারণ মানুষ এ পথে যেতে পারে না।

(৫) ঐশ্বরিক বা দৈব প্রেরণা—ঐশ্বরিক বা দৈব প্রেরণা বশে অনেক

* স্বামী ধীরেশানন্দ মহারাজ কথিত

সাধক, মহাপুরুষ বা ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষগণ কাজ করে গেছেন। সাধারণ মানুষও কখন কখন দৈবশক্তির প্রভাবে আবিষ্টের ন্যায় কাজ করেন। দেবতার ভরের কথাও শোনা যায়। দৈবশক্তির বশে রোগনির্ণয়, ঔষধদান, নির্দেশ উপদেশ দান বা ভবিষ্যত বর্ণনার ঘটনা অনেক শোনা যায়। ইঙ্গিত বা প্রেরণা লাভ করে ঈশ্বরেচ্ছা অনুভবের কথা পূর্ববর্তী অধ্যায়েও আলোচনা করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারেও প্রেরণা বা ইঙ্গিত কেউ কেউ পেয়ে থাকেন।

হজরত মোহম্মদ দেবদূত গ্র্যাবিয়েলের কাছ থেকে বৎসরের পর বৎসর ঈশ্বরের আদেশ শ্রবণ করেছেন এবং পরে তা প্রচার করেছেন। ফলে যেমন তাঁর একদল অনুগামী তৈরি হয়েছে, তেমনি অনেকেই তাঁর বিরুদ্ধে যায়। এই বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে তাঁকে যুদ্ধও করতে হয়েছে। এইভাবে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশে তিনি এক ধর্মমত সৃষ্টি করেন, যা ইসলাম ধর্ম নামে খ্যাত।

প্যালেস্টাইনে যীশুর অন্তর্ধানের অনেক পরে সল নামে এক ব্যক্তি এক সময়ে হঠাৎ যীশুর ভাবে ভাবিত হন এবং ভগবান যীশুর শিক্ষা ও ধর্ম প্রচার করার জন্য প্রেরণা লাভ করেন। পূর্বে তিনি যীশুর ধর্মের বিরোধী ছিলেন। এই প্রেরণা দ্বারা তিনি খ্রীস্টধর্মের প্রচার শুরু করেন। তিনিই প্রথম খ্রীস্টধর্মতত্ত্বের প্রচারক। তাঁর নাম তখন হয় সেণ্ট পল।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ঈশ্বরাবিষ্ট হয়ে কাজ করেছেন এরূপ অনেক ঘটনা আছে। একবার ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধে ফ্রান্স যখন পরাজয়ের সম্মুখীন তখন জোয়ান অব আর্ক নামে একটি বালিকা ফরাসী সৈন্যদের উৎসাহ ও প্রেরণা দ্বারা যুদ্ধের জন্য বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেন এবং সেই যুদ্ধে ফরাসীদের জয় হয়। জোয়ান অব আর্ক বলেছিলেন যে তিনি বিশেষ প্রত্যাদেশ লাভ করে আবিষ্টের ন্যায় কাজ করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঈশ্বরীয় কথা বা গান শুনতে শুনতে বা বলতে বলতে ঈশ্বরীয় ভাবে ভাবস্থ হয়ে পড়তেন। সেই অবস্থায় তিনি মায়ের সঙ্গে কথা বলতেন, উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব কথা বা গুহ্য কথা বলতেন বা অনেকের

মনের ভাবও বলে দিতেন। কথামৃতের পাতায় পাতায় এই ভাবাবিষ্টের বর্ণনা আছে। যেমন—

'ঠাকুর কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ ; কিন্তু এখনও ভাবাবিষ্ট। এই অবস্থায় ভক্তদের কথা বলিতেছেন। মাঝে মাঝে মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন।'···

'ঠাকুর এখনও ভাবস্থ, সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হন নাই। তিনি সেই অবস্থাতেই সুরেন্দ্রকে বলিতেছেন, তোমার ঘোড়া যত বইতে পারে, তার বেশী নিয়ো না।'···

'শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট। উত্তরাস্য হইয়া দেওয়ালে ঠেসান দিয়া পা ঝুলাইয়া তাকিয়ার উপর বসিয়া আছেন। ভক্তেরা চতুর্দিকে উপবিষ্ট। ভাবাবিষ্ট হইয়া ঠাকুর মার সঙ্গে একাকী কথা কহিতেছেন। ঠাকুর বলিতেছেন—'এই বেলা খেয়ে যাব। তুই এলি ? তুই কি গাঁটরি বেঁধে বাসা পাকড়ে সব ঠিক করে এলি ?'···

'বলরামের বৈঠকখানায় দীপালোক জ্বলিতেছে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এখনও ভাবস্থ, ভক্তজন পরিবৃত হইয়া আছেন। ভাবে বলিতেছেন—এখানে আর কেউ নাই, তাই তোমাদের বলছি—আন্তরিক ঈশ্বরকে যে জানতে চাইবে তারই হবে, হবেই হবে! যে ব্যাকুল, ঈশ্বর বই আর কিছু চায় না, তারই হবে।'···ইত্যাদি

স্বামী বিবেকানন্দ পরিব্রাজক অবস্থায় উত্তর ও পশ্চিম ভারত ভ্রমণ করে দক্ষিণ ভারতে এলেন। সেখানে তিনি কন্যাকুমারী মূর্তি দর্শনে বিশেষ অভিভূত হন এবং পরে সমুদ্রে সাঁতার দিয়ে ভারতের শেষ প্রস্তরখণ্ডে উপস্থিত হয়ে ধ্যানস্থ হন। ভবিষ্যত ভারতকে গড়ে তোলার পথের ইঙ্গিত ও প্রেরণা তিনি এখান থেকে লাভ করেন। পরবর্তীকালে সেই প্রেরণা বশে তিনি ভারতের উত্থান ও উন্নতির জন্যে অনেক কাজ করে গেছেন এবং দেশবাসীকে জাতির উন্নতির পথ দেখিয়ে গেছেন।

ভগিনী নিবেদিতার জীবনে দেখা যায় যে স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পর যখন বেলুড় মঠে স্বামীজীর মরদেহ দাহ করা হচ্ছিল তখন দূরে উপবিষ্ট ভাবস্থ নিবেদিতার কোলে এসে একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পড়ে। নিবেদিতা

এ দ্বারা বিশেষ প্রেরণা লাভ করেন—যেন অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা লাভ করেন। এর পরেই তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে শুধু বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনা নয়, স্বামীজীর ভাবধারা সমস্ত ভারতে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং জাতিকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তিনি দেশের বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ রেখে জাতীয়তার বাণী প্রচারে মেতে গেলেন। সেই অগ্নিযুগে বিপ্লবী সংগঠনে নিবেদিতার অবদান যথেষ্ট রয়েছে।

দিব্যশক্তি বা ঐশ্বরিক প্রেরণায় যাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন বা পথ নির্দেশ করেন তাঁদের নিজেদের ইচ্ছার প্রকাশ থাকে না—সবই দিব্য ইচ্ছা বা ঈশ্বরেচ্ছা। কাজেই এক্ষেত্রে নিজেদের মত প্রকাশে সমস্যা নেই।

(৬) **বিচার বিবেচনা**—বিচার বিবেচনার বিষয়টি শরণাগতির ব্যাপারে বড় প্রশ্ন। কোনো আদর্শ বা নিয়মনীতির মধ্যে পড়ে না, কোনো সংস্কার, যোগের ব্যাপার বা দিব্য প্রেরণা যেখানে নেই—এমন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হলে সাধারণত নানাদিক ভেবে চিন্তে বিবেচনা করে তবে তা করা হয়। নিজের বিচার বুদ্ধিতে সাহায্য করার জন্যে প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অপরের পরামর্শ নেওয়া হয় বা অপরের সঙ্গে আলোচনা করা হয়। যার সে সব বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে তার মতামতের বিশেষ মূল্য থাকে। বড় বা ছোট কাজে পরামর্শ করা, বিচার বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা—একটি প্রধান পন্থা। স্ব-ইচ্ছার অভিব্যক্তি এখানে বেশী—কারণ এ ক্ষেত্রে ঈশ্বরেচ্ছার অনুভব পূর্ব থেকে করা যায় না বলেই নিজেকেই নিজের বিচার বুদ্ধিতে, অভিপ্রায় অনুসারে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কাজেই কোনো সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে বা কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয়ে এরূপ ক্ষেত্রে ঈশ্বরেচ্ছার অনুভব ও ঈশ্বর নির্ভরশীলতার রহস্য সন্ধান করার আবশ্যকতা রয়েছে। শরণাগতির সাধককে এমন একটা পথ অবলম্বন করতে হবে যদ্দারা ঈশ্বরেচ্ছাকে অনুভব করে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।

শ্রীকৃষ্ণদেব একটি গল্প বলতেন—'কোন এক বনে এক সাধু থাকেন। তাঁর অনেকগুলো শিষ্য। তিনি একদিন শিষ্যদের উপদেশ দিলেন যে, সর্বভূতে

নারায়ণ আছেন, এইটি জেনে সকলকে নমস্কার করবে। একদিন একটি শিষ্য হোমের জন্য কাঠ আনতে বনে গিছলো। এমন সময়ে একটা রব উঠলো, 'কে কোথায় আছ পালাও—একটা পাগলা হাতি যাচ্ছে।' সবাই পালিয়ে গেল, কিন্তু শিষ্যটি পালালো না। সে জানে যে, হাতিও যে নারায়ণ, তবে কেন পালাব? এই বলে দাঁড়িয়ে রইল। নমস্কার করে স্তব-স্তুতি করতে লাগলো। এদিকে মাহুত চেঁচিয়ে বলছে, 'পালাও পালাও।' শিষ্যটি নড়লো না। শেষে হাতিটা শুঁড়ে করে তুলে নিয়ে তাকে একধারে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল। শিষ্য ক্ষত-বিক্ষত হয়ে ও অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইল।

'এই সংবাদ পেয়ে গুরু ও অন্যান্য শিষ্যেরা তাকে আশ্রমে ধরাধরি করে নিয়ে গেল। আর ঔষধ দিতে লাগল। খানিকক্ষণ পরে চেতনা হলে ওকে জিজ্ঞেস করলে, 'তুমি কেন হাতি আসছে শুনে চলে গেলে না?' সে বললে, 'গুরুদেব যে আমায় বলে দিছলেন, নারায়ণ জীবজন্তু সব হয়েছেন। তাই আমি হাতি নারায়ণ আসছে দেখে সরে যাই নাই।' গুরু তখন বললেন, 'বাবা, হাতি নারায়ণ আসছিলেন বটে, তা সত্য। কিন্তু বাবা, মাহুত নারায়ণ তো তোমায় বারণ করেছিলেন। যদি সবই নারায়ণ তবে তার কথা বিশ্বাস করলে না কেন? মাহুত নারায়ণের কথাও শুনতে হয়।'

অন্য এক সময়ে ডাক্তার মহেন্দ্র সরকারকে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'যদি বলো সব নারায়ণ, তবে চুপ করে থাকলেই হয়, তা আমি মাহুত নারায়ণও মানি।

'শুদ্ধ মন আর শুদ্ধ আত্মা একই। শুদ্ধ মনে যা উঠে, সে তাঁরই কথা। তিনিই মাহুত নারায়ণ।

'তাঁর কথা শুনব না কেন? তিনিই কর্তা! 'আমি' যতক্ষণ রেখেছেন, তাঁর আদেশ শুনে কাজ করবো।'

স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যদেশ থেকে ফিরে আসার পর একদিন তাঁর বন্ধু হরমোহন মিত্রকে বলেছিলেন (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ—গুরুভাব, পূর্বার্ধ)—

'ঠাকুরের এক একটি কথা অবলম্বন করিয়া বুড়ি বুড়ি দর্শন গ্রন্থ লেখা যাইতে পারে।' বন্ধুটি তৎশ্রবণে অবাক হইয়া বলেন, 'বটে? আমরা তো ঠাকুরের কথার অত গভীর ভাব বুঝতে পারি না। তাঁর কোন একটি কথা ঐ ভাবে আমাকে বুঝিয়ে বলবে?'

স্বামীজী—বোঝবার মাথা থাকলে তো বুঝবি? আচ্ছা, ঠাকুরের যে কোন একটি কথা ধর, আমি বুঝুচ্ছি।

বন্ধু—বেশ। সর্বভূতে নারায়ণ দেখা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে ঠাকুর 'হাতি-নারায়ণ ও মানুষ-নারায়ণে'র যে গল্পটি সেইটি বুঝিয়ে বল।

'স্বামীজীও তৎক্ষণাৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়বিধ পণ্ডিতদিগের ভিতরে আবহমানকাল ধরিয়া, স্বাধীন-ইচ্ছা ও অদৃষ্টবাদ অথবা পুরুষকার ও ভগবদিচ্ছা লইয়া যে বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে অথচ কোন একটা স্থির মীমাংসা হইতেছে না, সেই সকল কথা উত্থাপন করেন এবং ঠাকুরের ঐ গল্পটি যে ঐ বিচারের এক অপূর্ব সমাধান, তাহা সরল ভাষায় তিন দিন ধরিয়া বন্ধুটিকে বুঝাইয়া বলেন।'

লীলাপ্রসঙ্গে স্বামীজীর উপরের বিষয়ের বিচার বিশ্লেষণের বর্ণনা আমরা পাই না, অন্য কোথাও এই আলোচনা-প্রসঙ্গ পাওয়া যায় নি। তা পাওয়া গেলে হয়তো শরণাগতির বিষয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পালটে যেতো এবং তার ঠিক ঠিক সাধন-রহস্যও আমরা পেয়ে যেতুম।

কোন্‌টা করা উচিত বা করা উচিত নয়, এই বিভ্রান্তির মধ্যে মানুষ-রূপী ঈশ্বরের কথাতেই পথের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। যেন কেউ এসে বলে দিচ্ছে, এই কর এই কর। এর মধ্যে ঈশ্বরেচ্ছায় নির্ভর এবং সেভাবে কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ইঙ্গিত যেন পাওয়া যায়।

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনে দেখা যায় তিনি কাটোয়াতে সন্ন্যাস গ্রহণের পর প্রেমে উন্মত্ত হয়ে বৃন্দাবন যেতে পথ ভুল করে শান্তিপুরে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে সকল ভক্ত তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন, শচীমাতাও এলেন। সকলে চৈতন্যদেবকে অনুরোধ করতে লাগলেন তিনি যেন বৃন্দাবন না গিয়ে এই দেশেই থেকে যান। চৈতন্যদেব সন্ন্যাস-জীবনের আদর্শের

কথা উল্লেখ করে বললেন যে সন্ন্যাসী জন্মস্থানে কখনও থাকতে পারে না। শচীমাতা তখন তাঁকে নীলাচলে থাকার কথা বললেন। চৈতন্যদেব মায়ের এই প্রস্তাব ঈশ্বরেচ্ছা রূপে গ্রহণ করে পুরীতে গেলেন।

শ্রীচৈতন্যদেব পুরীতে কয়েকবছর থাকার পর বৃন্দাবনের আকর্ষণ তীব্র হওয়ায় ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে গৌড়দেশ হয়ে মাকে দর্শন করে বৃন্দাবনে যাবেন। তিনি গৌড়ে (বাংলাদেশ) এসে রামকেলি গ্রামে অবস্থান করলেন, সঙ্গে হাজার হাজার ভক্ত। তাঁকে দর্শন করবার জন্যে আরও হাজার হাজার লোক আসতে লাগল। সকলেই ইচ্ছা প্রকাশ করতে লাগল যে তারাও তাঁর সঙ্গে বৃন্দাবনে যাবে। রাজ-অমাত্য রূপ ও সনাতনের সঙ্গে সেখানে চৈতন্যদেবের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ঘরে ফিরে যাওয়ার সময়ে সনাতন হেঁয়ালী করে চৈতন্যদেবকে বললেন,

'যার সঙ্গে হয় এই লোক লক্ষ কোটি।
বৃন্দাবন যাবার এই নহে পরিপাটি॥ (চৈঃ চঃ মধ্য)

পরদিন চৈতন্যদেব ভক্তজনসহ নাটশালা গ্রামে উপস্থিত হলেন। রাত্রি-কালে হঠাৎ তাঁর মনে হলো—'সনাতন তো আমাকে এত লোকজন সহ বৃন্দাবন যেতে নিষেধ করলে, তাই করাই তো ঠিক। আমি যেন সৈন্যদল সহ ঢাক বাজিয়ে বৃন্দাবন চলেছি। ধিক আমাকে।' এই চিন্তা করে চৈতন্য-দেব সকল ভক্তজনকে ঘরে ফিরে যেতে বললেন। তিনি নিজেও নীলাচলে ফিরে এলেন। এর কিছুকাল পরে তিনি একমাত্র ভক্ত ও সেবক বলভদ্র ভট্টাচার্য সহ বনের পথে বৃন্দাবন রওনা হন। বনপথে যেতে যেতে যে আনন্দ পেয়েছিলেন তার উল্লেখ করে একদিন তিনি বলভদ্রকে বলেন,

'কৃষ্ণ কৃপালু আমায় বহু কৃপা কৈল।
বনপথে আনি আমায় বড় সুখ দিল॥
পূর্বে বৃন্দাবন যাইয়ে করিতাম বিচার।
মাতা গঙ্গা ভক্তগণ দেখিব একবার॥···
ভক্তগণ লঞা তবে চলিলাম রঙ্গে।
লক্ষ কোটি লোক তাহা হৈল আমা সঙ্গে॥

সনাতন মুখে কৃষ্ণ আমা শিক্ষা দিলা।
তাহা বিঘ্ন করি বনপথে লঞা আইলা ॥' (চৈঃ চঃ মধ্য)

পূর্বে সনাতন লোকজন সহ বৃন্দাবনে যেতে যে নিষেধ করেছিলেন, তা যেন প্রভুই তার মুখ দিয়ে এই বার্তা পাঠিয়েছিলেন। চৈতন্যদেব তাই এখানে মাহুত-নারায়ণের কথা শুনে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সত্যের ওপর ভয়ানক আঁট ছিল। তিনি বলতেন, 'সত্য কথা কলির তপস্যা।' 'বলে ফেলেছি, তিনটের সময় যাব, তাই আসছি। কিন্তু ভারী ধূপ।' 'মাকে যে কালে বলেছি খাব না, আর খাওয়া হবে না।' 'যদি বলি ঝাউতলায় আমার গাড়ু নিয়ে অমুক লোকের যেতে হবে —আর কেউ গেলে তাকে আবার ফিরে যেতে বলতে হবে। একি হলো বাপু! এর কি কোন উপায় নেই!'···ইত্যাদি

কথামৃতের একদিনের একটি ছোট্ট ঘটনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হচ্ছে (৩।১৪।৪)—

'আজ সন্ধ্যার পর ঠাকুরের কলিকাতায় যাইবার কথা আছে। ঝাউতলা থেকে ফিরিবার সময় মাষ্টারকে বলিতেছেন, 'তাই তো কার গাড়ীতে যাই।'

'সন্ধ্যা হইয়াছে। ঠাকুরের ঘরে প্রদীপ জ্বালা হইল ও ধুনা দেওয়া হইতেছে।···ছোট খাটটিতে বসিয়া ঠাকুরদের নাম কীর্তনান্তর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মার ধ্যান করিতেছেন। আরতি হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর এদিক ওদিক ঘরে পায়চারি করিতেছেন ও ভক্তদের সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা কহিতেছেন। আর কলিকাতায় যাইবার জন্য মাস্টারের সঙ্গে পরামর্শ করিতেছেন।

এমন সময় নরেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত। সঙ্গে শরৎ ও আরো দুই একটি ছোকরা। তাহারা আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

নরেন্দ্রকে দেখিয়া ঠাকুরের স্নেহ উথলিয়া পড়িল। যেমন কচি ছেলেকে আদর করে, ঠাকুর মুখে হাত দিয়া আদর করিতে লাগিলেন ও স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন, 'তুমি এসেছ!'

'ঘরের মধ্যে পশ্চিমাস্য হইয়া ঠাকুর দাঁড়াইয়া আছেন। নরেন্দ্র আর কয়টি ছোকরা ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া পূর্বাস্য হইয়া তাঁহার সম্মুখে কথা কহিতেছেন। ঠাকুর মাষ্টারের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিতেছেন, 'নরেন্দ্র এসেছে, আর যাওয়া যায়? লোক দিয়ে নরেন্দ্রদের ডেকে পাঠিয়েছিলাম। আর যাওয়া যায়? কি বল?'

মাষ্টার—যে আজ্ঞা, তবে আজ থাক।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা কাল যাব, হয় নৌকায় নয় গাড়ীতে। (অন্যান্য ভক্তদের প্রতি) তোমরা তবে এসো আজ, রাত হলো।

ভক্তেরা সকলে একে একে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।'

এখানে শ্রীশ্রীঠাকুর কি সত্যের আঁট থেকে ভঙ্গ হলেন? তাঁর যে সেদিন কলকাতায় যাবার কথা ছিল।

আর একদিনের ঘটনায় পাই (কথামৃত ৩।১৭।১)—

'শ্রীরামকৃষ্ণ—বড় গরম পড়েছে। একটু একটু বরফ খেয়ো। আমারও বাপু বড় গরম পড়ে কষ্ট হয়েছে। গরমেতে কুল্পী বরফ—এই সব খাওয়া হয়েছিল। তাই গলায় বীচি হয়েছে। গয়ারে এমন বিশ্রী গন্ধ দেখি নাই। মাকে বলেছি, মা, ভাল করে দাও, আর কুলপি খাব না। তারপর আবার বলেছি, বরফও খাব না···

একজন ভক্ত বরফ আনিয়াছেন। ঠাকুর পুনঃপুনঃ মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হাঁগা, খাব কি?

মাষ্টার বিনীতভাবে বলিতেছেন, আজ্ঞা, তবে মার সঙ্গে পরামর্শ না করে খাবেন না।

ঠাকুর অবশেষে বরফ খাইলেন না।'

অপর একদিনের ঘটনা (কথামৃত ২।১৩।২)—

'শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রাণকৃষ্ণাদি ভক্তের প্রতি)—'আমার সত্য কথার আঁট এখন তবু একটু কমেছে, আগে ভারী আঁট ছিল। যদি বলতুম, 'নাইবো', গঙ্গায় নামা হলো, মন্ত্রোচ্চারণ হলো, মাথায় একটু জলও দিলুম, তবু সন্দেহ হলো, বুঝি পুরো নাওয়া হলো না। অমুক জায়গায় হাগতে যাব,

তা সেখানেই যেতে হবে। রামের বাড়ী গেলুম কলকাতায়। বলে ফেলেছি, লুচি খাবো না। যখন খেতে দিলে, তখন আবার খিদে পেয়েছে। কিন্তু লুচি খাবো না বলেছি, তখন মেঠাই দিয়ে পেট ভরাই। (সকলের হাস্য)।'...

'এখন তবু একটু আঁট কমেছে। বাহ্যে পায়নি, যাবো বলে ফেলেছি, কি হবে? রামকে (রাম চাটুজ্যে, রাধাকান্তের সেবক) জিজ্ঞাসা করলুম। সে বললে, গিয়ে কাজ নাই। তখন বিচার কল্লুম, সব তো নারায়ণ। রামও নারায়ণ। ওর কথাটাই বা না শুনি কেন? হাতি নারায়ণ বটে, মাহুতও নারায়ণ। মাহুত যে কালে বলছে, হাতির কাছে এসো না, সেকালে মাহুতের কথা না শুনি কেন? এই রকম বিচার করে আগেকার চেয়ে একটু আঁট কমেছে।'

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের এই উদাহরণ থেকে পাওয়া যাচ্ছে যে, 'হাতি-নারায়ণ মাহুত-নারায়ণে'র শিক্ষা থেকে তিনি কোনো কোনো সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। তাঁর কামনা বাসনা ছিল না, কোনো সংকল্প যেমন নিজে করতে পারতেন না, তেমনি নিজে বিচার বিবেচনা করে অহংবুদ্ধিতে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না। তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণের কৌশল ছিল, যদি তা একান্ত দরকার হতো—তাঁর নিকটে উপস্থিত ভক্তদের মতামত নিয়ে কাজ করা।

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন, 'এমনি অবস্থায় রেখেছে যে, যে ব্যক্তি কাছে থাকবে তার কথা শুনতে হয়।'

কথামৃতে অন্যত্র বলেছেন (৩।১৪।৪)—'নাটক শুনবার জন্যে আমি যেখানে বসেছি (কেশব সেনের বাড়িতে) তারা (ডেপুটি ও তাঁর ছেলে) আমার পাশে বসেছে। রাখাল তখন একটু উঠে গিছলো। ডেপুটি এসে ঐখানে বসলো। আর তার ছোট ছেলেটিকে রাখালের জায়গায় বসালে। আমি বললুম, এখানে বসা হবে না,—আমার এমনি অবস্থা যে, কাছে যে বসবেসে যা বলবে তাই করতে হবে, তাই রাখালকে কাছে বসিয়ে-ছিলাম।'

বরফ খাবো কিনা—এ বিষয়ে মাষ্টার মশায়ের সম্মতি না পেয়ে মাহুত নারায়ণের কথা ভেবে বরফ না খাওয়ারই সিদ্ধান্ত করলেন। তেমনি 'বাহ্য যাব' বলে ফেলেছেন অথচ সত্যের আঁট রাখতে গেলে বাহ্যে যেতে হয়, কিন্তু প্রয়োজন নেই—তাই সামনে উপস্থিত রামলাল চাটুজ্যের মতামত নিয়ে মাহুত নারায়ণের কথা ভেবে আর বাহ্যে গেলেন না। নরেন্দ্র কলকাতা থেকে আসায় মাহুত নারায়ণ হিসাবে মাষ্টার মশায়ের মত নিয়ে পূর্ব নির্ধারিত কলকাতা যাওয়া বন্ধ করলেন।

তিনি বলেছেন, 'শুদ্ধ মনে যা ওঠে সে তাঁরই কথা এবং তিনিই মাহুত নারায়ণ।' তাই সত্য থেকে তিনি মোটেই ভ্রষ্ট হন নি। স্ব-ইচ্ছায় তিনি করেন নি, মাহুত নারায়ণের ইচ্ছায় চালিত হয়ে পূর্বেকার ইচ্ছাকে বাতিল করে দিলেন মাত্র। অবশ্য পূর্বেকার ইচ্ছা হয়তো অতি সাধারণ ইচ্ছাই ছিল যার সঙ্গে কোনো কামনা বাসনা যুক্ত নেই, যেমন, 'লুচি খাব না', 'বাহ্যে যাব'—অথবা পূর্বের ইচ্ছা নিজের অহং দ্বারা পরিচালিত ইচ্ছা নয়, কোন প্রেরণা, ইঙ্গিত বা অপরের ইচ্ছার দ্বারা প্রকাশিত ইচ্ছা মাত্র ছিল। তাহলেও কথার সত্যতা রক্ষায় তিনি তৎপর ছিলেন—সেজন্য ঈশ্বর-নির্ভরশীলতা বা শরণাগতিতে সতত অবস্থিত তাঁর সত্যের আঁট কম মনে হলেও প্রকৃত সত্য রক্ষাই তাঁর হয়েছে।

শরণাগতির সাধকের 'হাতি-নারায়ণ মাহুত-নারায়ণের' ভাবাশ্রয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি বিশেষ ইঙ্গিত বা উত্তম পথের সন্ধান এ থেকে পাওয়া যায়। এ দ্বারা ঈশ্বরের ইচ্ছায় নিজের ইচ্ছাকে মিলিয়ে দিতে পারা যায়, শরণাগতিকে অবলম্বন করে অনেক সমস্যারও সমাধান হয়।

তবে একটি কথা আছে—মাহুতরূপী অপরের মতামত বা অভিপ্রায় যখন আসে তখন একটু বিচার করে দেখা দরকার যে সে অভিমত নীতি বা আদর্শ বিরোধী কিনা। যদি তা হয় তবে সেরূপ মতামত বর্জন করা যেতে পারে। প্রলোভন বা পরীক্ষা রূপে এরূপ অভিমত এসে বিপথগামী করে দিতে পারে। এজন্যে সজাগ থাকা দরকার, একটু বিচার প্রয়োজন। আদর্শ ও নীতিবোধই ক্রমে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যেতে পারে—তা থেকে

বিচ্যুত হওয়া উচিত নয়।

কোনো এক ঘটনায় বিপদের সম্ভাবনা দেখে একজন শিক্ষককে প্রতিবেশী কয়েকজন এসে বললেন, আপনি এ সময় কিছুদিনের জন্যে বাইরে চলে যান—নতুবা সাংঘাতিক বিপদ আসতে পারে, জীবন সংশয় হতে পারে। শিক্ষক বললেন, আমি কোনো অন্যায় করি নি, অসত্য পথেও চলি নি। আর, বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতিতে জীবনের মূল্য কিছুই নেই—যে কোনো সময় যে কেউ মৃত্যুর সম্মুখীন হতে পারে। কাজেই ভয়ে আমি কোথাও পালিয়ে যাব না।

শিক্ষক মশায়ের দৃঢ়তা ও আদর্শবোধ দেখে আর কারো কিছু বলার রইল না। তিনি এখানে মানুষ নারায়ণকে উপেক্ষা করেন নি, কিন্তু আদর্শ-বোধকে শুধু বেঁচে থাকার চেয়ে উচ্চ মূল্য দিয়েছেন মাত্র।

শরণাগতি সাধকের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতির প্রশ্নে একজন প্রবীণ সাধু মহারাজ বলেন, 'কোন সিদ্ধান্ত নিতে হলে শান্ত হয়ে একটু ভেবেচিন্তে ধ্যান করে পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া ভাল।'

প্রশ্ন ঃ কোন জরুরী ব্যাপারে ভেবেচিন্তে ধ্যান করে নিতে তো সময় লাগবে, অথচ সে সময় হয়তো মোটেই নেই—সেক্ষেত্রে কী হবে?

উঃ এক্ষুনি কোন সিদ্ধান্ত নিতে হলে ভগবানের নাম করে একটু বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। অন্য যারা কাছে আছে তাদের সঙ্গে পরামর্শও করা যেতে পারে।

অপরের সঙ্গে পরামর্শ করা, অপরের মতামত নেওয়া, অধিকাংশের মত অনুসারে কাজ করা—এর মধ্যে 'হাতি নারায়ণ মানুষ নারায়ণ' পদ্ধতির ইঙ্গিত রয়েছে। সে দিক থেকে বিচার করলে 'গণতান্ত্রিক' পন্থাই শরণাগতির সাধনার বিশেষ পন্থা হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

স্বামী বিবেকানন্দ রচিত 'বেলুড় মঠের নিয়মাবলী'তে দেখা যায় যে স্বামীজী মঠের পরিচালনা ইত্যাদিব ব্যাপারে অধিকাংশের মত অর্থাৎ 'গণতান্ত্রিক' পদ্ধতি অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন, 'একীভূত সংঘ যে আদেশ করেন তাহাই প্রভুর আদেশ।'

মঠের অধিকাংশের যা মতামত তাই সংঘের বা মঠের আদেশ এবং এই ঠাকুরের ইচ্ছা বা অভিপ্রায়।

অতএব বিচার বিবেচনা দ্বারা যেখানে সাধারণ প্রায় সকল মানুষকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় সেখানে তাঁর ইচ্ছা অনুসারেই তা করা হচ্ছে এই ভাবটি ফুটিয়ে তুলতে পারলেই ঈশ্বর নির্ভরশীলতা সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে।

৭

শরণাগতির দর্শন

ছান্দোগ্য উপনিষদে উদ্দালক ঋষি শ্বেতকেতুকে বলছেন (৬।৮।২)—'সূতা দিয়ে বাঁধা পাখী যেমন চতুর্দিকে উড়েও কোথাও আশ্রয় না পেয়ে অবশেষে বন্ধনস্থানকেই আশ্রয় করে, ঠিক তেমনি জীব স্বপ্ন ও জাগরণে চারদিকে বিচরণ করে অন্য কোথাও আশ্রয় না পেয়ে পরমাত্মাকেই আশ্রয় করে। কারণ পরমাত্মাই প্রকৃত আশ্রয়স্থান।'

পরমাত্মা বা ব্রহ্মই বিশ্বের সর্বশেষ তত্ত্ব, অর্থাৎ এই জীব-জগৎ ব্রহ্ম থেকেই জাত, তাঁতেই জীবিত এবং তাঁতেই লীন হয়। তিনিই সকলের নিয়ন্তা, আশ্রয় ও পরম কারণ। শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে সেই কথাই বলা হয়েছে (৩-১৭)—'তিনি নিখিল ইন্দ্রিয়ের গুণবিশিষ্টরূপে প্রতিভাত হলেও তিনি সমুদয় ইন্দ্রিয়ব্যাপার শূন্য। তিনি সকলেরই শক্তিশালী নিয়ন্তা, সকলের আশ্রয় (শরণ) এবং পরম কারণ।'

মুণ্ডক উপনিষদেও বলা হয়েছে (৩।২।১)—'যে ব্রহ্মে সমস্ত জগৎ সমর্পিত রহিয়াছে এবং যিনি নির্মল জ্যোতিতে প্রকাশ পান, আত্মজ্ঞ পুরুষ পরম আশ্রয় সেই ব্রহ্মকে জানেন।'

গীতায় ও পুরাণাদি শাস্ত্রে যিনি পরম পুরুষ তিনি যে নামেই অভিহিত হোন না কেন, তিনিই সমস্ত জগতের আশ্রয়-স্বরূপ বলে বর্ণিত হয়েছেন। গীতায় তিনি পরম ধাম, বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণু সমস্ত মঙ্গলের আধার, যোগীদের চিত্তের ও সর্বব্যাপী আত্মার আশ্রয়। ভাগবতপুরাণে আশ্রয়স্বরূপ পরম সত্য স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। ব্রহ্মসংহিতাতে গোবিন্দই সমগ্র জগতের আশ্রয়রূপে বর্ণিত হয়েছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবে-দৃষ্টিতে মাধুর্যসর্বস্ব ভগবানই সকলের আশ্রয়, তিনিই পরম

গতি। চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণতত্ত্ব ব্যাখ্যায় বলেছেন—

কৃষ্ণ এক সর্বাশ্রয়, কৃষ্ণ সর্বধাম।
কৃষ্ণের শরীরে সর্ব বিশ্বের বিশ্রাম॥

এই পরমতত্ত্বকে বা পরমাশ্রয়কে আশ্রয় করাকে কেন্দ্র করে একটি আশ্রয়-তত্ত্ব বা দর্শন গড়ে উঠেছে। এই আশ্রয় বা শরণাগতিকে ভাগবতধর্মে এক প্রকার ভক্তি বলা হয়েছে। ভক্তি নিয়ে নানা দার্শনিক তত্ত্ব নিরূপিত হয়েছে, যার ফলে নানা দার্শনিক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রাচীন ভাগবত মতেও ভক্তির তাত্ত্বিক আলোচনা হয়েছে। ভক্তির একটি পথ হিসাবেও শরণাগতির নিশ্চয়ই তাত্ত্বিক ভিত্তিভূমি রয়েছে। ভক্তি ও শরণাগতি নিয়ে আলোচনা করে কয়েকজন মনীষী ও আচার্য শরণাগতির দার্শনিক দিক সম্বন্ধে যা বলেছেন তা উল্লেখ করা হলো। শরণাগতির তত্ত্ব এ থেকেই পরিস্ফুট।

স্বামী বিদ্যারণ্য 'ভাগবতধর্মের প্রাচীন ইতিহাস (১ম)' গ্রন্থে বলেছেন—'এই শরণাগতিবাদের মূলে নিহিত যে দার্শনিক তত্ত্ব—মানুষ স্বয়ং কিছু করে না, ঈশ্বর তাহাকে দিয়া যাহা করায় সে তাহাই করে, সে ঈশ্বরের হাতের কাঠপুতুল-মাত্র, ঈশ্বর তাহাকে সর্বপাপ হইতে মুক্ত করিতে পারে।···ভাগবত ধর্মের মূল দার্শনিক সিদ্ধান্ত এই যে—পরমতত্ত্ব ব্রহ্ম বা পরমাত্মা নির্গুণ। নির্গুণ বলিয়া তিনি নিষ্ক্রিয়, অকর্তা এবং নির্লেপ বা অসঙ্গ।···উহা সম্পূর্ণ দৃষ্টি, পরমার্থ সত্য। পরন্তু এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সম্পর্কে,—মানুষের দিক হইতে ঐ পরমতত্ত্ব নির্গুণ ব্রহ্ম বা পরমাত্মা সগুণ ঈশ্বর বলিয়া প্রতীত হন,—তিনি জগতের সৃষ্ট্যাদি কর্তা বলিয়া নিরূপিত হন। ঐ ঈশ্বরতত্ত্বকে অবলম্বন না করিয়া প্রকৃত ব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত হওয়া যায় না। তাই ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞাপন করিতে গিয়া বেদান্তশাস্ত্র 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' বলিয়া তাঁহার লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন। যতক্ষণ জগতের বোধ থাকে, উহার ব্যবহার থাকে ততক্ষণ ব্রহ্ম ঈশ্বর বলিয়া প্রতীতিগোচর হইয়া থাকেন। ঐ ব্যবহারভূমিতে জীবেরও কর্তৃত্ব থাকে। তাই বেদান্তসূত্রে বলা হইয়াছে যে 'কর্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ'। ঐ কর্তৃত্ববোধ জীবের স্বাভাবিক সংস্কারগত।

পরন্তু প্রকৃত দার্শনিক সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্রহ্মের কর্তৃত্ব যেমন বাস্তব নহে, তেমন জীবের কর্তৃত্বও বাস্তব নহে, অজ্ঞানবশতই ঐ কর্তৃত্ব আছে বলিয়া মনে হয়।···ঐ কর্তৃত্বাভিমান বিদূরিত না করিলে প্রকৃততত্ত্বের বোধ হইতে পারে না। কি জ্ঞানযোগী, কি কর্মযোগী, বা কি ভক্তিযোগী-কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ—অকর্তৃত্ববোধ সকলেরই ইষ্ট। জ্ঞানযোগী ও কর্মযোগী ব্রহ্মতত্ত্বের বিচার দ্বারা অথবা সাংখ্য বেদান্তের প্রকৃতিবাদের সহায়ে বিচারদ্বারা তাহা পরিত্যাগ করেন। আর ভক্তিযোগী তদর্থে মনে করেন যে সর্বকর্তৃত্ব ঈশ্বরেরই, মানুষের নিজের কোন কর্তৃত্ব নাই। ঈশ্বরই তাহাকে দিয়া কর্ম করাইতেছেন, সে নিজে কোন কর্ম করে না। এই প্রকার দৃঢ় ভাবনা দ্বারাও কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যক্ত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। এবং তাহাতে অনহংকারিতা, অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব, ইষ্টানিষ্ট প্রাপ্তিতে সমচিত্ততা প্রভৃতি জ্ঞান-সাধনও সিদ্ধ হইয়া যায়। সুতরাং ঐ মতবাদ এক সুন্দর কৌশল।'

স্বামী বিদ্যারণ্য আরও বলেছেন (ঐ, ২য়)—'ভক্তির চরম অভিব্যক্তি প্রপত্তি বা ভগবানের শরণাগতি। আত্মসমর্পণেই অর্থাৎ অহন্তামমতাকে, বা যাহা আমি এবং যাহা কিছু 'আমার', তৎসমস্তকে ভগবানে সমর্পণই শরণাগতির পরিপূর্ণতা। যামুন বলেন, ভগবানের স্বরূপ প্রকৃত (বা মায়া) দ্বারা তিরোহিত আছে। শরণাগতির দ্বারা সেই তিরোধানের নিবৃত্তি হয়। অবশ্য তিনি এখানে কৃষ্ণের বাণীরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। কৃষ্ণ বলেন, ত্রিগুণ মায়া দ্বারা মোহিত হইয়া লোক তাহার স্বরূপ যথার্থতঃ জানিতে পারে না। যাহারা তাঁহার শরণ গ্রহণ করে তাহাবা ঐ মায়া উত্তীর্ণ হয়। সুতরাং তাহাকে যথার্থতঃ জানিতে সক্ষম হয়। নিখিল অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে এবং নিজেকে 'পরানুগ' (ভগবানের পরম অনুগত ভৃত্য) বলিয়া উপলব্ধি করিলেই পরাভক্তি লাভ হয়। একমাত্র উহারই দ্বারা মনুষ্য পরমপদ প্রাপ্ত হয়।'

শরণাগতির তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অপর একটি দিক থেকে স্বামী বিদ্যারণ্য বলেছেন (ঐ, ৪র্থ)—'প্রাচীন ভাগবতধর্মের দেবতোপসনার

মূলে এই তত্ত্ব নিহিত আছে যে 'বাসুদেবঃ সর্বম্' ।···বাসুদেব সর্ব, সর্বরূপ, বিশ্বরূপ, বিশ্বমূর্তি বা 'সর্বাত্মক'। সুতরাং সর্ব,—অতএব মনুষ্য, প্রকৃতপক্ষে বাসুদেবেরই রূপ কিংবা বাসুদেবই। সুতরাং মানুষ কিংবা যে কোনো প্রাণী যাহা কিছু করে, তাহা প্রকৃতপক্ষে বাসুদেবই করে। ঐ দৃষ্টিতে বাসুদেবই একমাত্র কর্তা, আর মানুষ বা প্রাণী বাসুদেবের করণ। মানুষকে কেহ কেহ বাসুদেবের অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গরূপে, আর কেহ কেহ ভৃত্যাদিরূপে করণ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। যাহাই হোক না কেন, ঐরূপে ঈশ্বরকে প্রকৃত কর্তা এবং নিজেকে তাঁহার করণ মাত্র বলিয়া বুদ্ধি করিলে মানুষের স্বকৃত কর্ম ঈশ্বরেরই কর্ম হয়। উহাই 'গীতার' মতে ঈশ্বরে কর্ম-সমর্পণ। শঙ্কর রামানুজাদি গীতা-ভাষ্যকারগণ তাহাই বলিয়াছেন। 'গীতা'য় কৃষ্ণ বলিয়াছেন, 'ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্ম-চেতসা' (অধ্যাত্মবুদ্ধিতে সর্ব কর্ম আমাতে সম্যক প্রকারে ন্যাস বা অর্পণ করতঃ')। আচার্য শঙ্কর উহাকে এই প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 'সকল কর্ম সর্বজ্ঞ ও সর্বাত্মা পরমেশ্বর বসুদেব আমাতে অধ্যাত্মচিত্তে বিবেকবুদ্ধিতে (অর্থাৎ) কর্তা আমি ভৃত্যবৎ (সর্ব কর্ম) করিতেছি—এই বুদ্ধিতে সংন্যাস করিয়া অর্থাৎ নিক্ষেপ করিয়া'। আচার্য রামানুজ বলিয়াছেন, 'শ্রুতি ও স্মৃতি এই (জীব) আত্মাকে পরম-পুরুষ প্রবর্ত্য—তাঁহার শরীরভূত, আর পরমপুরুষকে প্রবর্তয়িতা বলেন', '···অতএব আমার শরীররূপে আমারই দ্বারা প্রবর্ত্য বলিয়া আত্মস্বরূপ অনুসন্ধান দ্বারা সর্বকর্ম 'আমারই দ্বারা ক্রিয়মাণ বলিয়া আমাতে সন্ন্যাস করিয়া।' এইরূপে দেখা যায়, গীতোক্ত ঈশ্বরে কর্মসমর্পণের বা ঈশ্বরার্থ কর্মকরণের মূলেও এই তত্ত্ব নিহিত আছে যে 'বাসুদেবঃ সর্বম্'।'

মধুসূদন সরস্বতী বলেছেন, 'গুহ্যতম জ্ঞান হইল ধর্মাধর্মের উপরের ভূমি—ইহা ভগবদেকশরণতা, ইহাই শুদ্ধ জ্ঞান, ইহা পরাভক্তিগম্য সর্বোচ্চজ্ঞান। ···ইহা শ্রেষ্ঠ স্তব। এখানে বিচার নাই—'বিমৃশ্য কুরু' নহে। এখানে কেবল শরণাগতি।···এখানে কেবল প্রপন্নতা।'

স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্য 'আত্মনিবেদন' প্রবন্ধে লিখেছেন, 'এই আত্ম-

নিবেদন-বাদের দার্শনিক ভিত্তি বিচার করিয়া দেখিলে এইরূপ দেখা যায়। প্রথমতঃ দ্রষ্টব্য, নিবেদন করিতে হইলে নিবেদক ও নিবেদ্য চাই। নিবেদক ও নিবেদ্য এক হইতে পারে না। নিবেদক কে তাহা বিচার করিয়া দেখিলে বলিতে হইবে যে, সমস্ত অভিমেয় দ্রব্যশূন্য বা অভিমানশূন্য যে আত্মভাব বা দ্রষ্টৃস্বরূপ পুরুষ যাঁহার 'ভাসা সর্বমিদং বিভাতি' তাঁহাতেই শেষ নিবেদকত্ব অর্শায় অর্থাৎ তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই ব্যবহারিক নিবেদক (বা গ্রহীতা) ব্যবহার্য সমস্ত আত্মভাবরূপ নিবেদ্যকে নিবেদন করিতে থাকে, যাবৎ পর্যন্ত নিবেদ্য শেষ না হয়।

'উপাস্য দেবতা দ্বিবিধ। সাধারণ আমিত্বের মূল পরম পুরুষ বা চরম আত্মা (ইনি জ্ঞানযোগী সাংখ্যদের উপাস্য) এবং মুক্তপুরুষ ঈশ্বর (শংকরাচার্যের মতে নিত্যসত্ত্বোপাধিক ঈশ্বর)। শংকর বলেন (শারীরক ৪।৩।২২), 'সম্যক দর্শনের দ্বারা অজ্ঞান বিধ্বস্ত হইয়াছে এরূপ মহাত্মাদের অনাবৃত্তিরূপ মুক্তি ত সিদ্ধ আছে। আর সেইরূপ সগুণ বা সত্ত্বোপাধিক ঈশ্বরের শরণাগতদেরও হইয়া থাকে।' প্রথমোক্ত উপাস্যকে আত্মবুদ্ধির ভিতরে বা নিজের ভিতরে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা প্রথম হইতেই করিতে হয়। দ্বিতীয়রূপ উপাস্য যে ঈশ্বর তাঁহাকে প্রথমে আত্মবাহ্যরূপে ভক্তিপূর্বক প্রণিধান করিতে করিতে শেষে আত্মসংস্থায় উপনীত হইতে হয়।···এইরূপে দেখা গেল যে, ঐ দ্বিবিধ নিষ্ঠাতেই আত্মনিবেদনের শেষ ফল ব্যবহারিক নিবেদকের যাহা চরম আত্মা চিদ্রূপ পুরুষ তাঁহাতেই স্থিতি। এই স্থিতির জন্যই সমস্ত অনাত্মভাবকে নিবেদন করিয়া ত্যাগ করাই আত্মনিবেদনের উদ্দেশ্য হইল।'

স্বামী বিবেকানন্দ 'শরণাগতির' মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন (বাণী ও রচনা ৪র্থ),—'সমষ্টিকে ভালবাসিলেই সমুদয় জগতকেই ভালবাসা হইল।···ভগবৎপ্রেম আসিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিশ্চিত ফলস্বরূপ সর্বভূতে প্রেম আসিবে।···এইরূপে প্রগাঢ় ভক্তির অবস্থায় সর্বপ্রাণীই আমাদের উপাস্য হইয়া পড়ে। সর্বভূতে হরিকে অবস্থিত জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি সকলকে অবিচলিতভাবে ভালবাসেন।

"এইরূপ প্রগাঢ় সর্বব্যাপক প্রেমের ফল পূর্ণ আত্মনিবেদন ও অপ্রাতিকূল্য। এ অবস্থায় দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, সংসারে যাহা কিছু ঘটে তাহার কিছুই আমাদের অনিষ্টকর নয়। তখনই সেই প্রেমিক পুরুষ দুঃখ আসিলে বলিতে পারেন, 'স্বাগত দুঃখ'। কষ্ট আসিলে বলিতে পারেন, 'স্বাগত কষ্ট', তুমিও আমার প্রিয়তমের নিকট হইতে আসিতেছ।

'ভগবান ও যাহা কিছু তাঁহার—সেই সকলের প্রতি প্রগাঢ় প্রেম হইতে প্রসূত এই পূর্ণ নির্ভরতার অবস্থায় ভক্তের নিকট সুখ-দুঃখের বিশেষ প্রভেদ থাকে না। তিনি তখন দুঃখকষ্টের জন্য আর অভিযোগ করেন না। আর প্রেমস্বরূপ ভগবানের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা অবশ্যই মহা-বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপজনিত যশোরাশি অপেক্ষা অধিকতর বাঞ্ছনীয়।

'যদি নিশ্চিতভাবে জানো যে তুমি শরীর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, তবে এই জগতে এমন কিছু নাই, যাহার সহিত তোমার বিরোধ উপস্থিত হইবে। তখন তুমি সর্বপ্রকার স্বার্থপরতার অতীত হইয়া গেলে। এইজন্য ভক্ত বলেন, 'আমাদিগকে জগতের সকল পদার্থ সম্বন্ধে মৃতবৎ থাকিতে হইবে' এবং ইহাই বাস্তবিক আত্মসমর্পণ—শরণাগতি। 'তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক'—এই বাক্যের অর্থই ঐ আত্মসমর্পণ বা শরণাগতি।

'স্বার্থের জন্য সংগ্রাম করা এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে করা—ভগবানের ইচ্ছাতেই আমাদের দুর্বলতা ও সাংসারিক আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়া থাকে—ইহা নির্ভরতা নয়।···প্রকৃত ভক্ত নিজের জন্য কখন কিছু ইচ্ছা করেন না বা কোন কার্য করেন না।

'যিনি একবার এই অবস্থার আস্বাদ পাইয়াছেন, তাঁহার নিকট এই প্রিয়তম প্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ জগতের সমুদয় ধন, প্রভুত্ব, এমন কি মানুষ যতদূর মান যশ ও ভোগসুখের আশা করিতে পারে, তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীত হয়। ভগবানে নির্ভরজনিত 'এই শান্তি আমাদের বুদ্ধির অতীত' ও অমূল্য। আত্মসমর্পণ হইতে এই অপ্রাতিকূল্য অবস্থা লাভ হইলে সাধকের আর কোন স্বার্থ থাকে না।···এই পরম নির্ভরের অবস্থায় সর্বপ্রকার আসক্তি সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয়, কেবল সেই

সর্বভূতের অন্তরাত্মা ও আধারস্বরূপ ভগবানের প্রতি সর্বাবগাহী ভালবাসা অবশিষ্ট থাকে। ভগবানের প্রতি এই আসক্তি জীবাত্মার বন্ধনের কারণ নয়, বরং উহা নিঃশেষে সর্ববন্ধন মোচন করে।'

বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে তিনি মতলব করে কোনো কাজ করেন না। এর তত্ত্বটি কী? 'স্বামি-শিষ্য সংবাদে' সে বিষয়টি বুঝিয়ে বলেছেন—

'আচার্য শংকর জ্ঞান কর্ম সমুচ্চয়কে খণ্ডন করে' আবার জ্ঞান বিকাশ কল্পে কর্মকে আপেক্ষিক সহায়কারী এবং সত্ত্বশুদ্ধির উপায় বলে নির্দেশ করেছেন। তবে শুদ্ধজ্ঞানে কর্মের অনুপ্রবেশ নেই—ভাষ্যকারের এ সিদ্ধান্তের আমি প্রতিবাদ করছি না। ক্রিয়া, কর্তা ও কর্মবোধ যতকাল মানুষের থাকবে, ততকাল সাধ্য কি—সে কাজ না করে বসে থাকে? অতএব কর্মই যখন জীবের স্বভাব হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তখন যে-সব কর্ম এই আত্মজ্ঞান বিকাশ কল্পে সহায়ক হয়, সেগুলি কেন করে যা না?

'কর্মমাত্রই ভ্রমাত্মক—এ কথা পারমার্থিকরূপে যথার্থ হলেও ব্যবহারে কর্মের বিশেষ উপযোগিতা আছে। তুই যখন আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করবি, তখন কর্ম করা বা না করা তোর ইচ্ছাধীন হয়ে দাঁড়াবে। সেই অবস্থায় তুই যা করবি, তাই সৎকর্ম হবে। তাতে জীবের, জগতের কল্যাণ হবে। ব্রহ্মবিকাশ হলে তোর শ্বাস-প্রশ্বাসের তরঙ্গ পর্যন্ত জীবের সহায়কারী হবে। তখন আর plan (মতলব) এঁটে কর্ম করতে হবে না। বুঝলি?'

নিজের ইচ্ছাকে ভগবদিচ্ছায় রূপান্তর—শরণাগতির একটি বড় সাধন। এর পেছনে যে তত্ত্ব নিহিত, স্বামী বিবেকানন্দ 'পত্রাবলী'তে এক চিঠির জবাবে তা উল্লেখ করেছেন—

'ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে তোমার প্রশ্নটি বড়ই সুন্দর এবং ঐটিই বুঝিবার বিষয়। সকল ধর্মের ইহাই সার—বাসনার বিনাশ। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয় ইচ্ছারও বিনাশ হইল। কারণ বাসনা ইচ্ছা-বিশেষের নামমাত্র। তবে আবার এ জগৎ কেন? এ সকল ইচ্ছার বিকাশই বা কেন? কয়েকটি ধর্ম বলেন যে, অসদিচ্ছারই নাশ হওয়া উচিত, সতের নহে। বাসনাত্যাগ ইহলোকে পরলোকে ভোগের দ্বারা পরিপূরিত হইবে। এ উত্তরে অবশ্যই

পণ্ডিতেরা সন্তুষ্ট নহেন। বৌদ্ধাদি অপর দিকে বলিতেছেন যে, বাসনা দুঃখের মূল, তাহার নাশই শ্রেয়। কিন্তু মশা মারিতে মানুষ মারার মতো বৌদ্ধাদি মতে দুঃখ নাশ করিতে নিজেকেও নাশ করিয়া ফেলিলাম।

'সিদ্ধান্ত এই যে, যাহাকে আমরা ইচ্ছা বলি, তাহা তদপেক্ষা আরও উচ্চতর অবস্থার নিম্ন পরিণাম। নিষ্কাম মানে ইচ্ছাশক্তিরূপে নিম্ন পরিণামের ত্যাগ এবং উচ্চ পরিণামের আবির্ভাব। ঐরূপ (অবস্থা) মনোবুদ্ধির অগোচর। কিন্তু যেমন মোহর দেখিতে টাকা এবং পয়সা হইতে অত্যন্ত পৃথক হইলেও নিশ্চিত জানি যে, মোহর দুয়ের অপেক্ষা বড়, সেই প্রকার সেই উচ্চতম অবস্থা বা মুক্তি বা নির্বাণ, যাহাই বল, মনোবুদ্ধির অগোচর হইলেও ইচ্ছাদি সমস্ত শক্তি অপেক্ষা বড়, যদিও তাহা শক্তি নহে, কিন্তু শক্তি তাহার পরিণাম, এ জন্য সে বড়। যদিও সে ইচ্ছা নহে, কিন্তু ইচ্ছা তাহার নিম্ন পরিণাম, এজন্য তাহা বড়। এখন বোঝ, সকাম ও পরে নিষ্কামভাবে যথাযথ ইচ্ছাশক্তির পরিচালনায় ফল এই যে, ইচ্ছাশক্তিটিই তদপেক্ষা অনেক উন্নত অবস্থা লাভ করিবে।'

লাটু মহারাজ (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) সহজ সরল কথায় শরণাগতির যে তত্ত্ব ফুটিয়ে তুলেছেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। প্রশ্নোত্তরে তিনি বলেছেন (লাটু মহারাজের স্মৃতিকথা)—

প্রশ্ন ঃ শাস্ত্র বলছে, তিনিই জীবকে চালাচ্ছেন। তাই চালকেরই দায়িত্ব। আমাদের আর কি?

উঃ 'হ্যাঁ, শাস্ত্র ত ঠিকই বলেছে—চালকের দায়িত্ব। বাকী বলুন তো মায়াবদ্ধ জীবের চালক কে? চালক ত মায়াই। মায়ার একটা মজা কি জানেন? সে খেলতে ভালবাসে, খেলা বন্ধ করতে ভালবাসে না। সে উঠা পড়ায় আনন্দ পায়, সুখে দুঃখে আনন্দ পায়, ভাঙ্গাগড়ায় আনন্দ পায়, সে ঢেউ তুলতে ভালবাসে। বাকী ঢেউকে শান্ত করতে চায় না। আর যে জীব মায়ায় বদ্ধ নয়, তাকে চালাবার ভার ভগবান নিজে নেন। ভগবানের চালনায় একটানা সুখ, একটানা শান্তি, একটানা আনন্দ বহে যায়। সেখানে কোন ঢেউ উঠতেই পারে না। সে যে অগাধ সমুদ্দুর, একেবারে শান্ত।

'তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) বলতেন—'সমুদ্রেরই তরঙ্গ, তরঙ্গের সমুদ্র নয়।' তেমনি ভগবানেরই মায়া, মায়া ভগবান নয়। তাই মায়ার চালনাকে ভগবানের চালনা বলতে পারেন না। বাকী এটা ঠিক জানবেন যে, মায়ার চালনার চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবকে ভগবানের কাছে পৌঁছে দেওয়া।'

পণ্ডিত ও সাধক গোপীনাথ কবিরাজ ঈশ্বরেচ্ছা ও জীবের ইচ্ছা বিষয়ে যে তত্ত্ব অনুভব করেছেন, 'স্বসংবেদনে' তার উল্লেখ আছে। তিনি বলেছেন—

'তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হয়। জগতে—বাস্তব ক্ষেত্রে—যাহা যাহা ঘটিয়া থাকে, সবই তাঁহার ইচ্ছার পূর্ণতার ফল। তাঁহার ইচ্ছা না থাকিলে কিছুই হয় না, হইতে পারে না। আমার ইচ্ছা, তাঁহার ইচ্ছা হইতে পৃথক থাকিলে তা পূর্ণ হয় না। তাঁহার ইচ্ছাতে আমার ইচ্ছার লয়, ইহাই ভগবৎ-স্রোতে আত্ম-সমর্পণ—তাঁহার লীলায় প্রবেশ। নিজের পৃথক ইচ্ছা লইয়া লীলায় প্রবেশ হয় না।

'ইচ্ছার পূর্ণতাই আনন্দ—তাই জগত-লীলায় তাঁহার আনন্দের স্ফুরণ হইতেছে। সর্বত্র এই আনন্দস্রোত বহিয়া চলিয়াছে। আমার ইচ্ছা যখন তাঁহার ইচ্ছাতে যুক্ত হইবে, যখন তাঁহার ইচ্ছা আমার ইচ্ছা হইবে। আমার আর আলাদা ইচ্ছা থাকিবে না—তখন আমার সদাই আনন্দ। কারণ, সে অবস্থাতে ইচ্ছায় অতৃপ্তি নাই বলিয়া দুঃখের অবকাশ নাই। তাই, যে যোগী তাঁহার সদা আনন্দ।

'কিন্তু যখন আমার ইচ্ছা থাকে না, তখন তাঁহার সহিত যোগ হয় না। যোগের সম্ভাবনা নাই বলিয়া বিয়োগও হয় না। উহা যোগ বিয়োগের অতীত, আনন্দ ও নিরানন্দের অতীত। আমি ইচ্ছারহিত বলিয়া আমি তখন সাক্ষী, জ্ঞানী, দ্রষ্টা। তাই, যে জ্ঞানী সে দ্বন্দ্বাতীত। তাঁহার ইচ্ছা নিত্য, তাঁহার অনিচ্ছাও নিত্য। সমকালে দুই সত্য। তাই তাঁহার ইচ্ছাকে অনিচ্ছার ইচ্ছা বলা হয়। জ্ঞান ও যোগের পূর্ণাবস্থাতে জীবেরও তাহাই হইয়া থাকে। অর্থাৎ দ্রষ্টা ও ভোক্তা যুগপৎ, শিব ও শক্তি যুগপৎ, দ্বন্দ্বাতীত ও আনন্দময় যুগপৎ—ইহা এক অব্যক্ত অবস্থা। মানুষকে বুঝাইবার উপায় নাই।...

'তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হয়। অন্য কোন ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। যাঁহারা তাঁহার ভক্ত, তাঁহাদের ইচ্ছা নাই আলাদা—তাঁহারা নিষ্কাম। অথবা তাঁহার ইচ্ছাই তাঁহাদের ইচ্ছা। তাঁহারা ভগবদিচ্ছার বাধক হন না, হইতে পারেন না। সাধারণ লোকে—দেবতাদি, যোগী, ঋষি প্রভৃতি ভক্ত হইলে তাঁহার ইচ্ছার বিরোধী হন না স্বভাবতঃ। ভক্ত না হইলে বিরোধী হইতে পারেন, তবে তাঁহার ইচ্ছাকে বাধা দিতে পারেন না। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে।

'অনেক সময় জানা যায় ভক্তের ইচ্ছা ভগবান পূর্ণ করেন। বুঝিতে হইবে সেখানেও ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হয়। কারণ তাঁহার ইচ্ছা না হইলে ভক্তের ইচ্ছা হইবে কোথা হইতে—যদি হইতে পারিত তবে সে ভক্ত নহে।

'কিন্তু কোন ঘটনায় অসংখ্য ইচ্ছার খেলা হইতে থাকে। একটি ঘটনা যাহা হইয়াছে 'ক'। 'ক' কেন হইল? কারণ তাহাই ভগবানের ইচ্ছা। লোকে তো তাঁহার ইচ্ছা বুঝে না। ইহা অব্যক্ত। আমি যদি ভক্ত হই, তাহা হইলে আমার ইচ্ছাতেই 'ক' হইয়াছে বলিতে পারি। কিন্তু বস্তুতঃ ঈশ্বরের ইচ্ছাই মূল।

'আর যদি আমি তাঁহাতে যুক্ত না হই, তবে হয়তো আমি চাই না যে 'ক' হয়—তবু 'ক' হইবে। কারণ তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হয়। আমার ইচ্ছা—ঐ ইচ্ছা হইতে আলাদা বলিয়া তাহা পূর্ণ হইল না। তবে একটা কথা আছে। যদি সর্বাবস্থাতে তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে, ইহা সত্য—তথাপি আমার ইচ্ছা অথবা তিনি ও আমির মধ্যবর্তী দেবতা, ঋষি প্রভৃতির ইচ্ছা ভগবদিচ্ছার বিরুদ্ধে হইলে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইতে বিলম্ব হয়। বাধা দিয়া কেহ তাঁহার ইচ্ছার প্রতিরোধ করিতে পারে না। শুধু কালবিলম্ব হয় মাত্র।

'দেবতা ঋষি প্রভৃতির যে কথা বলা হইল তাহা দুই ভাবের। এক আমার প্রার্থনানুসারে আমার ইচ্ছার অনুরূপ তাঁহাদের ইচ্ছা হয়। অথবা তাঁহাদের স্বপ্রয়োজনানুসারে বা দায়িত্ববশতঃও আমার ইচ্ছার অনুরূপ তাঁহাদের ইচ্ছা হয়। তবে আমাতে যদি মূলে কোন বিশিষ্ট ইচ্ছা না থাকে, তব ভগবদিচ্ছা অবিলম্বে পূর্ণ হয়।

'ইহা হইতেই দুঃখের বীজ কোথায় জানা যাইবে। তাঁহার ইচ্ছার বিরোধে

আমার ইচ্ছা হইলেই সংঘর্ষ—প্রবলের সঙ্গে সংঘর্ষে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে একটু বিলম্বে। অথচ ঐ ঘটনা দুঃখের কারণ হইয়া পড়ে। নতুবা জগতে কোন ঘটনা হইতেই দুঃখ হওয়ার কথা নয়। কারণ সব ঘটনার মূলে তাঁহার ইচ্ছা। আমি বিরুদ্ধ ইচ্ছাবিশিষ্ট বলিয়া উভয় ইচ্ছার সংঘর্ষে দুঃখ হয়। আমার পৃথক ইচ্ছা না থাকিলে তাঁহার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা হয়। সে ইচ্ছা অপ্রতিহত—সঙ্গে সঙ্গে তাই উহা পূর্ণ হয়। ফল—আনন্দ।

'সুতরাং কামনাই দুঃখের কারণ। বিরুদ্ধ ইচ্ছা হয় কেন? অভিমানবশতঃ। নিষ্কাম হওয়া মানে দ্রষ্টা হওয়া। আমি যদি কেবল দ্রষ্টামাত্রই হই, তাহা হইলে আমাতে তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে। ফলে আনন্দাস্বাদন আমি পাইব। কারণ ইহা আমার ইচ্ছারই তৃপ্তি। দ্রষ্টা না হইতে পারিলে এ আনন্দ হইতে পারে না।'

বেদান্তবাদীর দৃষ্টিতে 'ঈশ্বরে শরণ গ্রহণ' বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 'তীর্থস্বামী' বলেছেন (আত্মদর্শন ও সাধনতত্ত্ব, পৃঃ ৪৮)—

'ঈশ্বর মায়াধীশ, জীব মায়াধীন ; যেমন যাদুকর ও যাদুমুগ্ধ। ঈশ্বর সমষ্টি-চিদাভাস, জীব ব্যষ্টি-চিদাভাস। চিদাভাসে তত্ত্বসংস্কার ও অনাত্মসংস্কার উভয়েই বর্তমান। ঈশ্বরে তত্ত্বসংস্কারের প্রাধান্য, জীবে অনাত্ম-সংস্কারের প্রাধান্য। গীতার ১৮।৬২ শ্লোকোক্ত (তমেব শরণং গচ্ছ···শাশ্বতম্) ঈশ্বরের অর্থাৎ সমষ্টি-অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যের শরণ গ্রহণে সমষ্টিতত্ত্ব-সংস্কারের শরণ গ্রহণ করা হয়। বুদ্ধির তত্ত্বপক্ষপাত আছে (তত্ত্ব অর্থে সত্য। তত্ত্বপক্ষপাত অর্থে সত্যে পক্ষপাত ; বুদ্ধির স্বভাব হচ্ছে তত্ত্ব-পক্ষপাতী)। সমষ্টিতত্ত্ব-সংস্কারের শরণ গ্রহণ ফলে ব্যষ্টিতত্ত্ব-সংস্কার বলীয়ান হয়। বলীয়ান ব্যষ্টিতত্ত্ব-সংস্কার ব্যষ্টি-অনাত্ম-সংস্কার সহিত সমষ্টি-অনাত্ম-সংস্কারকে পরাভূত করিয়া ধ্বংস করে। (এইভাবে) কাম তথা অজ্ঞানকে জয় করা অর্থাৎ ধ্বংস করা যায়।'

স্বামী নির্বাণানন্দ সরস্বতী (অনির্বাণ) প্রবচন (২য়)-তে শরণাগতির তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

'ধর্মের ক্রমবিকাশ আছে। কুলধর্ম আর জাতিধর্ম প্রথাগত। ওদের অনুষ্ঠানে মোহ দূর হয় না। অকর্তা হয়ে যোগস্থ হয়ে ঐ ধর্মের অনুষ্ঠান করতে পারলে তবে মোক্ষ। এইটা শাশ্বত ধর্ম (গীতার ভাষায় 'অব্যয় ধর্ম')। এই ধর্মকে আশ্রয় করা হল ত্যাগের প্রথম পাঠ। আমি অকর্তা অথচ কাজ করছি। অতএব আমি কর্মফল ত্যাগ করছি। এইটাই সত্যিকার ত্যাগ।

'কিন্তু এই ত্যাগেরও প্রতিষ্ঠা হলেন তিনি, যিনি সর্বভূতের প্রবৃত্তির মূলে। যদি তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে, তাঁর নিমিত্ত হয়ে ধর্মানুষ্ঠান করি, তাহলে সেটা ত্যাগের দ্বিতীয় পাঠ।

'অকর্তার চাইতেও এই অবস্থা নিগূঢ়তর। অবশেষে নিমিত্তভাবও থাকে না, আমাতে-তাঁতে ভেদ ঘুচে যায়, আমি তাঁর সাধর্ম্য লাভ করি। কর্ম তখন দিব্যকর্ম, নিমিত্ত-কর্মের চাইতেও গূঢ়তর। এইখানে পৌঁছানো ত্যাগের তৃতীয় পাঠ। এই অবস্থাতেই সর্বধর্মের পরি (সর্বতঃ) ত্যাগ সম্ভব হয়। তখন আমি ব্রহ্মভূত—এক দৃষ্টিতে। আরেক দৃষ্টিতে তাঁর সঙ্গে নিত্যযুক্ত শরণাগত।

'এ অবস্থা হল সহজ স্থিতি। ধর্মাধর্ম পাপ-পুণ্যের প্রশ্নই এখানে নাই। একেই উপনিষদে বলা হয়েছে—'অন্যত্র ধর্মাদন্যত্রাধর্মাৎ' (কঠ)। যে-জীব এটি অনুভব করছে তার সংজ্ঞা হল শরণাগত—সিদ্ধের শরণাগতি কি, না পরমেশ্বরে আগতি—Reaching the Supreme Goal।

'...'যার পেটে যা সয়', অধিকাংশ লোকের শরণাগতিই পথ। তারা অজ্ঞ হতে পারে, কিন্তু তাদের বুদ্ধিভেদ জন্মানো তো উচিত নয়। 'তস্যৈবাহং' দিয়ে সাধনার শুরু, বৈষ্ণব যাকে বলে ঘৃতস্নেহ। আত্মবিসর্জন দ্বারা তবে আত্মলাভ হয়। আত্মলাভ হলে অনুভব হয়, 'মমৈবাসৌ'—তাঁর উপর তখন আমার জোর খাটে। এ এক নতুন আমি, রূপান্তরিত আমি। একে আর প্রচলিত অর্থে শরণাগতি বলা চলে না। বৈষ্ণবরা বলেন, মধুস্নেহ। আরও পরিপাকে 'স এবাহম্'। সন্ন্যাসীর শরণাগতি এই শ্রেণীর।

'শরণাগতি আর স্বরূপজ্ঞান দুয়েরই মূলে রয়েছে অহং নাশ, উপাধিশূন্যতা।

…ভিতরে ভিতরে 'স এবাহম্' বা 'মমৈবাসৌ', আর বাইরে 'তস্যৈবাহং'। 'অহংগ্রহ উপাসনায় যে-উপাধি লয়, আর শরণাগতিতে যে উপাধি লয়, দুইই তো এক।'

বৌদ্ধ শরণাগতি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে অধ্যাপক বেণীমাধব বড়ুয়া বলেছেন, 'শরণাগতিতেই শরণাগত ও শরণ্যের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। শরণাগত গৃহস্থ উপাসক, শরণাগত প্রব্রজিত শ্রামণের কিংবা শ্রমণ (ভিক্ষু)। উপাসকের পক্ষে শরণাগতি উপাসনা এবং শরণ্য উপাস্য।·· শরণাগতি শুধু মৌখিক ব্যাপার নয়। শরণ-বচনে শরণাগতি দৈহিক ব্যাপার নহে। ইহা তদ্গতচিত্ততা, তৎপরায়ণতা, তৎসমাঙ্গিতাদি ভাবে উদ্বুদ্ধ চিত্তপ্রসাদেরই অভিব্যক্তি মাত্র।'

অধ্যাপক ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য 'সমর্পণ' প্রবন্ধে বলেছেন (উদ্বোধন ১৩৬৩ আশ্বিন)—সব যদি ব্রহ্ম তবে সমর্পণ কথাটির অর্থ কি ? 'এক' তিনি অনন্ত 'বহু' হয়েছেন। তবে সর্বস্ব তাঁতে সমর্পণ করার উপদেশের সার্থকতা কোথায় ? 'বাসুদেবঃ সর্বম্'…তবে কে আর কাকে সমর্পণ করবে ?…সমর্পণ করবার পূর্বেই তো সব চিরসমর্পিত হয়েই আছে ! এই বহুর খেলায় সবটুকু তো তাঁর!…

'সমর্পণ করার উপদেশের প্রকৃত বক্তব্য একমাত্র এই হতে পারে যে, সব কিছু যে তাঁরি এবং তিনিই, সবই যে তাঁর চরণে চির সমর্পিত হয়েই আছে, এই সত্য অবিচ্ছিন্নভাবে স্মরণ রাখা, দেখা এবং এই সত্যের পূর্ণ স্বীকৃতিতে চলা—মনে রাখা এই দেহ তাঁর, মন ইন্দ্রিয় বুদ্ধি চিত্ত অস্মিতা, এই বিশ্ব সবই তাঁর এবং তিনিই—প্রতি ব্যষ্টি এবং সমষ্টি তাঁরই এবং পূর্ণভাবে তিনিই।…তাই সমর্পণ ও জ্ঞান একই কথা, যে জ্ঞানে সব ব্রহ্মময়।'

উপরে বর্ণিত বিভিন্ন দার্শনিক, সাধক, মহাপুরুষদের শরণাগতির দার্শনিক বিচারে একথা স্পষ্ট হয় যে শরণাগতিকে অবলম্বন করে জ্ঞান-যোগী, ভক্তিযোগী, রাজযোগী (বা সাংখ্যবাদী) ও কর্মযোগী—সকলেই

জীবনের উদ্দেশ্য সফল করতে পারেন। কর্মযোগী নিষ্কাম কর্ম দ্বারা শরণাগতির ভাব নিয়ে এবং ভক্তিযোগী প্রেম-ভালবাসায় ও সম্পূর্ণ নির্ভরতা দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব অনুভব করতে পারেন। ক্রমে তাঁরা এমন একটা স্তরে উন্নীত হতে পারেন, যেখানে সমস্ত অহংকার নাশ হয়ে, আমার ইচ্ছা তাঁর ইচ্ছাতে পরিণত হয়ে 'আমি' 'তুমি'তে লয় হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁকে বলেছেন, 'নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু'। ক্রমে সেই 'তুমি'রও লোপ পেয়ে বাক্যমনের অতীত নির্বিশেষে নির্গুণ ব্রহ্মে পর্যবসিত হয়। তিনিই জ্ঞানীর ব্রহ্ম, সাংখ্যের পরম পুরুষ।

এইভাবে সমর্পণ ও জ্ঞান একই কথায় পর্যবসিত হয়—সমর্পণ-সাধনে অজ্ঞান নাশ হয়। অতএব দার্শনিক সিদ্ধান্তে প্রমাণিত হয় যে কেবলমাত্র শরণাগতির সাধনদ্বারা চরম ও পরম উপলব্ধি হওয়া সম্ভব। শরণাগতি নিঃসন্দেহে একটি পথ।

৮

শরণাগতের আচরণ

আত্মসমর্পণকারীর লক্ষণ হিসাবে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে (১১।১৪।১২, ১৩)—

'হে উদ্ধব, আমাতে সমর্পিতচিত্ত, বিষয় বাসনাশূন্য ব্যক্তির হৃদয়ে মদীয় পরমানন্দ স্বরূপের স্ফূর্তি হওয়ায় যে সুখ উদয় হয়, বিষয়াসক্ত পুরুষের সেই প্রকার সুখ কি প্রকারে সম্ভবে ? অকিঞ্চন, জিতেন্দ্রিয়, শান্ত, সর্বত্র সমচিত্ত, আত্মপরিতৃপ্ত পুরুষের নিকট সর্বজগত সুখময়রূপ প্রতীত হয়।'

'যেমন ভোজনকালে প্রতি গ্রাসেই মনের তুষ্টি, দেহের পুষ্টি ও ক্ষুধার নিবৃত্তি ক্রমশই হইয়া থাকে, সেইরূপ অনন্য শরণে ভগবানে নির্ভরকরতঃ শ্রবণাদি ভাগবতধর্মের অনুশীলনে ভক্তের (১) প্রেম লক্ষণা ভক্তি, (২) ভাগবত স্বরূপের উপলব্ধি এবং (৩) ধন পুত্র কলত্রাদি বিষয়ে বৈরাগ্য— এই তিনটিই ভজনের সমকালেই ক্রম অনুসারে উত্তরোত্তর পরিবর্ধিত হইয়া থাকে।'

বিক্রিত গো মহিষাদি বিক্রয়ের পর তাদের লালন-পালনের কোনো দায়িত্বই বিক্রেতার থাকে না। সেই প্রকার ঈশ্বরে আত্মসমর্পিত ভক্তের সমর্পণের পর নিজস্ব কোনো অহং অভিমান থাকা উচিত নয়। তার কোনো প্রকার সংকল্পিত কর্মপ্রচেষ্টা থাকবে না, সকাম কোনো প্রকার কর্ম করাও সমীচীন হবে না।

গো-মহিষাদির বদ্ধাবস্থায় পালক কর্তা যখন যে খাদ্য দেবে তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। শরণাগত সাধক ভক্ত সেই প্রকার দেহ-ধর্ম রক্ষা করার জন্য যেমন যতটুকু খাদ্যের প্রয়োজন তাই গ্রহণ করেন। লোভের বশবর্তী হয়ে রসনা তৃপ্তির জন্য আহারের কোনো প্রয়োজন নাই। 'অল্পায়াসে প্রাপ্ত,

যথাপ্রাপ্তিতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।'

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান কপিল বলেছেন (৩২৯।৩২)—'যে সমস্ত আমাকে অর্পণ করিয়াছে এবং যে আপন চিত্ত একমাত্র আমাতেই অর্পণ করিয়াছে, সেই অকর্তা এবং সমদর্শী পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ প্রাণী আমি দেখিতেছি না।'

সমদৃষ্টি শরণাগতের একটি বিশেষ লক্ষণ। সমদর্শীর আপন-পর ভেদবুদ্ধি থাকতে পারে না। তাঁর ইচ্ছাতেই জগতের সবকিছু পরিচালিত হচ্ছে, ছোট বড়, নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট তিনিই সৃষ্টি করেছেন যথাযথ তাদের চালনা করছেন—এই চিন্তা শরণাগতের আছে বলে কারও প্রতি দ্বেষ হিংসা করেন না।

গীতায় আত্মৌপম্য-দৃষ্টির কথা আছে। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'হে অর্জুন, সুখ বা দুঃখ যাহাই হোক না কেন, যে আত্মৌপম্য দ্বারা সর্বভূতে সম দেখে, সেই যোগী শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমার অভিমত।' মানুষ আপনার প্রতি যেমন আচরণ করে থাকে, সমস্ত প্রাণিগণেরও প্রতি তেমন ব্যবহার থাকে—এই হলো আত্মৌপম্য দৃষ্টি। শরণাগত সাধকের যেমন সমদর্শন, তেমনি আত্মৌপম্য দ্বারা সমদৃষ্টি হবে।

কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন (৪।১৬।৩), 'সংসারে টাকার দরকার বটে, কিন্তু উপ্তনোর জন্য অতো ভেবো না। যদৃচ্ছালাভ—এই ভালো। সঞ্চয়ের জন্যে অতো ভেবো না। যারা তাঁকে মন প্রাণ সমর্পণ করে—যারা তাঁর ভক্ত, শরণাগত—তারা ও সব অতো ভাবে না। যত্র আয়—তত্র ব্যয়। এক দিক থেকে টাকা আসে, আর এক দিক থেকে খরচ হয়ে যায়। এর নাম যদৃচ্ছালাভ। গীতায় আছে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে অতি সহজ সরল ভাবে শরণাগত ভক্তের অর্থোপার্জন, সঞ্চয়, অর্থ-ব্যবহার সম্বন্ধে সুন্দর সমাধান করে দিলেন।

স্বামী তুরীয়ানন্দ পত্রাবলীতে লিখেছেন (নং ৮১)—'যিনি ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া চলিতে চেষ্টা করেন (তাহার) লক্ষণ সাধারণতঃ দুই প্রকার হইয়া থাকে। প্রথম স্বসংবেদ্য ও দ্বিতীয় পরসংবেদ্য। স্বসংবেদ্য

অর্থাৎ নিজেই জানিতে পারা যায়—ভিতর হইতে, ইহাই সর্বোত্তম। আর পরসংবেদ্য অর্থাৎ অন্যের দ্বারা জ্ঞাত। ···তাঁহার শরণাগত হইলে অন্য কাহারও অপেক্ষা থাকে না, ভিতর হইতে নির্ভয় ভাব উদয় হয়। কারণ তাঁহার কৃপা উপলব্ধি হয়, তিনি সর্বদা রক্ষা করিতেছেন, ইহা সাক্ষাৎকার হয়, অসৎ চিন্তা হৃদয় হইতে চলিয়া যায়, সদা সদ্ভাবেরই স্ফুরণ হইয়া থাকে, অন্তর শান্তিময় হইয়া যায়—এ সকল স্বসংবেদ্য। অন্যে দেখে যে, তিনি নিশ্চিন্ত ও শান্ত, সকলে প্রেমপূর্ণ ও সর্বদা সন্তুষ্ট ইত্যাদি—ইহার পরসংবেদ্য লক্ষণ।'

'স্বামী তুরীয়ানন্দজীর সহিত কথোপকথনে' (উদ্বোধন ১৩৩২) তিনি বলেছেন—'তুমি যে pre-destination-এর (অদৃষ্টবাদের) কথা বলেছিলে, ও কিছু কাজের কথা নয়। তা হলে তো কোনো কাজই চলে না। পাপ পুণ্যও থাকে না। আছে এক, পরমভক্তের Resignation-এর (নির্ভরের) কথা। যন্ত্রচালিত হয়ে সে কাজ করছে। তার ইচ্ছা ও ভগবদিচ্ছায় তো তফাৎ নেই। কিন্তু তারও Test 'পরখ' আছে। তার দ্বারা কোন খারাপ কাজ হতে পারে না। তার পা বেতালে পড়ে না।'

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ঐরূপ মানবের মনে তখন তাঁহার কৃপায় কোন কুভাব মস্তকোত্তলন পূর্বক প্রভুত্ব স্থাপন করিতে সক্ষম হয় না। মা (শ্রীশ্রীজগদম্বা) তাহার পা কখনও বেতালে পড়িতে দেন না।'

তিনি আরও বলেছেন, 'যদি ঈশ্বর লাভের পর 'দাস আমি' বা 'ভক্তের আমি' থাকে, সে ব্যক্তি কারো অনিষ্ট করতে পারে না। পরশমণি ছোঁয়ার পর তরবার সোনা হয়ে যায়, তরবারের আকার থাকে কিন্তু কারো হিংসা করে না।

'যাদের চৈতন্য হয়েছে তাদের বেতালে পা পড়ে না, হিসাব করে পাপ ত্যাগ করতে হয় না, ঈশ্বরের উপর এত ভালবাসা যে, যে কর্ম তারা করে সেই কর্মই সৎকর্ম! কিন্তু তারা জানে, এ কর্মের কর্তা আমি নই, আমি ঈশ্বরের দাস। আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। তিনি যেমন করান তেমনি করি,

যেমন বলান তেমনি বলি, তিনি যেমন চালান তেমনি চলি।'

কথামৃতের আলোচনায় 'বাণী ও বিচারে' বলা হয়েছে, 'মন সর্ববৃত্তিবিহীন হলে চৈতন্যে বা জ্ঞানে রূপান্তরিত হয়। মন জ্ঞানে (চৈতন্যে) রূপান্তরিত হয় বলতে মন সমাধিতে সমস্ত বৃত্তিরহিত হয়ে নিজের স্বরূপ শুদ্ধচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেইরূপ, ঈশ্বর-সমর্পিত মন ঠিক মন নয়, মন তখন ঈশ্বররূপ বিশুদ্ধচৈতন্যময়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, ঈশ্বরে তন্ময়-মন বিশুদ্ধ মনে বা চৈতন্যে রূপান্তরিত, সুতরাং সেই মন আর কোন মহাপাতকে পঙ্কিল হয় না।'*

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে (সাধকভাব) স্বামী সারদানন্দ ঈশ্বর-নির্ভরশীল সাধকের কথাপ্রসঙ্গে লিখেছেন—

'অন্তরের সেই ক্ষুদ্র আমিত্ব ঈশ্বরের বিরাট আমিত্বে চিরকালের মত বিসর্জিত হওয়ায়, ঐরূপ মানবের পক্ষে স্বার্থসুখান্বেষণ তখন এককালে অসম্ভব হইয়া উঠে। সুতরাং বিরাট ঈশ্বরের সর্বকল্যাণকরী ইচ্ছাই ঐ মানবের অন্তরে তখন অপরের কল্যাণ সাধনের জন্য বিবিধ মনোভাবরূপে সমুদিত হইয়া থাকে। অথবা ঐরূপ অবস্থাপন্ন সাধক তখন 'আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী' একথা প্রাণে প্রাণে অনুক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়া নিজ মনোগত ভাব সকলকে বিরাট পুরুষ ঈশ্বরেরই অভিপ্রায় বলিয়া স্থির নিশ্চয় করিয়া উহাদিগের প্রেরণায় কার্য করিতে কিছুমাত্র সংকুচিত হন না। ফলেও দেখা যায়, তাহাদিগের ঐরূপ অনুষ্ঠানে অপরের মহৎ কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে।'

শরণাগতের জীবনে উপরে বর্ণিত ভাবধারা আপনা থেকেই ফুটে ওঠে এবং যেহেতু তিনি ঈশ্বরে সমর্পিত তনু-প্রাণ-মন, অতএব তিনি কখনও অন্যায় কাজ করতে পারেন না, অন্যায় পথে যেতে পারেন না। এগুলো ছাড়াও শরণাগতের নিত্য ব্যবহারে ও আচরণে আরও এমন অনেক ভাব দেখা যায় যা থেকে বুঝা যেতে পারে যে তিনি শরণাগতিকে অবলম্বন করে

অবস্থান করছেন বা এগিয়ে চলেছেন।

অনেকে মুখে শরণাগতির কথা বলে থাকেন কিন্তু আচরণে তা পালন করেন না, স্বামী বিবেকানন্দ তাদের সম্বন্ধে ঠাট্টা করে 'ভাববার কথা'য় বলেছেন—'ভগবান অর্জুনকে বলেছেন : তুমি আমার শরণ লও, আর কিছু করবার দরকার নাই, আমি তোমার উদ্ধার করব। ভোলাচাঁদ তাই লোকের কাছে শুনে মহাখুশী। থেকে থেকে বিকট চীৎকার : আমি প্রভুর শরণাগত, আমার আবার ভয় কি? আমায় কি আর কিছু করতে হবে? ভোলাচাঁদের ধারণা—ঐ কথাগুলি খুব বিটকেল আওয়াজে বারংবার বলতে পারলেই যথেষ্ট ভক্তি হয়, আবার তার ওপর মাঝে মাঝে পূর্বোক্ত স্বরে জানান আছে যে, তিনি সদাই প্রভুর জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত। এ ভক্তির ডোরে যদি প্রভু স্বয়ং না বাঁধা পড়েন, তবে সবই মিথ্যা। পার্শ্বচর দুচারটা আহাম্মকও তাই ঠাওরায়। কিন্তু ভোলাচাঁদ প্রভুর জন্য একটিও দুষ্টামি ছাড়তে প্রস্তুত নন। বলি, ঠাকুরজী কি এমনই আহাম্মক! এতে যে আমরাই ভুলি নি।'

কাজেই নষ্টামি দুষ্টামি আচরণ ত্যাগ না করে শুধু মুখে শরণাগতির কথা বললে তা কখনও শরণাগতি হয় না। 'রামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্তি' গ্রন্থে গিরিশচন্দ্র সেন উল্লেখ করেছেন (নং ২১), 'যাহার জীবন পাপ-মলিন, তাহার জীবন কি স্বতঃ শুদ্ধ হয়? শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, যেমন মাঠের ময়লা জল কেহ সিঁচিয়া না ফেলিলেও সূর্যকিরণে কিছু দিনের মধ্যে শুকাইয়া যায়, তদ্রূপ মলিন হৃদয় লোক ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া পড়িয়া থাকিলে কিছুদিনের মধ্যে তাঁহার কৃপায় বিশুদ্ধ হয়।

ঈশ্বর-নির্ভরশীল ব্যক্তির আচার আচরণ শুদ্ধ হয়ে ওঠে স্বাভাবিকভাবেই। কিন্তু তা আন্তরিক হলেই হতে পারে। শ্রদ্ধার ভাবটিও তার থাকা চাই। ব্রহ্মর্ষি সত্যদেব 'সাধন সমরে' বলেছে (৭।১০)—'একমাত্র আস্তিক্য-বুদ্ধিই এই শরণাগত হওয়ার পক্ষে সর্বপ্রধান অবলম্বন। মানুষ যে পরিমাণে ভগবৎ সত্তায় বিশ্বাসবান অর্থাৎ শ্রদ্ধাবান হইতে থাকে, শরণাগত ভাবটিও সেই পরিমাণে বর্ধিত হইতে থাকে।'

শরণাগত কারো নিন্দা করতে পারে না। তাঁর ইচ্ছায় জগৎ চলছে, তিনি এ জগতে ভালো মানুষও রেখেছেন আবার মন্দ মানুষও রেখেছেন। যদি তাঁর ইচ্ছাতে এরূপ হয়ে থাকে তবে তো কাউকে হেয় দৃষ্টিতে দেখবার অধিকার আমার নেই। শুধু ভালো মানুষ নিয়ে জগত চলে না, মন্দেরও কখনও কখনও প্রয়োজন হয়—যিনি জগত চালাচ্ছেন তিনি সেটা বুঝছেন —আমার তাতে বলার অধিকার কিছু নেই। তাই কারো নিন্দা করার মনোভাব শরণাগতিতে থাকতে পারে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ হাজরার প্রতি বলেছেন, 'কারু নিন্দে করো না—পোকাটিরও না। তুমি নিজেই তো বলো লোমশ মুনির কথা। যেমন ভক্তি প্রার্থনা করবে, তেমনি ওটাও বলবে—যেন কারু নিন্দা না করি।'

আবার যে শরণাগত তার নিন্দারও ভয় নাই। কেউ যদি তার নিন্দা করে বা কেউ যদি তার প্রশংসা করে তাতেও তার কিছু আসে যায় না। সে জানে ঈশ্বরচ্ছোয় যখন যা প্রাপ্য তাই তার কাছে আসে। সবই সে গ্রহণ করে স্বাভাবিক ভাবে ও সমানভাবে।

যিনি নিজের ইচ্ছাকে ঈশ্বরেচ্ছায় লয় করতে পেরেছেন, তিনি ঠিক ঠিক নিষ্কাম কর্মী হতে পারেন। ঈশ্বর-নির্ভরতা দ্বারা তাঁর কর্ম সম্পূর্ণ নিষ্কাম হতে পারে। এরূপ নিষ্কাম কর্মীর কর্মকৌশল কীরূপ হওয়া উচিত এ সম্বন্ধে অনির্বাণের একটি চিঠিতে পাই (শারদীয়া পরিবর্তন ১৩৮৭)—'কাজ তো আপনি করছেন না। তিনি করাচ্ছেন, তাই করছেন। কাজেই আপনার ভাবনা কি? যতক্ষণ করাবেন করবেন। যখন তাঁর ইচ্ছা হবে কিছুই করবেন না। দেখবেন তখন কবির সঙ্গে বলতে হচ্ছে—'বিনা কাজের সেবার মাঝে পাই নে আমি ছুটি।' কাজ করুন আর সঙ্গে সঙ্গে ভুলে যান—কি করলেন। তবেই কিস্তিমাৎ। গাছ ফুল ফুটায়, তাকে তো আঁকড়ে থাকে না। যাকে আঁকড়ে থাকতে চায়, সে নাকি কাঁটা হয়ে বেঁধে। আপনি কাজের মধ্য দিয়ে ফুটুন, ঝরুন—আবার ফুটুন, ঝরুন।'

তাই বেদান্তবাদীদের মত শরণাগতের থাকবে উপরতি। উপরতির কথা বলতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন (বাণী ও রচনা ২য়)—'ইন্দ্রিয়ের

বিষয়গুলো সম্বন্ধে চিন্তা না করাকে 'উপরতি' বলা হয়। ইন্দ্রিয়ের বিষয় চিন্তা করতেই আমাদের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হয়—যাহা দেখিয়াছি, যাহা শুনিয়াছি, যাহা দেখিব বা শুনিব, যাহা খাইয়াছি, খাইতেছি বা খাইব, যে যে স্থানে বাস করিয়াছি ইত্যাদি বিষয়েই আমাদের চিন্তা। আমরা প্রায় সব সময়ই ইহাদের সম্বন্ধে চিন্তা করি অথবা কথা বলি।··· এই অভ্যাস অতি অবশ্যই পরিত্যাগ করিতে হইবে।'

যিনি শরণাগত তিনি কাজ করতে পারেন, কাজের সফলতার জন্য চেষ্টাও করতে পারেন, কিন্তু কাজের ফল উপযুক্ত না হলে দুঃখিত হন না বা নিরাশ হন না। তাঁর এই ভাবটি থাকতে পারে—যত্নসহকারে কর্মানুষ্ঠান করে যদি উদ্দেশ্য সিদ্ধি না হয়, তাতে দোষ কিছুই নাই। কারণ শরণাগত জানেন যে ঈশ্বরেচ্ছায়ই এরূপ ঘটেছে। তাই শরণাগত নৈরাশ্যবাদী হন না, কোনো কাজের বিফলতায় শরীর মন ভেঙে যায় না—বরং তিনি হন আশাবাদী।

এই বিশ্বজগতে ঈশ্বরের লীলাখেলা তিনি লক্ষ্য করেন, দেখে মুগ্ধ হন, অবাক হন। জগতের সব কিছু ঘটনাকে তিনি শান্তভাবে গ্রহণ করেন বা অনুভব করেন। কোনো ব্যাপারেই অত্যন্ত ব্যস্ত হবার প্রয়োজনীয়তা তাঁর মনে হয় না। ব্যস্তবাগীশ ভাবটি তাঁর থাকে না বলে তাঁর আচরণ হয় শান্ত ধীর। সাময়িকভাবে কখনও তাঁর উত্তেজনা-ভাব দেখা গেলেও মূলত তিনি নিরুত্তাপ থাকেন এবং অল্প সময়েই শান্ত হয়ে যান। তাঁর ধৈর্য ও স্থৈর্য বেশী থাকে। ফলে ভেবে চিন্তে দেখে শুনে সবটা জিনিস বুঝে তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

শরণাগত জগতকে এবং জীবনকে অন্য দৃষ্টিতে দেখেন বলে কোনো বদ্ধমূল ধারণা নিয়ে থাকেন না, বা চলেন না। তাঁর কোনো বিষয়ে গোঁড়ামি বা গোঁ থাকে না। তিনি উদার প্রকৃতির হতে পারেন। ঈশ্বরেচ্ছায় দেশ কাল পাত্র অনুসারে নানারকম ভাবধারা থাকতে পারে, কাজেই 'যেখানে যেমন সেখানে তেমন' ব্যবহারই কর্তব্য—কোনো একটা বিশেষ মতবাদ কারো ওপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা তাঁর থাকে না। তিনি একদেশদর্শী হন না।

কোনো বিষয়ে মতামত দেবার জন্যে অনুরোধ করলে সাধারণত শরণাগত নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করতে চান না, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অপরের মতামত, শাস্ত্রীয় মতামত উদ্ধৃত করে থাকেন। ঈশ্বরাদেশ বা ঈশ্বরেচ্ছা অনুভব করে কোনো কোনো সিদ্ধ পুরুষকে মতামত প্রকাশ করতে দেখা যায়। অথবা দেখা যায়, ঈশ্বরের নাম নিয়ে তাঁর স্মরণ মনন সহ কোনো মতামত বা সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করে থাকেন। অপর সকলের যা বেশীর ভাগের মতামত লক্ষ্য করে সেভাবেও মতামত প্রকাশ করেন। তবে একথা ঠিক যে কোনো অনৈতিক বা অন্যায়ের পক্ষে তিনি যান না।

শরণাগত সাধক যেমন নির্ভরতার ভাব তেমনি প্রার্থনার ভাব নিয়ে থাকেন। প্রার্থনাই তাঁর বড় অস্ত্র বা শক্তি। অভাব মেটাতে হলে বা প্রয়োজন হলে পুরুষকার নিয়ে তাঁকে এগুতে হয়, কিন্তু শরণাগত জানেন, পুরুষকার বড় কথা নয়, প্রার্থনাই বড় কথা। প্রার্থনার ভাবে তাঁর অহংকার অভিমানও কমতে থাকে। অহংকার, অভিমান, দম্ভ, দর্প শরণাগতের কখনও প্রকাশ পাওয়া উচিত নয়।

ঈশ্বরে যাঁর শরণাগতির পূর্ণ অবস্থা হয়েছে তিন সর্বদা নির্ভরশীল ভাবে অবস্থান করেন। সংসারে সকল কাজে, সর্ব ব্যবহারে তিনি ভ্রাতা, পুত্র, কন্যা বা বিশ্বস্ত আত্মীয়ের ওপর নির্ভর করেন। সংসারেও যেন তাঁর আত্মসমর্পণ। তাঁর নিজের থাকা, খাওয়া, কাজকর্ম এবং বৃহৎ ব্যাপারেও পুত্রাদির ওপর নির্ভরতা ও বিশ্বস্ততার ভাব পরিলক্ষিত হয়। যিনি ত্যাগী, সাধক—তাঁকেও শিষ্য, সেবক বা কর্মীদের ওপর নির্ভরশীল হতে দেখা যায়। কোনও সময়ে যদি তাঁদের ঠকতে বা প্রতারিতও হতে হয়, তাতেও তাঁদের দুঃখ থাকে না, বেদনা আপসোস থাকে না।

গুরুতে প্রপন্ন হবার কথা ভক্তি শাস্ত্রে বিশেষভাবে বলা হয়েছে। গুরু-সপত্তি ধর্মসাধনার এক বিশেষ অঙ্গ। গুরুতে প্রপন্ন হবার ভেতরে দিয়ে ঈশ্বরে প্রপন্নতা আসতে পারে। তাই গুরু-সপত্তি একটি সাধন। ঈশ্বর-প্রপন্নতা সাধনায় গুরুর প্রতি শরণাগতি একটি লক্ষণ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

শরণাগতকে কখনও জোর দিয়ে বলতে বা করতে দেখা যায় না—এটা করবই, ওখানে যাবই বা যেতেই হবে। তাঁর ভাবটি হলো—ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে করব, ওখানে যেতে চেষ্টা করব—এভাবে বলেন। কখনও চ্যালেঞ্জ নিয়ে বলেন না করেন না। কোনও বিষয়ে আত্মবিশ্বাস থাকলে তিনি সে বিষয়ে দৃঢ় মত ব্যক্ত করতে পারেন বা দৃঢ়তা দেখাতে পারেন—তবুও তিনি মনে মনে জানেন যে ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে ফল অন্য রকমও হতে পারে। যেমন গিরিশ ঘোষকে শ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, 'অমন করে 'আমি করব' বল কেন?···বলবে—ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়তো করবো।'

শরণাগত সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দকে সমান ভাবে গ্রহণের চেষ্টা করেন। সেজন্য তাঁর দোষদৃষ্টি থাকে না। একটা শ্রদ্ধার ভাব নিয়ে তিনি অবস্থান করেন। নিন্দা দ্বেষ হিংসাকে তিনি পরিহার করতে চান বলে অন্তরে শ্রদ্ধার ভাব পরিস্ফুট থাকে। ফলে জগতের মন্দ দোষ ত্রুটি অসৎ অন্যায়ের দৃষ্টি থেকে তাঁর মন সরে গিয়ে সর্বদা শুভ মঙ্গল কল্যাণকারী সৎ দৃষ্টি তাঁর মনে জেগে ওঠে এবং তিনি সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে জগতের সঙ্গে ব্যবহার করেন। জগতের শুধু মন্দ দিক নয়, ভালোর দিকটাই তাঁর মনে বেশী প্রতিভাত হয় বলে তাঁর সঙ্গগুণে অন্যেরাও শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করে।

৯

শরণাগতির মহিমা

শরণাগতি সম্পর্কে বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা করে বুঝা যায় যে ভক্তিযোগী, কর্মযোগী এমন কি জ্ঞানযোগীও তাঁদের নিজস্ব সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে শরণাগতিকে অবলম্বন করে থাকতে পারেন। জ্ঞানযোগীদের মতে জীবের 'অহংকার'ই মায়া। এই অহংকার সব আবরণ করে রেখেছে, তাই সাধারণ মানুষ অজ্ঞানে রয়েছে। 'জ্ঞানলাভ হলে অহংকার যায়। জ্ঞানলাভ হলে সমাধিস্থ হয়, সমাধিস্থ হলে তবে অহং যায়।' কিন্তু এই জ্ঞানের পথ অত্যন্ত কঠিন। তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেন, 'ভক্তিযোগ কলির পক্ষে ভাল, সহজ।'

তবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথায় 'কেউ কেউ সমাধির পর 'ভক্তের আমি', 'দাস আমি' নিয়ে থাকে।' যিনি নিষ্কাম কর্মী তিনি নিজের ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছায় লয় করেন। নিষ্কাম কর্মদ্বারা তাঁরও অহং নাশ হয়। তিনিও 'আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী'—এই ভাব নিয়ে থাকেন। অতএব সাধনার ফলস্বরূপ সাধকের শরণাগতের অবস্থা এসে যায়।

তাই যদি হয়, অর্থাৎ ঈশ্বর-সাধনার ফলে যদি শরণাগতির অবস্থা আসে, তবে কেবলমাত্র শরণাগতিকে অবলম্বন করে ঈশ্বর-লাভও সম্ভব হতে পারে। কোনো বৈধী ভক্তি বা রাগানুগা ভক্তির পথ অথবা জ্ঞানবিচারের পথ অবলম্বন না করেও অতি সাধারণ মানুষও শরণাগতির পথে ঈশ্বর-লাভ করতে পারে। যেমন, বলা হয় ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ। অতএব জ্ঞান-বিচার করতে করতে সেই ব্রহ্মতত্ত্বে পৌঁছানো যায় এবং অজ্ঞান নাশ হয়, জ্ঞান লাভ হয়। যেমন, বলা হয় ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ। অতএব প্রেমাভক্তি বা রাগানুগা ভক্তিকে অবলম্বন করে প্রেমস্বরূপ ভগবানের প্রেম আস্বাদন

সম্ভব, ঈশ্বরলাভ সম্ভব। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'আমি দাস তুমি প্রভু, আমি ভক্ত তুমি ভগবান—এই অভিমান ভক্তের থাকে। ঈশ্বরলাভের পরেও থাকে, সব 'আমি' যায় না। আবার এই অভিমান অভ্যাস করতে করতে ঈশ্বর লাভ হয়।'

ভক্তিপথের একটি সাধনার অঙ্গ ছাড়াও শরণাগতির নিজস্ব একটি সাধনার ধারা থাকতে পারে এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা হয়েছে। শুধু এই শরণাগতিকে অবলম্বন করে অনেকেই সিদ্ধি লাভ করেছেন—পৌরাণিক অনেক কাহিনী এ বিষয়ে আছে। শরণাগতির পথ যে অতি সাধারণ মানুষও অবলম্বন করতে পারে, এ বিষয়ে বর্ণনা আছে। অধিকারী ভেদে সকল স্তরের মানুষের পক্ষেই শরণাগতি একটি সহজসাধ্য পথ বলে স্বীকৃত। নারদ পঞ্চরাত্রে বলা হয়েছে (১।১৫)—শারণাগতিতে জাতি, বংশ, লিঙ্গ, গুণ, ক্রিয়া, দেশকালের অপেক্ষা নেই। সকলেই ভগবানে প্রপত্তি করতে পারে।

শরণাগতির স্তুতিপূর্ণ একটি পৌরাণিক কাহিনী 'কলি ধন্য, শূদ্র ধন্য, নারী ধন্য' নামক প্রবন্ধে সাধক অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্ণনা সংক্ষেপে উদ্ধৃত হলো (উদ্বোধন-শারদীয় সংখ্যা)—

'শাস্ত্রগ্রন্থে একটি পুরাতন প্রবাদ প্রসিদ্ধ আছে যে এক সময় মুনি সমাজে একটি বিতর্ক উপস্থিত হয়েছিল এবং বিতর্কের বিষয় ছিল তিনটি :—(১) চতুর্যুগের মধ্যে কোন্ যুগ শ্রেষ্ঠ ? (২) চতুবর্ণের মধ্যে কোন্ বর্ণ শ্রেষ্ঠ ? (৩) নারী ও পুরুষের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ?

বিতর্কটি উঠেছিল দ্বাপর ও কলির সন্ধিক্ষণে। কলিযুগ আসার তখন উপক্রম করেছে। মুনি সমাজ আশংকান্বিত। কলিযুগের অগ্রদূতেরা অভিনব ভাবধারা প্রচার আরম্ভ করেছে। সমাজে বিপ্লবের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। মুনিগণের মধ্যেও মতভেদ দেখা যাচ্ছে। প্রাচীন যুগের সমুন্নত সমাজের প্রচলিত মতবাদের বিরোধী শক্তিসমূহ ক্রমশই যেন শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। অতএব মানব জগতের কল্যাণ কল্পে আগামী যুগের সুনিয়ন্ত্রণ উদ্দেশ্যে একটি সুমীমাংসা আবশ্যক।

তখন মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস সর্বশাস্ত্র মর্মার্থদর্শী সর্বকালতত্ত্বজ্ঞ শ্রেষ্ঠ আচার্য বলে আর্যসমাজে স্বীকৃত। তিনি সমগ্র বেদকে সংগ্রথিত ও সুসজ্জিত করে আর্যসমাজের ভিত্তি সুদৃঢ় করেছেন। বেদের কর্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে সম্বন্ধ নিরূপণ করে এবং মানবের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত সাধনার ক্ষেত্রে তাদের যথাযোগ্য স্থান নির্দেশ করে বেদবাদী ও উপনিষদবাদীদের অবান্তর কলহের সুমীমাংসা করে দিয়েছেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের নিজ নিজ অধিকার অনুযায়ী ধর্মসাধনার পথ প্রদর্শন এবং প্রত্যেক বর্ণের স্ব স্ব ধর্মের মর্যাদা স্থাপন দ্বারা সমগ্র জাতিকে আত্মকলহ হতে রক্ষা করেছেন।···ভারতে মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের আচার্যত্ব অনন্যসাধারণ। ভারতীয় সাধনায় তাঁর গুরুপদ চিরকালের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত।

মুনিগণ তাঁদের বিতর্কের সুমীমাংসার নিমিত্ত মহর্ষির আশ্রমে উপনীত হলেন। মহর্ষি তখন সরস্বতী নদীজলে অর্ধনিমজ্জিত অবস্থায় পরমাত্মার ধ্যানে চিত্তকে সুসমাহিত করে পরমানন্দে বিরাজিত ছিলেন। ধ্যান কথঞ্চিত শিথিল হইলে তাঁহার প্রশান্ত চিত্তে মুনিগণের জিজ্ঞাসার প্রতিক্রিয়া হইল—(১) কলি ধন্য, (২) শূদ্র ধন্য, (৩) নারী ধন্য।

বাণী তিনটি জিজ্ঞাসু মুণিগণের শ্রবণগোচর হইল। ইহা যে তাঁদেরই বিতর্কের মীমাংসা—তদ্বিষয়ে সন্দেহ রইল না। কিন্তু এই তিনটি বাণীই যে চিরকাল প্রচলিত সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিপরীত। যে কলিযুগে ধর্মের মাত্র একপাদ অবশিষ্ট বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে, যে যুগে ধর্মগ্লানি পূর্ণমাত্রায় এবং অধর্মের প্রাদুর্ভাব ক্রমবর্ধমান, সেই যুগকে মহর্ষি ধন্য বলে প্রণাম জানালেন? যে শূদ্র ও নারী বৈদিক জ্ঞানে ও কর্মে সম্পূর্ণ অনধিকারী, একমাত্র সেবা করাই যাদের ধর্ম—সেই শূদ্র ও নারীকে তিনি ধন্য বলে শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করলেন? এ যে ভীষণ বিপ্লবের বাণী!

কিয়ৎকাল পরে মহর্ষি নদী হতে সমুত্থান করে প্রসন্নচিত্তে এসে মুনিবৃন্দের মধ্যে আসন গ্রহণ করলেন এবং যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করে তাঁদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

…মুনিগণ জানালেন যে তাঁরা যে সমস্যা নিয়ে এসেছেন, যে বিতর্কের সমাধান তাঁরা করতে পারছেন না, তার একটি সিদ্ধান্ত মহর্ষির মুখ দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর ধ্যানের অবসানের কালে। ··কিন্তু মীমাংসা এমনই অদ্ভুত ও প্রত্যাশিত যে তার মর্মগ্রহণের নিমিত্ত তাঁরা উৎকণ্ঠিত চিত্তে অবস্থান করছেন।

…মহর্ষি সবই বুঝতে পারলেন। তিনি বললেন, '…কোন্ যুগ শ্রেষ্ঠ, কোন্ যুগ নিকৃষ্ট, কোন্ বর্ণ শ্রেষ্ঠ কোন্ বর্ণ নিকৃষ্ট, পুরুষের স্থান উচ্চে কিংবা নারীর স্থান উচ্চে—এই জাতীয় প্রশ্ন উদ্ভব হয় কোথা থেকে? তত্ত্ব-দৃষ্টিতে বিচার করলে এই সব প্রশ্নের সার্থকতা আছে কি?…সকলের মধ্যেই তো শিব সুন্দরের আত্মপ্রকাশ, সবই তো তিনি। কাকে বড় বলব, কাকে ছোট বলব?…প্রত্যেক যুগ, প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক বর্ণ, এমন কি প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের বৈশিষ্ট্যে গৌরবান্বিত। প্রত্যেকেই নিজের বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভগবানের লীলার পুষ্টিসাধন করছে, ভগবানের রস-সম্ভোগের উপকরণ যোগাচ্ছে।

মানুষ ব্যবহারিক দৃষ্টিতে প্রয়োজনের তুলাদণ্ডে উচ্চনীচ, ভালমন্দ, শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট প্রভৃতি ভেদের বিচার করতে থাকে। ব্যবহারিক জগতে প্রয়োজনের কেন্দ্রে থাকে মানুষের অহংকার ও বাসনা। ভেদের বিচারও তদনুযায়ী হয়ে থাকে।

অতএব মানব সমাজের প্রয়োজনের দৃষ্টিতে বিচার করলেও কোন শ্রেণীকে শ্রেষ্ঠ, কোন শ্রেণীকে নিকৃষ্ট বলে গণ্য করবার কোন হেতু নাই। সকলেই স্ব স্ব সামর্থ্য অনুসারে সমষ্টি জীবনের প্রয়োজনের সাধন করছে।

…সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বিচার করলে ইহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয় যে ভগবানকে লাভ করবার পথে সর্বাপেক্ষা প্রবল অন্তরায় মানুষের অহংকার এবং সর্বাপেক্ষা প্রকৃষ্টতম উপায় ভগবানে আত্মসমর্পণ।…অহংকারই ভগবান ও মানুষের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে।

…পূর্ব পূর্ব যুগের মানুষদের যেমন শক্তিসামর্থ্য, সাধনবল ও প্রাকৃতিক সম্পদ যথেষ্ট ছিল, তেমনি তাহাদের অহংকার পূর্ণ পরিপুষ্টি ছিল।

তাহাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল আপনাদের সাধন শক্তির উপর—ভগবানের করুণার উপর নয়। কাজেই করুণাময় ভগবান, প্রেমময় ভগবান, সুন্দর সুমধুর ভগবান, আপনজন ভগবানের সঙ্গে তাদের পরিচয় হয় নি।

কলিযুগে মানুষ আপন পুরুষকার সামর্থ্যে আস্থাহীন হইয়া সংসারের মধ্যেই ভগবানের সহিত মিলিত হইবার জন্য ভগবানের করুণার দিকে একলক্ষ্য হইয়া চাহিয়া থাকে, ভগবানের কাছে দেহেন্দ্রিয় মন বুদ্ধি নিবেদন করিয়া দিয়া প্রতীক্ষা করে এবং ভগবানও নিজে নেমে আসেন ভক্তের সহিত মিলিত হইবার জন্য।

সত্যযুগের অনুসন্ধেয় ভগবত্তত্ত্ব কলিযুগে মানুষের চক্ষুর সম্মুখে সমুপস্থিত প্রেমঘনমূর্তি নরলীলায় জীবন্ত ভগবান।

জাগতিক উচ্চাধিকার বঞ্চিত হয়েই শূদ্র ও নারী ভগবানের সান্নিধ্য-লাভের অধিকার সহজে অর্জন করেছে। আত্মসমর্পণ যোগ তাদের পক্ষে প্রায় স্বভাবসিদ্ধ।...

তাই তো কলি ধন্য, শূদ্র ধন্য, নারী ধন্য।'

উপরে বর্ণিত পৌরাণিক আখ্যায়িকা থেকে বুঝা যায় যে—অন্যান্য যুগে নারী ও শূদ্র ধর্মসাধনা থেকে দূরে সরে ছিল, কারণ তখনকার যুগের সাধনা প্রধানত ছিল পুরুষকার সাপেক্ষ জ্ঞানযোগের সাধনা। বর্তমান যুগের ভক্তিবাদীয় সাধনা, তন্মধ্যে আত্মসমর্পণ যোগই হলো নারী, শূদ্র ও সাধারণ স্তরের সাধনার পথ। শাস্ত্রমধ্যে নারী ও শূদ্রকে ধর্মসাধনা থেকে নানা বিধি-নিষেধের দ্বারা দূরে ঠেলে রাখা হয়েছিল। কিন্তু শরণাগতির সাধনা 'বিধিবাদীয়' সাধনার অন্তর্গত নয় বলে তাদের পক্ষে ধর্মসাধনা সহজ হয়েছে। অতি সাধারণ স্তরের দুর্বল মানুষের পক্ষে শরণাগতিই সহজ পথ।

গীতাতেও ভগবান বলেছেন (৯।৩২), হে পার্থ, যে সকল পাপজন্মা স্ত্রী, বৈশ্য অথবা শূদ্রগণ আমাকে আশ্রয়রূপে গ্রহণ করে তাহারাও পরমাগতি লাভ করিয়া থাকে। অতএব ভগবানের শরণ গ্রহণ দ্বারা সকলেই মোক্ষ

লাভ করিতে পারে।

আত্মসমর্পণকে শ্রীমদ্ভাগবতে অত্যন্ত মূল্য দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে (১১।১৯।৩২, ৩৫)—'যখন মানুষ সর্ব কর্ম বিসর্জন পূর্বক আমাতে আত্ম-সমর্পণ করেন, তখন তিনি আমার ইচ্ছায় যোগী-জ্ঞানী অপেক্ষায় অধিক জ্ঞানসম্পন্ন হন। অনন্তর তিনি অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া মদসদৃশ ঐশ্বর্য লাভের যোগ্য হইয়া থাকেন।'

'অহো! সর্ববিধ আনন্দের একমাত্র আকরস্থানীয় পরমাত্মস্বরূপ ভবদীয় চরণপদ্মে যিনি আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন, তাহাকে ভোগে পরিতৃপ্ত হইবার প্রত্যাশায় স্বজন, সুত, কলত্র, দেহ, গেহ, ধন, রত্ন, ক্ষেত্র, বিত্ত, শারীরিক বল এবং হস্তা, অশ্ব বা রথাদি কোন প্রকার প্রাকৃতিক ভোগ্য-বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। এক আপনার আশ্রয়েই তাঁহার সকল সাধ পূর্ণ হইয়া থাকে।'

ঈশ্বর-নির্ভরতা যদি আসে তবে ঈশ্বরের অনুগ্রহ বা কৃপালাভে সাধক ধন্য হয়ে যেতে পারে। তেমনি গুরুর ওপর শরণাগত ভক্ত, গুরুতে আত্ম-নিবেদিত ভক্ত গুরু-কৃপা লাভে ধন্য হয়ে যায়। গুরু-শিষ্যে আত্মনিবেদনের একটি বিশেষ মহিমার দিক আছে। এ বিষয়ে অনির্বাণের একটি উক্তি উল্লেখ করা হচ্ছে (প্রবচন ১ম)—

'গুরু-শিষ্যের মাঝে সমর্পণের মহিমা অনায়াস হয়ে ফুটে ওঠে, আর শক্তির স্ফুরণ হয় সেখানেই। কিন্তু জেনো, সমর্পণ উভয়তঃ। অর্থাৎ গুরুকেও শিষ্যে আত্মনিবেদন করতে হয়, আর শিষ্যকেও গুরুতে আত্মনিবেদন করতে হয়। যে কোনও তরফে অহমিকা থাকলে প্রেম থাকে না, আর প্রেম না থাকলেই আত্মসমর্পণের Philosophy of technique-এর কথা শুনতে পাই, অন্তরের ধন হাটের বেসাতি হয়ে দাঁড়ায়। গুরু-শিষ্যের ভালবাসা স্ত্রী-পুরুষের ভালবাসার চেয়েও গভীর। এ যুগে একটা মস্ত বড় Creative energyর বিকাশ আমরা দেখলাম—'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দে'র জীবনে। কি গভীর ভালবাসা, ভেবে দেখ দেখি! শুধু বিবেকানন্দের সমর্পণের কথাটাই ভেবো না, রামকৃষ্ণের আত্মবিসর্জনের দিকেও তাকিয়ে দেখো।'

বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে পরিচয় হবার পরে বার বার তাঁকে পরীক্ষা করেছেন, অবতার হিসাবে পূর্ণ বিশ্বাস প্রথমে তাঁর মনে জাগে নি। নানাভাবে পরীক্ষা করে বিবেকানন্দের সে বিশ্বাস এল, ক্রমে তা দৃঢ়তর হলো—ফলে পূর্ণ সমর্পণ শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট। আবার অন্য দিক থেকে দেখা যায় শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব ভালবাসা বিবেকানন্দের প্রতি। নরেন্দ্রনাথকে যেন তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন ভবিষ্যতের জন্য। সর্বশেষ দেখা যায়, কাশীপুরে দেহত্যাগের কদিন আগে নরেন্দ্রনাথকে তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে তাঁর সর্বস্ব আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়ে দিলেন···বললেন, আমি তোকে সব দিয়ে ফকির হলুম।

সাধক মতিলাল রায় 'আত্মসমর্পণ যোগ' পুস্তকে লিখেছেন, 'আত্মসমর্পণ যোগে তপস্যা নাই, কৃচ্ছ্রতা নাই, আসন প্রাণায়াম নাই, অথচ সবই আছে—কিন্তু তাহা সাধককে করিতে হয় না, প্রয়োজন হইলে ভগবান নিজেই করেন। আত্মসমর্পণের দীক্ষা সম্পূর্ণ হইলে জীব দ্রষ্টা—কর্তা হল ভগবান। ইষ্ট-বস্তুই সাধক হইয়া অন্তর্যামীর আসন গ্রহণ করেন।

'আত্মসমর্পণের দীক্ষা—লোকাচার প্রবর্তিত কোন অনুষ্ঠান নহে। ইহার কোন আয়োজন নাই, শব্দ-মন্ত্রেরও প্রয়োজন হয় না।···কিন্তু যোগের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে বস্তুর আবির্ভাব হয়, তখন গুরু-বস্তু, ঈশ্বর-তত্ত্ব প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে।

'আত্মসমর্পণ যোগীর নিজের কোন প্রয়োজন থাকে না। ভগবানের হাতে আপনাকে ছাড়িয়া দেওয়ায়, অহংকার আমূল উৎপাটিত হয়। ভগবানের প্রয়োজনেই তাহার প্রয়োজন, ভগবানের ইচ্ছা পূরণের জন্যই তার জীবন। এই হেতু মুক্তি, মোক্ষ, অণিমাদি ঐশ্বর্য সে তুচ্ছ মনে করে।'

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে (৩।৯।৫)—'শ্রীব্রহ্মা বলিলেন, যাহারা শ্রুতিরূপ বায়ুর সাহায্যে তোমার পাদপদ্ম নিঃসৃত গন্ধ প্রাপ্ত হইয়া কর্ণবিবর দ্বারা আঘ্রাণ করেন অর্থাৎ যাঁহারা প্রেমলক্ষণ যুক্ত ভক্তিযোগে এবং ভবদীয় চরণপদ্মই পরম পুরুষার্থরূপে গ্রহণ করেন এবং প্রকৃত ভক্তিমান হইয়া তোমার চরণ সার ভাবিয়া তাঁহার শরণ লন, তাঁহারাই তোমার আপন,

তাঁহাদের হৃদয় কমল হইতে আপনি কখনও দূরগত হন না।'

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'শ্রীভগবানকে মন সমর্পণ করিলে সেই মনে স্বাত্মাভাব হেতু কিরূপে সেই মনকে ভগবান হইতে বিমুক্ত করিবে? কিরূপেই বা দত্তাপহারী হইবে? তাহা হইলে দুর্নিবার নিন্দাই হইবে।

'ভক্তও ভগবান হইতে মন ফিরাইতে পারেন নাই, ভগবানও সেই ভক্তের হৃদয় ত্যাগ করিতে পারেন না।'

অতএব সমর্পণের মহিমা শুধু গুরু-শিষ্যেই দেখা যায় তা নয়, ভক্ত ও ভগবানে একইভাবে দৃষ্ট হয়। বৃন্দাবনলীলায় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গোপীবালাদের এই মহিমা বিশেষভাবে প্রকট।

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণনা আছে (১১।২।৫৫)—'উপাসনার অভ্যাসে যাঁহার চিত্ত এতই প্রস্তুত হইয়াছে যে, অবশভাবে একবার স্মরণ করিবামাত্র সর্বপাপ বিনাশন সাক্ষাৎ কমললোচন কৃষ্ণ যেন প্রণয়-রজ্জুতে বদ্ধ-চরণ হইয়া যাঁহার হৃদয়-মন্দির কখনও পরিত্যাগ করেন না, তিনিই ভাগবত-শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিকীর্তিত হইয়া থাকেন।'

'সাধুগণ আমার হৃদয় এবং আমিও সাধুগণের হৃদয়। তাঁহারা আমা ব্যতীত অন্য কাহাকেও জানেন না। আমিও তাঁহাদের ছাড়া আর কিছুই জানি না।' (৯।৪।৬৮)

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী গীতার একটি শ্লোক (৪।১১) ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'যাঁহারা যেভাবে আমাতে প্রপন্ন হন, তাঁহাদিগকে সেইভাবেই আমি ভজনা করি' নিয়মানুসারে কৃষ্ণও তাহাতে আত্মসমর্পণ করেন। নিরন্তর দিব্য অমৃতরস আস্বাদনকারী জনের মৃত্তিকা রুচি হয় না। এই নিয়মে ভক্ত যেমন ভক্তিবৃত্তিতে ভগবানে সমর্পিতাত্মা, ভক্তি-বাধ্য ভগবানও সেই ভক্তে সমর্পিতাত্মা। অর্থাৎ ভগবান ঐরূপ ভক্তের অপ্রাকৃত চক্ষুকর্ণাদি দ্বারা স্বীয় সৌন্দর্য, সৌরভ্য, সৌশ্বর্যাদি অনুভব করাইয়া সর্বদা তাঁহার হৃদমন্দিরে আবদ্ধ থাকেন।

'ভক্তগণ যেমন আপনার চরণ-পদ্মেই লোভী, তাহা ত্যাগ করেন না,

আপনিও তাহাদের প্রেম-মাধুর্যময় হৃদয়াম্বুজেই লোভী, তাহা ত্যাগ করেন না। (অর্থাৎ ভক্ত আপনার বশ, আপনিও ভক্তবশ) এইরূপ পরস্পরের বশাকার সূচিত হয়।'

তুলসীদাসের একটি কথা—'যো যাকে শরণ লিয়ে সে রাখে তাকে লাজ। উলট জলে মছলি চলে, বহি যায় গজরাজ॥'

যে যাকে শরণ নেয়, সেই শরণ্য শরণাগতের সম্মান রক্ষা করে থাকে। মাছ জলের শরণে আশ্রয়ে অবস্থান করে, তাই জলের স্রোতের বিরুদ্ধেও মাছ জলের আশ্রয় চলতে পারে। কিন্তু হাতি তার বিরাট দেহ নিয়ে স্রোতের বিরুদ্ধে যেতে পারে না, বরং নদীর জলে ভেসে যায়—যেমন গঙ্গার ঢেউ-এ ঐরাবত ভেসে গিয়েছিল।

তুলসীদাসের আর একটি কথা—'তোম জ্যায়সা রাম পর, তোমসে ত্যায়সা রাম। ডাইনে যাও তো ডাহিনে যায়, বামে যাও তো বাম॥'

তুমি যেমন রামের অনুগত, রামও তেমনি তোমার অনুগত। তুমি ডান দিকে গেলে রামও ডান দিকে যান, তুমি বাঁয়ে গেলে রামও বাঁদিকে যান।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'ভগবানের দিকে যে একা পা এগিয়ে যায়, ভগবান তার দিকে দশ পা এগিয়ে আসেন।' ভগবানের ওপর যে সম্পূর্ণ নির্ভর করেছে, ভগবানও তার ভার লন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, 'নাবালকেরই অছি।' ভক্ত যেন নাবালকের মতো অভিভাবক হিসাবে, অছি হিসাবে ঈশ্বরের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেন, ঈশ্বরও সেরূপ নাবালক ভক্তের ভার লন, তার সমস্ত ব্যবস্থা করেন। আর তেমন ভক্ত হলে ঈশ্বরও তাঁর প্রয়োজনীয় শক্তি ভক্তকে দেন, ভক্তের ওপর নির্ভরশীল হন। ভগবান ভক্তাধীন হন। গীতাতে ঈশ্বরের অঙ্গীকারও রয়েছে—ভগবান সেরূপ ভক্তের জন্য 'যোগ ও ক্ষেম' অর্থাৎ প্রয়োজনীয় সব কিছু বহন করে নিয়ে যান।

রাজা অম্বরীষ ছিলেন পরম হরিভক্ত। তিনি অনেক ব্রতপার্বণ করতেন এবং সেই সঙ্গে দান ধ্যানও করতেন প্রচুর। ব্রাহ্মণ ও মুনি ঋষিদের প্রতি

তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা ছিল এবং তাদের যথাযোগ্য সেবা করতেন।

একবার রাজা অম্বরীষ শ্রীহরির আরাধনায় দ্বাদশীব্রত অনুষ্ঠান করেন। ব্রতশেষে কার্তিক মাসে তিন দিন উপবাসের পর কালিন্দী নদীতে স্নান করে চতুর্থ দিনে বিধিমত মুনি-ঋষিদের পর্যাপ্ত দান ভোজনাদির ব্যবস্থা করলেন এবং তৎপর তাঁদের অনুমতি নিয়ে ব্রতপারণের উপক্রম করেছেন, এমন সময় দুর্বাসা মুনি এসে উপস্থিত হলেন। রাজা খুশী হয়ে তাঁকে পাদ্য-অর্ঘ্য দিলেন এবং অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা করলেন। দুর্বাসা মুনি তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করে নদীতে স্নানাহ্নিক করতে গেলেন।

মুনির ফিরে আসতে বিলম্ব হচ্ছে দেখে রাজা চিন্তিত হলেন। এদিকে দ্বাদশী তিথিও পেরিয়ে যাচ্ছে দেখে রাজা অম্বরীষ অন্যান্য মুনিঋষিদের পরামর্শে বিষ্ণুপাদোদক গ্রহণ করলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে দুর্বাসা ফিরে এলেন।

অতিথিকে ভোজনাদি প্রদান না করে রাজা পূর্বেই পারণ করছেন দেখে অপমানে ক্ষুব্ধ দুর্বাসা ক্রোধে অধীর হয়ে জটা থেকে এক গাছা চুল মাটিতে ছুড়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই এক ভীষণ দৈত্যের আবির্ভাব হলো। দৈত্যটি একটি বিরাট খড়্গ নিয়ে অম্বরীষকে বধ করতে উদ্যত হলো।

এদিকে ভগবান বিষ্ণু তাঁর নির্দোষ ভক্তের উপর অত্যাচার হচ্ছে দেখে অম্বরীষকে রক্ষা করার জন্যে তাঁর সুদর্শন চক্র পাঠিয়ে দিলেন। সেই চক্র এসে দৈত্যকে তৎক্ষণাৎ বধ করে দুর্বাসার দিকে অগ্রসর হলো। প্রাণের ভয়ে দুর্বাসা এবার ছুটতে লাগলেন। তিনি যেদিকে যান চক্রও তাঁকে অনুসরণ করে। দুর্বাসা স্বর্গ মর্ত্য পাতাল—সর্বত্র ছুটে বেড়াতে লাগলেন, কিন্তু কোথাও সুদর্শন চক্রের হাত থেকে বাঁচাবার মতো আশ্রয় পেলেন না। অবশেষে মুনি বৈকুণ্ঠে গিয়ে শ্রীহরির পাদমূলে গিয়ে পড়লেন আর প্রার্থনা করলেন, 'হে বিশ্বপতি প্রভু, আমি অপরাধ করেছি, আমাকে রক্ষা করুন।'

শ্রীভগবান বললেন, 'হে ব্রহ্মন্, আমি ভক্তের অধীন, সুতরাং আমি স্বাধীন নই, স্বতন্ত্র নই। আমি ভক্তজনপ্রিয়, ভক্তেরা আমার হৃদয় সর্বথা

গ্রাস করে রয়েছেন। আমি যাঁদের পরমাগতি, সেই সাধুভক্তজন বিনা আত্যন্তিকী শ্রীকেও আমি প্রীত করি না। যাঁরা স্ত্রী-পুত্র গৃহ স্বজন ধন, এমন কি ইহপরলোক সমস্ত ত্যাগ করে আমার শরণ গ্রহণ করেন, আমি কি করে তাঁদের পরিত্যাগ করতে পারি?···অতএব হে মুনি, আমি তোমাকে রক্ষা করতে অক্ষম। যার নিকট তোমার এই অপরাধ হয়েছে, তুমি শীঘ্র সেই মহাভাগবত অম্বরীষের নিকট যাও, তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তবেই তোমার অপরাধের শান্তি হবে।' (ভাগবত—৯।৪।৬৩-৬৮)

দুর্বাসা অম্বরীষের নিকট ফিরে এসে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। শরণাগতকে রাজা আশ্রয় দিলেন। বিষ্ণুচক্র বৈকুণ্ঠে ফিরে গেল। রাজা অম্বরীষ দুর্বাসা মুনির চরণদ্বয় ধারণ করে তাঁকে খুশিমত ভোজন করালেন, নিজেও ভোজন করলেন।

শরণাগত ভক্তকে ভগবান সর্ব সময়ে সর্ব বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করেন, এ বিষয়ে আরও অনেক দৃষ্টান্ত পৌরাণিক কাহিনীতে পাওয়া যায়।

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর কনিষ্ঠ পুত্র প্রহ্লাদ অতি বাল্যকাল থেকেই শ্রীহরির ভজনে নিমগ্ন। দৈত্যগুরু শুক্রচার্যের পুত্র ষণ্ড ও অমর্কের নিকট তার পড়াশুনা আরম্ভ হয়। প্রহ্লাদ পড়তে গিয়ে সর্বদা শ্রীহরির নাম গুণগান করত। একদিন ছেলেকে আদর করে দৈত্যরাজ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এতদিনে কী কী শিখেছ বল। প্রহ্লাদ বললেন, এই অন্ধকূপ সদৃশ সংসার ত্যাগ করে অরণ্যে গিয়ে শ্রীহরির শরণ গ্রহণ করাই আমি উত্তম মনে করি।

বালকের মুখে শত্রুর স্তুতি শুনে দৈত্যরাজ অবাক হলেন। তাকে আরো ভালোভাবে শিক্ষা দেবার নির্দেশ আচার্যগণকে দিলেন। কিছুদিন পরে আবার একদিন কনিষ্ঠ পুত্রকে ডেকে হিরণ্যকশিপু বললেন, তুমি যা শিখেছ তার মধ্যে সর্বোত্তম যা তা আমায় বল।

প্রহ্লাদ বললেন, শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নবলক্ষণা ভক্তি বিষ্ণুকে অর্পণ করাই সর্বোত্তম শিক্ষা।

রাজা ছেলের মুখে এই অবিশ্বাস্য কথা শুনে ক্রোধে অন্ধ হয়ে ছেলেকে কোল থেকে মাটিতে নিক্ষেপ করে অসুরকে বললেন, একে হত্যা কর। ভীষণদর্শন অসুরগণ বালককে তীক্ষ্ণ শূল দিয়ে আঘাত করল, কিন্তু বালকের কিছুই হলো না। তারপর রাজার নির্দেশে হাতীর পদতলে, বিষাক্ত সর্পের দংশনে, বিষদানে, উপবাসে, পর্বতশৃঙ্গ থেকে নিক্ষেপ করে পর পর তাকে হত্যা করার চেষ্টা হলো। কিন্তু শ্রীহরির স্মরণ, মনন ও শরণাগতিতে প্রহ্লাদ এমন তন্ময় ও দেহবুদ্ধি রহিত ছিল যে তার কোনো অনিষ্ট হলো না। ভগবান সর্ববস্থায় তাকে রক্ষা করলেন।

এরপর বালককে আবার গৃহে আবদ্ধ রেখে পড়াশুনার ব্যবস্থা হলো। কিন্তু শ্রীহরির ভজনাই তার প্রধান শিক্ষা। সে তার সমবয়স্ক অন্যান্য বালকদের বিষ্ণুর আরাধনা শেখাতে লাগল। খবর পেয়ে রাজা তাকে ডেকে বললেন, সমস্ত লোকপাল আমার ভয়ে ভীত। আমার ভজনা ছেড়ে কার বলে তুই শত্রুর ভজনা করতে সাহস পাচ্ছিস? প্রহ্লাদ বললে, শ্রীভগবানই সকল বলীর বল। ক্রোধোন্মত্ত অসুররাজ চীৎকার করে বললেন, আমি ছাড়া আর ঈশ্বর কোথায়? এই স্তম্ভে কি তোর ঈশ্বর আছে? আজ এই খড়্গে তোর মস্তক ছেদন করব, দেখি তোর হরি তোকে কীভাবে রক্ষা করে।

সিংহাসন থেকে উঠে রাজা পুত্রের দিকে অগ্রসর হয়ে সম্মুখের স্তম্ভে সজোরে আঘাত করলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে সেখানে নৃসিংহ মূর্তি আবির্ভূত হয়ে হিরণ্যকশিপুকে বধ করলেন। পরে প্রহ্লাদের স্তবস্তুতিতে সন্তুষ্ট হয়ে নৃসিংহদেব তাকে বর প্রদান করে অন্তর্হিত হলেন।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে—মহিষাসুর যুদ্ধে দেবতাদের পরাজিত করলে দেবগণ স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হলেন। দেবতারা তখন ব্রহ্মাকে সঙ্গে নিয়ে বিষ্ণু ও শিবের নিকট উপস্থিত হয়ে মহিষাসুরের কার্যকলাপ ও দেবতাদের পরাজয়ের কথা তাঁদের কাছে বললেন। দেবতারা সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত, স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করছেন, ইত্যাদি বিবরণ দিয়ে দেবতারা বললেন, আমরা আপনাদের শরণাগত। মহিষাসুর

বধের উপায় আপনারা চিন্তা করুন।

দেবতাদের দুঃখের বিবরণ শুনে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর অতিশয় ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁদের মুখ থেকে প্রচণ্ড তেজ নিঃসৃত হলো। ইন্দ্রাদি অপর দেবতাদের শরীর থেকেও বিপুল তেজ নির্গত হলো। এই সমস্ত তেজ একত্রিত হয়ে একটি নারীমূর্তি পরিগ্রহ করল। সেই নারীকে সমস্ত দেবতা নানাবিধ অলংকার অস্ত্রশস্ত্র ও বাহন প্রদান করলেন। তিনিই দেবী চণ্ডিকা, অম্বিকা বা দুর্গা নামে কথিত হলেন।

অতঃপর দেবী প্রথমে মহিষাসুরের সৈন্যদেব, পরে মহিষাসুরকে বধ করলেন। মহিষাসুরের বধে দেবতারা আনন্দিত হয়ে দেবীর স্তবস্তুতি করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে 'গজেন্দ্রোপাখ্যানে'ও গজরাজ ও কুম্ভীরের যুদ্ধ-কাহিনী বর্ণনা আছে। ক্ষীরোদ সমুদ্রদ্বারা পরিবেষ্টিত ত্রিকূট নামে একটি প্রসিদ্ধ ও রমণীয় পর্বত আছে। সেই পর্বতটি নানাবিধ বৃক্ষ-লতা-গুল্ম যুক্ত এবং নানাবিধ রত্ন ও ধাতুদ্বারা শোভিত। সেই পর্বতের সন্ধিস্থলে ভগবান বরুণের ঋতুমান নামে একটি উদ্যান এবং তার মাঝে কমলশোভিত বিশাল একটি সরোবর আছে।

একদিন জঙ্গল থেকে একটি বিরাটদেহী গজরাজ হস্তিনিগণ ও শাবকগণ সহ উদ্যানে এসে উপস্থিত হলো। তারা তৃষ্ণার্ত হয়ে সরোবরে জলপান ও জলকেলি করতে লাগল। এমন সময়ে সেই সরোবরস্থিত একটি মহা-বলশালী কুম্ভীর হস্তিগণের উৎপাতে ক্রুদ্ধ হয়ে গজরাজের একটি পা কামড়ে ধরলে। গজরাজও যথাশক্তি প্রয়োগ করে কুম্ভীরের আক্রমণ থেকে রেহাই পেতে চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু কুম্ভীরের কামড় থেকে তার পা কিছুতেই ছাড়াতে পারলে না।

গজরাজের বিপদ দেখে হস্তিনিগণ চীৎকার করতে লাগল। হস্তিযূথের বিপদ হয়েছে বুঝতে পেরে নিকটবর্তী জঙ্গল থেকে আরও অনেক হস্তী এল, কিন্তু গজরাজকে কুম্ভীরের আক্রমণ থেকে উদ্ধার করতে পারলে না। নানাভাবে গজরাজ ও কুম্ভীরে আক্রমণ ও প্রতিআক্রমণ চলতে লাগল। এইভাবে হাজার বছর তাদের যুদ্ধ চলল।

গজরাজ এবার ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তার উৎসাহ, দেহবল, ইন্দ্রিয়শক্তি ক্ষয় হতে লাগল। অন্যদিকে জলে থেকে কুম্ভীরের শক্তি সামর্থ্য বেড়ে গেল। গজরাজ প্রাণসংকটে পতিত হয়ে হতাশ ও বিহ্বল হয়ে এরূপ চিন্তা করল —আমার জ্ঞাতি হস্তিগণও আমাকে উদ্ধার করতে পারল না, নিশ্চয়ই তাহলে কুম্ভীররূপে বিধাতার দৈবপাশই আমাকে আবদ্ধ করেছে। অতএব আমার উচিত সেই পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হওয়া, যিনি শরণাগতকে রক্ষা করে থাকেন। মৃত্যুও যাঁর ভয়ে পলায়ন করে, আমি তাঁরই আশ্রয় গ্রহণ করব।

এই চিন্তা করে গজরাজ অন্তরের আকুলতায় ও তীব্র ব্যাকুলতা নিয়ে ভগবান শ্রীহরির শরণ গ্রহণ করে স্তবস্তুতি প্রার্থনা করতে লাগল— 'অন্ধকারের পরপারে যিনি বিভুরূপে বিরাজ করেন, দেবতা এবং ঋষিগণও যাঁর স্বরূপ জানতে পারে না, আমি তাঁর শরণ গ্রহণ করি, তিনি আমাকে রক্ষা করুন। সর্বত্যাগী, আত্মদর্শী সাধু মুনিগণ যাঁর দর্শন-কামনায় বনবাসী হয়ে ব্রহ্মচর্যাদি ব্রত পালন করেন, তিনিই আমার আশ্রয় হোন। যিনি চতুর্বর্গপ্রার্থী ভজনকারী পুরুষগণকে অভিলষিত বস্তু দান করেন, সেই করুণাময় আমাকে মুক্ত করুন। আমি কেবলমাত্র এই কুম্ভীরগ্রাস হইতে মুক্তি চাই না—অন্তরে বাইরে অজ্ঞানদ্বারা আচ্ছন্ন এই হস্তি-জন্মের প্রয়োজন কি? যিনি বিশ্বাতীত হয়েও বিশ্বরূপে বিরাজ-মান, যিনি বিশ্বাত্মা, জন্মরহিত পরমপদস্বরূপ—সেই ব্রহ্মবস্তুকে প্রণাম করি, শরণাগতরক্ষক সেই আপনাকে প্রণাম করি।' ইত্যাদি স্তবস্তুতিতে গজরাজ পরমেশ্বরের আরাধনা করতে লাগল। মনের দিক থেকে সে সম্পূর্ণ শরণাগত হয়ে রইল।

ভগবান শ্রীহরি গজেন্দ্রকে এরূপ পীড়িত লক্ষ্য করে এবং তার স্তবে তুষ্ট হয়ে তার নিকট গরুড়-বাহনে উপস্থিত হলেন। গজরাজের কাতরতা ও আর্তি দেখে কৃপাপরবশ হয়ে গরুড়ের সাহায্যে কুম্ভীরসহ গজরাজকে জল থেকে তুলে আনলেন এবং চক্রদ্বারা কুম্ভীরের মুখ বিদীর্ণ করে গজরাজকে উদ্ধার করলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত আছে যে যিনি রাত্রিশেষে জাগ্রত হয়ে গজেন্দ্র-মোক্ষণের এই বৃত্তান্ত পাঠ করেন এবং ঈশ্বরের বিভূতিরূপে এই জীব-জগতকে স্মরণ করেন, তিনি সর্বপাপ থেকে মুক্ত হন এবং ঈশ্বরের এই স্তুতি দ্বারা মৃত্যুকালে উত্তম গতি প্রাপ্ত হন।

অনেক শরণাগত ভক্ত নানা বিপদের সময়ে গজেন্দ্রমোক্ষণের এই স্তবটি (৮।৩ অধ্যায়) শ্রদ্ধাচিত্তে পাঠ করে থাকেন। তদ্দ্বারা মনে যেমন শান্তি-লাভ করে থাকেন তেমনি বিপদের হাত থেকে তাঁরা রক্ষা পেয়ে যাবেন বলে তাঁরা মনে করেন। নিয়মিত এই স্তবপাঠকে অনেকে শরণাগতির একটি সাধন হিসাবেও গ্রহণ করে থাকেন।

কপট পাশা খেলায় যুধিষ্ঠির শকুনির কাছে হেরে গিয়ে পাণ্ডবেরা সবকিছু হারালেন—তের বছরের বনবাস হলো, আবার দ্রৌপদীর সম্মান নষ্ট হবার উপক্রম হলো। দুঃশাসন দ্রৌপদীর পরিধেয় বস্ত্র খুলে নেবার চেষ্টা করলে দ্রৌপদী তাঁর স্বামীদের অধোবদন দেখে লজ্জা সম্মান রক্ষার জন্যে ত্রাণকর্তা মধুসূদনকে কাতরভাবে প্রার্থনা জানাতে লাগলেন। মধুসূদন সেই মুহূর্তে আবির্ভূত হয়ে দ্রৌপদীর লজ্জা সম্মান রক্ষা করলেন—বস্ত্র দীর্ঘতর হতে লাগল।

আর একবার যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীকে ভগবান বিপদ থেকে রক্ষা করেছিলেন। পাণ্ডবগণ তখন বনবাসে, কাম্যকবনে আছেন। দুর্যোধন মহাসুখে রাজত্ব করছেন। এই সময়ে দশ হাজার শিষ্যসহ মুনি দুর্বাসা দুর্যোধনের অতিথি হলেন। দুর্যোধন যথাযথভাবে তাঁর সেবা করলেন এবং পরে বললেন, 'যুধিষ্ঠির কাম্যক বনে আছে, আপনি গেলে পাণ্ডবরা খুশী হবে।'

দশ হাজার শিষ্যসহ দুর্বাসা বনমধ্যে অতিথি হলে যুধিষ্ঠির বিপদে পড়বেন, মুনির সেবাযত্ন ঠিকমত হবে না, ফলে মুনি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁদের অভিশাপ দেবেন—এই ছিল দুর্যোধনের মুনিকে পাঠাবার মতলব। মুনি একদিন রাত্রিবেলা সত্যি সত্যি শিষ্যদল সহ যুধিষ্ঠিরের কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, 'আমরা নদীতে গিয়ে স্নান আহ্নিক সেরে আসছি,

আমাদের আহারাদির ব্যবস্থা কর। আমরা এখানেই থাকব।'

যুধিষ্ঠির চিন্তিত হলেন। তিনি দ্রৌপদীর শরণাপন্ন হলেন। সূর্যের বরে দ্রৌপদীর হাঁড়ির ভাত দ্রৌপদী না খাওয়া পর্যন্ত শেষ হত না। কিন্তু সূর্যাস্তের পর ঐ হাঁড়ির অফুরন্ত অন্নদানের ক্ষমতা থাকত না। সুতরাং দ্রৌপদীও নিরুপায়। তিনি আসন্ন বিপদের কথা বুঝতে পেরে শ্রীকৃষ্ণের শরণ নিলেন। অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীর আহ্বানে তৎক্ষণাৎ সেখানে হাজির হয়ে দ্রৌপদীর কাছে কিছু খাবার চাইলেন। কিন্তু ঘরে কোনো খাবারই ছিল না। দ্রৌপদীকে চিন্তিত দেখে শ্রীকৃষ্ণ নিজে রান্নাঘরে গিয়ে হাঁড়িতে কয়েক কণা অন্ন ও শাক পেলেন। তাই তিনি গ্রহণ করে পরিতৃপ্তির ঢেকুর তুলতে লাগলেন। তারপর তিনি যুধিষ্ঠিরাদির সঙ্গে দেখা করে বললেন, 'তোমরা নিশ্চিন্ত হও, সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে।'

শ্রীকৃষ্ণ যখন ঢেকুর তুলছিলেন তখন স্নান-আহ্নিকরত দুর্বাসা ও শিষ্যগণ হঠাৎ অনুভব করলেন যে তাঁদের ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়ে গেছে। সে রাত্রে তাঁরা আর ফিরে এলেন না। পরদিন সকালে এসে খুশী হয়ে যুধিষ্ঠিরকে আশীর্বাদ করে অন্যত্র চলে গেলেন।

শরণাগত ভক্তকে ভগবান কত বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করেন এ যুগেও তার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। বহু সাধক ও ভক্তের জীবন থেকে এরূপ উদাহরণ পাওয়া যায়।

স্বামী বিবেকানন্দ পরিব্রাজক অবস্থায় হিমালয়ে ঋষীকেশে একবার খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। অবস্থা এমন খারাপ হয়ে পড়েছিল যে তাঁর সঙ্গী গুরুভাইগণ অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন। এমন সময় হঠাৎ এক সন্ন্যাসী উপস্থিত হয়ে স্বামীজীর অসুখের কথা শুনে এক পুরিয়া ঔষধ দিয়ে চলে যান। সেই ঔষধে কাজ হলো, স্বামীজী ধীরে ধীরে সুস্থ হলেন।

উত্তরপ্রদেশে আলমোড়া অঞ্চলে ভ্রমণের কালে বিবেকানন্দ একদিন ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় এত কাতর হয়ে পড়েন যে তাঁর মনে হয়েছিল, কিছু না খেতে পেলে তাঁর শরীর থাকবে না। সে সময়ে কোথা থেকে এক মুসলমান ফকির এসে স্বামীজীর অবস্থা দেখে তাঁর সম্বল একটি শশা তাঁকে খেতে

দিলেন। সেই শশা খেয়ে স্বামীজী সুস্থ বোধ করেছিলেন।

পরিব্রাজক অবস্থায় কেউ কিছু না দিলে স্বামী বিবেকানন্দ খেতেন না। হেঁটেই চলতেন, কেউ টিকিট কিনে দিলে ট্রেনে যেতেন। পয়সা সঙ্গে থাকত না। সম্পূর্ণ শরণাগত অবস্থায় তিনি ছিলেন—শরণাগতির পরীক্ষাও নিজের ওপর করতেন। একবার ট্রেনে যাচ্ছেন, দুদিন খাওয়া হয় নি—সঙ্গী এক যাত্রী সপরিবারে নানাবিধ খাবার খেয়ে যাচ্ছে, স্বামীজীকে একবার জিজ্ঞেসও করছে না। এক স্টেশনে নেমে প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যে বিশ্রামের স্থান না পেয়ে স্বামীজী এক পাশে অপেক্ষা করছেন, এমন সময় এক খাবারওলা নানাবিধ খাবার, জল নিয়ে স্বামীজীর কাছে হাজির হলো। সে স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে স্বামীজীর জন্যে খাবার নিয়ে স্টেশনে এসেছে। স্বামীজী ঈশ্বরের অপার করুণা ও শরণাগতকে রক্ষার মহিমা উপলব্ধি করলেন।

আমেরিকায় গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ অচেনা অজানা বন্ধুবান্ধবহীন জায়গায় এক একবার ভীষণ বিপদে পড়েছেন। থাকবার জায়গা না পেয়ে স্টেশনে কাঠের বাক্সের মধ্যেও প্রচণ্ড শীতে রাত কাটিয়েছেন, চিকাগো ধর্মমহাসভার ঠিকানা এবং যোগদানের পরিচয়পত্র পেয়েও তা হারিয়ে দিশেহারা হয়েছেন—ভগবানের কৃপায় আশ্চর্যভাবে পরে সব যোগাযোগ হয়েছে। পরবর্তীকালে কী দারুণভাবে তিনি সর্বত্র সমাদৃত হয়েছেন, আজ তা ইতিহাস হয়ে রয়েছে। স্বামীজী বলেছেন, তাঁর নিজের ইচ্ছায় কিছুই হয় নি—ঠাকুরই হাত ধরে তাঁকে দিয়ে সব কাজ করিয়ে নিয়েছেন।

এরূপ অনেক ঘটনা অনেক মহাপুরুষের জীবনেই পাওয়া যায়। অনেক ভক্তও নানাভাবে ঈশ্বর-কৃপা অনুভব করেন। এ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়—মহাপুরুষ, সাধক ও ভক্তগণ সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন যে শরণাগতকে ভগবান সর্বদা রক্ষা করেন। কোনো কোনো সময়ে তাঁরা নিজেদের ঈশ্বর-বিশ্বাস ও নির্ভরতার পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করেন এই সমস্ত বিপদ আপদের মধ্য দিয়ে।

'শরণাগতি'ই শরণাগতির শেষ কথা। শরণাগতের কোনো দাবী নেই, কোনো

অধিকার সে চায় না, তাঁর প্রার্থনাও একমাত্র শরণাগতি। শরণাগতির মহিমা কীর্তন মানে কোনো অর্থবাদ বা প্রশংসাবাদ নয়—'শরণাগতি' সাধকের একটি অনুভব। এটি স্বসংবেদ্য। শরণাগত জীবনকে, জগতকে এক নতুন দৃষ্টিতে দেখে থাকে। যেহেতু সে নিজেকে একটি যন্ত্ররূপে প্রত্যয় করে, সে জন্যে তার দৃষ্টিভঙ্গি পালটে যায়। তিনি রক্ষা করুন বা না করুন, সুখ বিধান করুন বা না করুন—শরণাগত সর্বাবস্থায় তাঁর মহিমা উপলব্ধি করে। মঙ্গলময়ের কৃপা করুণা অনুভব করে শরণাগত সর্বদা শান্তিতে ও আনন্দে অবস্থান করে থাকে। গীতাঞ্জলির প্রার্থনার ভেতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথের চিরন্তন আকুতি শরণাগতের জীবনকে ধন্য করে, মহিমময় করে তোলে—

তোমারি ইচ্ছা করো হে পূর্ণ
আমার জীবনমাঝে।

ভগবান শংকরাচার্য 'বিবেকচূড়ামণি'তে যে প্রার্থনা উল্লেখ করেছেন, শরণাগত সাধকের সে প্রার্থনা অবলম্বনীয়—

'দুর্বারসংসার-দাবাগ্নিতপ্তং দোধুয়মানং দুরদৃষ্টবাতৈঃ।
ভীতং প্রপন্নং পরিপাহি মৃত্যোঃ শরণ্যমন্যদ্‌যদহং না জানে॥'

'আমি এই দুর্বার সংসার দাবানলে জ্বলে পুড়ে মরছি, তদুপরি আমার প্রাক্তন কর্মজনিত দুর্ভাগ্য বায়ুতে সে অগ্নি প্রচণ্ডরূপে প্রজ্বলিত হচ্ছে। আমি জন্ম মৃত্যুর আবর্তে অনন্তকাল থেকে ঘুরপাক খাচ্ছি। নিস্তারের পথ খুঁজে পাচ্ছি না। আসন্ন মৃত্যুর করাল কবলে পতিত এই দীন, ভয়ার্ত সন্তানকে আপনি রক্ষা করুন। আমি আপনার শরণাগত। আপনি ভিন্ন আমি যে আর কিছুই জানি না।'

১।

সাধনের সারসংক্ষেপ

শরণাগতির সাধন বিষয়ে এই পুস্তকে যা সংকলিত এবং বর্ণিত হয়েছে সাধকের সুবিধার জন্যে সারসংক্ষেপ রূপে এ অধ্যায়ে পুনরুল্লিখিত হলো। বিভিন্ন মহাপুরুষদের সাধনার বিভিন্ন দিক, শাস্ত্রীয় দিক সদা সর্বদা জাগরূক রাখার জন্যে সংক্ষেপে বর্ণনা স্মরণ মননের পক্ষে সহজ হতে পারে।

ঈশ্বরলাভ ভগবানের কৃপার ওপর নির্ভর করে—একথা বিভিন্ন শাস্ত্র বলেছেন, মহাপুরুষগণও তাহা বলেন। ভক্তিবাদী, জ্ঞানবাদী—সকলের মতও তাই। এই কৃপা লাভ করতে হলে 'শরণাগতি'ই হবে শ্রেষ্ঠ পথ—এ বাক্যও মহাপুরুষদের। ভগবানে যিনি শরণাগত, ভগবান তাকে কৃপা করেন, তিনি শরণাগতকে সাধ্য বস্তু দান করেন।

এই 'শরণাগতি' শুধু কৃপা লাভের একটি পথ তাই নয়—শরণাগতি সাধনারও একটি পথ। শরণাগতির সাধনার দ্বারা ঈশ্বর-লাভ সম্ভব—এ কথা শাস্ত্র ও মহাপুরুষগণ নানাভাবে বলেছেন। শরণাগতি শুধু সাধকের একটি লক্ষণ নয়, শরণাগতি শুধু সাধকের একটি অবস্থা নয় অথবা সিদ্ধি-লাভের পরবর্তী অবস্থাই শুধু নয়— শরণাগাতি একটি প্রকৃষ্ট সাধন।

শরণ অর্থে বুঝায় আশ্রয়, শরণাগতি অর্থে আশ্রয় লাভ। যে শরণাগত সে ভগবানের আশ্রিত—এই ভাব নিয়ে থাকবে, তার সব নির্ভর ভগবানের ওপর। তিনিই সব কিছু করছেন করাচ্ছেন এইটি সর্বদা অনুভব করার চেষ্টা শরণাগত করে থাকে এবং তাঁতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে। একেই বলা হয় প্রপত্তি। শরণাগতের নিজস্ব ইচ্ছা অনিচ্ছা কিছুই থাকে না, নিজের ইচ্ছাকে ঈশ্বরেচ্ছার সঙ্গে মিলিয়ে দেয়—সর্বদা ঈশ্বরেচ্ছা অনুভব করে জীবনকে পরিচালিত করে। আবার, শরণাগত যেমন নিজে কোনো সংকল্প করতে

পারে না, মতলব করে কাজ করতে পারে না, পরিকল্পনা করতে পারে না —তেমনি শরণাগত নিজে কোনো কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয় করতে পারে না। কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণেও ঈশ্বরেচ্ছা অনুভব করে কাজে অগ্রসর হতে হয়। তাই শরণাগতির তিনটি দিক—(১) নির্ভরতা বা সমর্পণ, (২) ইচ্ছালয়, (৩) কর্তব্য-অকর্তব্য নিরূপণ। এই তিনটি দিক সম্বন্ধে অবহিত হব জীবনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে পারলে তবেই হয়ে পূর্ণ শরণাগতি।

আচার্য মধুসূদন তিন প্রকার শরণাগতির কথা বলেছেন—(১) মৃদু শরণাগতি—যেমন, ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তের সম্পর্ক যেন, 'আমি তোমার'। (২) মধ্যম শরণাগতি—যেমন ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তের গভীরতর সম্পর্ক যে 'তুমি আমার'। (৩) অধিমাত্র বা উত্তম শরণাগতি—তুমি আমি ঈশ্বর জীব জগত যেখানে সবই এক হয়ে গেছে। তুমি আমি সব অভেদ—পূর্ণ শরণাগতের অবস্থা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব দুই প্রকার শরণাগতির কথা বর্ণনা করেছেন—(১) বানরের ছানার স্বভাব, (২) বেড়ালের ছানার স্বভাব। 'বানরের ছা নিজে যো সো করে মাকে আঁকড়ে ধরে। এদের একটু কর্তৃত্ব বোধ আছে।' এখানে পুরুষকারের প্রকাশ রয়েছে। কিন্তু 'বিল্লির ছা কেবল মিউ মিউ করে। সব নির্ভর—মা যা করে।···আমমোক্তারি দিয়ে নিশ্চিন্ত।' এখানেই পূর্ণ শরণাগতির ভাব।

শরণাগতি বা প্রপত্তি সাধনে অধিকার সকলের, সর্ব স্তরের মানুষের। এখানে জাতি, কুল, লিঙ্গ, গুণ ভেদে সকলেই সাধনা হিসাবে শরণাগতিকে অবলম্বন করতে পারে। দ্বৈতবাদী ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম করেন এবং অদ্বৈতবাদিগণ উপাসনাকালে ও ব্যবহারকালে এই জগত ব্রহ্মের—এই মত স্বীকার করে ব্রহ্মার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম করতে পারেন।

শরণাগতির তিনটি দিক বিবেচনা করে সাধনারও প্রধানত তিনটি পথের বিষয় শরণাগতিতে পাওয়া যায়। প্রথমটি হলো—(ক) সমর্পণ বা নির্ভরতা। এরই সঙ্গে যোগ করা হয়েছে দুটি উপবিভাগ—সমর্পণে প্রার্থনা ও বিবিধ। দ্বিতীয়টি হলো—(খ) ইচ্ছা-লয় এবং তৃতীয়টি হলো—(গ) কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণ।

(ক) সমর্পণ ঃ শাস্ত্রীয় ও মহাজনের উক্তি

১। প্রাচীন ভক্তিশাস্ত্র গ্রন্থে শরণাগতির ছয়টি অঙ্গের কথা বলা হয়েছে—(ক) আনুকূল্যের সংকল্প, (খ) প্রাতিকূল্যের বর্জন, (গ) তিনি রক্ষা করবেন এই বিশ্বাস, (ঘ) তাঁকে গোপ্তৃত্বে বরণ, (ঙ) কার্পণ্য, (চ) আত্মনিক্ষেপ। শরণাগতিতে প্রথম ৫টি অঙ্গের সাধনা দ্বারা আত্মসমর্পণে পৌঁছানো যাবে। আত্মনিক্ষেপই প্রকৃতপক্ষে শরণাগতি।

২। নারদ পঞ্চরাত্র মতে উপরের ষড়বিধ প্রপত্তির সঙ্গে ষড়বিধ বৃত্তিও অবশ্যপালনীয়। এই ছয়টি বৃত্তি হলো—(১) ন্যায় আচরণ, (২) অন্যায় আচরণ ত্যাগ, (৩) দৃষ্টি (জ্ঞান), (৪) ভক্তি, (৫) লিঙ্গধারণ, (৬) সন্ত-সেবা।

৩। আরও তিনটি বৃত্তির কথা বলা হয়েছে, যথা—গুরুপ্রদত্ত মন্ত্র নিত্য জপ, অর্চনা পূজাদি ক্রিয়া এবং বিষ্ণু গায়ত্রী বা অন্য মন্ত্র জপ করে ভগবানে অর্পণ করা।

৪। শরণাগতির সাধককে বর্ণাশ্রমধর্মসমূহ পরিত্যাগ করতে হবে না, বরং যথাযথ পালন করতে হবে। প্রপত্তিতে নির্দোষ ক্রিয়াসমূহের আচরণ থাকে—(পাঞ্চরাত্র সংহিতা)। তবে গীতার মতে ধর্মের জন্যে অনুষ্ঠানমূলক কর্মাদিতে অতিরিক্ত আদর না দিয়ে তাঁর শরণ গ্রহণই শ্রেয়।

৫। শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত নবধা ভক্তির লক্ষণের সর্বশেষ হলো—আত্মনিবেদন। এখানে আত্মনিবেদনকারী ৩টি ভাবযুক্ত হয়—(১) নিজ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য চেষ্টার অভাব, (২) স্বীয় সাধ্য ও সাধন ভগবানে অর্পণ, (৩) তাঁরই উদ্দেশ্যে যাবতীয় চেষ্টা তৎপরতা।

৬। যাগ যজ্ঞ দান তপস্যা ভোজন প্রভৃতি যে কোন কর্ম করা হোক না কেন, তা সবই নিজের কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগপূর্বক অন্তর্যামীর অধীন হয়ে কর্ম করছি—এই ভাব নিয়ে কর্ম করা প্রয়োজন। (গীতা)

৭। অহংকার অভিমান শূন্য হয়ে, সর্বদা তার চিন্তা রেখে তাঁর অধীনে কর্ম করছি—তাহলেই শ্রীভগবানে অর্পিত হয়। (গীতার টীকা—শ্রীমধুসূদন)

৮। কর্তা যিনি ঈশ্বর, তাঁরই জন্য, তাঁর ভৃত্যস্বরূপ এই কাজ করছি—

এরূপ বিবেচনায়, বিবেক বুদ্ধি সহায়ে কাজ করলে কর্মার্পণ হয়। (গীতার ভাষ্য—শংকর)

৯। তুমি প্রভু আমি দাস, তুমি যন্ত্রী আমি যন্ত্র, তুমি কর্তা আমি নিমিত্ত-মাত্র—এই সকল ভাব নিয়ে কর্ম করলে কর্ম ঈশ্বরে সমর্পিত হয়। (মৃদু শরণাগতি)

১০। আমার যা কিছু কর্ম ঈশ্বরের প্রীতির জন্যে করা, শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পূজার্চনা ইত্যাদি ভগবৎ-সেবা বিষয়ক কর্ম তাঁরই কর্ম তাঁরই প্রীত্যর্থে করা—এ ভাবেও ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম হয়। (মধ্যম শরণাগতি)

১১। জ্ঞানমার্গের সাধকগণ 'সবই ব্রহ্ম' এই ভাব নিয়ে ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হন, আত্মার বা ব্রহ্মের শরণ গ্রহণ করেন। 'আমি সর্বাধিষ্ঠানরূপ ব্রহ্ম, এই বোধই আত্মার শরণ গ্রহণ। সব কিছু সমর্পিত হয়ে ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্তি'—একেই বলা হয় ব্রহ্মার্পণ। (অধিমাত্র শরণাগতি)

১২। নারদের মতে (নারদীয় ভক্তিসূত্র)—জীবমাত্রই জ্ঞানে বা অজ্ঞানে ঈশ্বরে আশ্রিত। আশ্রয় যে কী তা জানতে পারলে জীবব্রহ্মৈক্য জ্ঞান লাভ হয়। এজন্যে প্রয়োজন কর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ ও সতত তাঁকে স্মরণ।

১৩। কেহ কেহ ঈশ্বরের ওপর আংশিকভাবে আত্মসমর্পণ করেন অথবা সম্পূর্ণ আস্থা ঈশ্বরে রাখতে পারেন না, অথবা প্রলোভনের তাড়নায় সমর্পণের ভাব নষ্ট হয়—ধর্মজীবনে তাঁরা উন্নতি করতে পারেন না।

১৪। তন্ত্রশাস্ত্রে 'দান-প্রতিগ্রহের' একটি অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে। সাধক সর্বস্ব দেবীকে সমর্পণ করে তাঁর প্রসাদরূপে ঐগুলো প্রতিগ্রহণ করে (ধ্যান দ্বারা) আয়ের অংশ দেবকার্য, পিতৃকার্য, অতিথিসেবা, দান এবং নিজ প্রয়োজনে ব্যয় করবে।

১৫। শ্রীজীব গোস্বামী আত্মার্পণের একটি উদাহরণ দিয়ে বলেছেন—ঈশ্বরকে নিজেকে সমর্পণ করে ভাবতে হবে নিজেকে তাঁর কাছে বিক্রীত গরুর ন্যায়। যে গরু বিক্রয় করেছে সে বিক্রীত গরুর ভরণপোষণের জন্য আর চেষ্টা করে না, ক্রেতার ইচ্ছানুসারেই গরু কাজ করে। এখন থেকে শুধু তাঁরই কর্ম করব, তাঁরই ইচ্ছানুসারে চলব—আমার নিজের জন্য আর

আমাকে কিছু করতে হবে না—এই মানসিকতা তৈরি করতে হবে।

১৬। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন—এ সংসার কর্মক্ষেত্র, এক হাতে ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধরে থাকবে, আর এক হাতে কাজ করবে। যখন কাজ থেকে অবসর হবে, তখন দুহাতেই ধরে থাকবে। তাঁর পাদপদ্মে সব অর্পণ কর, তাঁকে আম্মোক্তারী দাও। তিনি যা হয় করুন।

১৭। শ্রীরামকৃষ্ণদেব আরো বলেছেন—তাঁর উপর নির্ভর করে হাত পা ছেড়ে দিয়ে যেন তালগাছের ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া এই ভেবে যে তিনি রক্ষা করবেনই করবেন।

আর সংসারে থাকো ঝড়ের এঁটো পাতা হয়ে। ঝড়ের এঁটো পাতাকে কখনও ঘরের ভিতর লয়ে যায়, কখনও আঁস্তাকুড়ে। হাওয়া যেদিকে যায়, পাতাও সেদিকে যায়। কখনও ভালো জায়গায়, কখনও মন্দ জায়গায়।

১৮। বকলমা দেওয়া সম্বন্ধে শ্রীগিরিশ ঘোষ বলেছেন, সাধন-ভজন-জপ-তপরূপ কাজের একটা সময়ে অন্ত আছে। কিন্তু যে বকলমা দিয়েছে তার কাজের আর অন্ত নেই—তাকে প্রতি পদে, প্রতি নিঃশ্বাসে দেখতে হয় তাঁর (ভগবানের) উপর ভার রেখে তাঁর জোরে পা-টি, নিঃশ্বাসটি ফেললে, না এই হতচ্ছাড়া 'আমি'টার জোরে সেটি করলে।

বকলমা দেবার ফল সম্বন্ধে শ্রীগিরিশ ঘোষ নিজেই নিজের সম্বন্ধে বলেছেন, আগে আলস্য ছিল, এখন সে আলস্য ঈশ্বরে নির্ভর হয়ে দাঁড়িয়েছে! পাপ ছিল, তাই নিরহংকার হয়েছি!

১৯। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, যার ঠিক ঠিক নির্ভর হয়েছে, তার ভালোমন্দ - ভেদবুদ্ধি থাকে না—ঐ অবস্থার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের (শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যদের) ভেতর ইদানীং নাগ মহাশয়।

২০। 'ঈশ্বর সান্নিধ্যজ্ঞান আসিলে নির্ভর আসে। আমার কথা একজন অলক্ষিতভাবে নিকটে থাকিয়া শুনিতেছেন এবং নিশ্চয় তিনি আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবেন, এই জ্ঞান হওয়াকে নির্ভর বলে।'

২১। খ্রীস্টধর্মের সাধক ব্রাদার লরেন্স ঈশ্বরের নিয়ত-সান্নিধ্যবোধের অনুশীলন করেছিলেন। তিনি বলেছেন, পরিপূর্ণ শরণাগতিই ঈশ্বরের

রাজ্যে যাওয়ার সুনিশ্চিত পন্থা।···সর্বস্ব অর্পণ করেই সর্বস্ব লাভ করব। এই ভেবে তাঁরই প্রীত্যর্থে ঈশ্বর বর্জিত সব কিছু বিসর্জন দিয়ে দিলাম। পৃথিবীতে তিনি ও আমি ভিন্ন অন্য কেউই নেই, এইভাবে জীবনযাপন করতে আরম্ভ করলাম।

২২। স্বামী তুরীয়ানন্দ বলেছেন, অনন্ত আকাশে উড়ে কোথাও কোন বিশ্রামের স্থান নাই নিশ্চয় না হলে অনন্যশরণ হওয়া যায় না। তাই ধ্যান-ভজন, জপ-তপ যথাশক্তি করতে হয়। তাহলে পরে ঠিক ঠিক মাস্তুলেই আশ্রয় হয়।

২৩। নিজের সাধন সম্বন্ধে স্বামী তুরীয়ানন্দ বলেছেন, আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী'—এই ভাবটি কিছুদিন সাধন করেছিলাম। প্রত্যেক কার্য, প্রত্যেক চিন্তায় জাগ্রত থাকতাম, আর লক্ষ্য রাখতাম ঠিক ঠিক উক্ত ভাবটি মনে আরূঢ় আছে কি না।

২৪। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তাঁর উপাসনা তাঁকে লাভ করবার উপাসনা নয়—আপনাকে দান করবার উপাসনা। দিনে দিনে ভক্তি দ্বারা, ক্ষমা দ্বারা, সন্তোষের দ্বারা, সেবার দ্বারা তাঁর মধ্যে নিজেকে মঙ্গলে ও প্রেমে বাধাহীনরূপে ব্যক্ত করে দেওয়াই তাঁর উপাসনা।

আমি আছি তাঁরই মধ্যে, আমি করছি তাঁরই শক্তিতে এবং আমি ভোগ করছি তাঁরই দানে, এই জ্ঞানটিকে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মতো সহজ করে তুলতে হবে—এই আমাদের সাধনার লক্ষ্য।

২৫। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, সমর্পণ ও আত্মনিবেদন যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, সাধকও তত সজ্ঞান হয়ে ওঠে, অনুভব করে যে ভাগবতী শক্তিই সাধনা করে চলেছেন, তার মধ্যে ক্রমেই আপনাকে সমধিক ঢেলে দিচ্ছেন, তার মধ্যে দিব্য প্রকৃতির মুক্তি ও পূর্ণতা স্থাপন করে চলেছেন।

তোমার শ্রদ্ধা, তোমার আন্তরিকতা, তোমার সমর্পণ যত পূর্ণতর হয়ে উঠবে, মায়ের করুণা ও অভয় ততই তোমাকে ঘিরে রাখবে।

২৬। লাটু মহারাজ একটি উদাহরণ দিয়ে বলেছেন—এক ভাঁড় জল আলাদা করে রেখে দিলে তা শুকিয়ে যায়, কিন্তু সেই ভাঁড়কে গঙ্গার

জলে ডুবিয়ে রাখলে সে জল আর শুকোয় না। এই জগতে আমাদের মনকে যদি ভগবানের পায়ে সঁপে দিতে পারি, তাহলে বিষয় বাতাসে আমাদের মন শুকোবে না, নিরানন্দ হবে না।

২৭। তীর্থস্বামী বলেছেন, ঈশ্বরাদেশ রূপ শাস্ত্র বিধান অনুসারে ভৃত্যবৎ স্ববর্ণাশ্রমোচিত ধর্মীয় নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠান দ্বারা ঈশ্বরার্চনা—ইহাই ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কর্মানুষ্ঠান।

২৮। স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্য বলেছেন, ঈশ্বরের দ্বারা প্রেরিত হয়ে যেন আমার সমস্ত কর্ম নির্বাহ হচ্ছে—এরূপ ভাবনা করা কর্মযোগীদের ঈশ্বর প্রণিধান।

২৯। বৌদ্ধ মতে চার ভাবে শরণাগতি সম্ভব হয়—আত্মদানের ভাবে, তৎপরায়ণ ভাবে, শিষ্য গ্রহণের ভাবে, প্রণিপাতের ভাবে। 'আমি নিজে উৎসর্গীকৃত, আমার জীবন উৎসর্গীকৃত, আমি আমরণ শরণাগত। বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ এই ত্রিরত্নই আমার পক্ষে শরণ, ত্রাণ, নয়ন, আমার পরা গতি, পরাকাষ্ঠা।'

৩০। মহর্ষি রমণ বলেন, সমর্পণ করার দুটি পথ। একটি 'আমি'র উৎস খোঁজা আর সেই উৎসে লয় হয়ে যাওয়া। অন্যটি আমি একান্ত অক্ষম। ঈশ্বরই সর্বশক্তিমান, একমাত্র তাঁর কাছে সম্পূর্ণ সমর্পণ করা ছাড়া আমার রক্ষার আর কোনো উপায় নেই—এই অনুভব করা।

(ক) সমর্পণ : প্রার্থনা ও বিবিধ

শরণাগতিতে প্রার্থনা একটি মূল্যবান সাধন। আর্ত ভক্ত ঠিক ঠিক শরণাগত হতে পারে এবং প্রার্থনাই তার একমাত্র সম্বল। শরণাগত তার স্বাভাবিক কাজকর্মের মধ্যে সর্বদা প্রার্থনার ভাব নিয়েই থাকবে। প্রার্থনা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বাণী পাওয়া যায়—

১। লক্ষ্মীতন্ত্রে (পাঞ্চরাত্র সংহিতা) বলা হয়েছে, প্রতিদিন শেষরাত্রে উঠে শুদ্ধ পবিত্র হয়ে ভগবানের নিকট শরণাগতির জন্য প্রার্থনা করবে।

২। 'আর্তি' শরণাগতি লাভের একটি উপায়। গীতায় আর্ত ভক্তের কথা

বলা হয়েছে। আর্ত ভক্ত ভগবানের নিকট প্রার্থনা দ্বারা ভজনা করে।

৩। শ্রীশ্রীচণ্ডীর 'দেবীমাহাত্ম্যে' বলা হয়েছে, বাহ্যিক সংকট ও আন্তর সংকটের মধ্যে আর্তি নিয়ে যে মাকে স্মরণ করে, মা তার সকল সংকট মোচন করে দেন—এ মায়ের প্রতিশ্রুতি।

৪। ঈশানুশরণে প্রার্থনা করা হয়েছে—হে প্রভু, আমার যা কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা সবই তোমার কাছে আছে। তোমার কৃপালাভের আশায় আমি তোমার শরণাগত।

৫। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, জীবের কর্তব্য তাঁর শরণাগত হওয়া এবং তাঁকে যাতে লাভ হয় তার জন্য ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করা। তাঁর শরণাগত হয়ে প্রার্থনা করা যাতে অনুকূল হাওয়া বয়, শুভ যোগ ঘটে। ঈশ্বরের শরণাগত হয়ে তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তিনি শুনবেনই শুনবেন—সব সুযোগ করে দেবেন।

৬। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, ঈশ্বর দয়ার সিন্ধু। তাঁর শরণাগত হয়ে থাক, তিনি কৃপা করবেন। তাঁকে প্রার্থনা কর—যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।

৭। স্বামী শিবানন্দ বলেছেন, তোমাদের তো সাধন ভজন করবার সময় নেই। তোমরা তাঁর শরণাগত হয়ে পড়ে থাক আর কাঁদ। কেবল কাঁদ আর প্রার্থনা কর—প্রভু দয়া কর, দয়া কর।

৮। স্বামী তুরীয়ানন্দ বলেছেন, প্রভুর শরণই সার। তাঁর চরণে একান্ত ভক্তি, তাঁর ভক্তে প্রীতি, তাঁর নামে রুচি—এই আসল প্রার্থনা।

৯। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়। প্রার্থনা করতে হয় এই বলে, মা আমায় অবসর দাও, সুযোগ সুবিধা দাও ভাল কাজ করার জন্যে।

১০। লাটু মহারাজ বলেছেন, ভগবানের কাছে নিজের মনের পাতায় লিখে দরখাস্ত জানাতে হয়—আমি আপনার শরণ নিলুম, আমায় আপনার কাজে লাগিয়ে নিন, সব সংশয় নাশ করুন। প্রভু, আমি তো আপনাকে দেখি নি, শুধু আপনার নাম শুনেছি। আমায় দয়া করে

আপনার করে নিন। এই ভাবে রোজ বলতে বলতে তবে একদিন তাঁর নজরে পড়বে। তখন তিনিই তোমায় চালাবেন, কোন্ কাজ করতে হবে না হবে সব বলে দেবেন।

১১। ব্রাদার লরেন্স বলেন, ভগবানের সঙ্গে নিরন্তর যুক্ত থাকা এবং তাঁর চরণে আমাদের যাবতীয় কাজকর্ম নিবেদন করার অভ্যাসের জন্য প্রথম অবস্থাতে একটু প্রযত্ন সহকারে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়।

১২। কোন কাজ করার পরে ফল অন্যরকম দেখে কেউ কেউ বলে থাকেন যে এইভাবে কাজ করাটা 'ভুল হয়েছে'। কিন্তু কর্মবাদের দিক থেকে চিন্তা করলে বলা যায় যে পরিবেশের প্রভাব, দৈবের প্রভাব ও নানা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে যে কর্মফল উৎপাদিত হয় তা ঈশ্বরেচ্ছায়ই হয়ে থাকে। তাই 'ভুল করেছি' বলে শরণাগতের কখনও দুঃখ আপসোস বা নৈরাশ্য থাকতে পারে না।

১৩। শরণাগতিতে সবই হবে গ্রহণ। ভালো মন্দ সবই ভগবানের দান— তাই ভালো ও মন্দকে সমানভাবে গ্রহণ করতে হবে। তিনিই উপযুক্ত মনে করলে মন্দকেও পরিবর্তন করে দিতে পারবেন।

১৪। অনির্বাণ বলেছেন, যা চেয়েছি তা হ'ল না বলে কি দুঃখ করব? হয় নি যে তাতেই তাঁর ইচ্ছার জয় হয়েছে। অথবা যা-ই চেয়েছি, তা-ই পেয়েছি—সে-ও তাঁরই ইচ্ছার জয়।

১৫। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, যারা জানে যে ঈশ্বরই একমাত্র সৎ বস্তু, তার দেখে ঈশ্বরই সব করছেন। ঈশ্বরই কর্তা আর সব অকর্তা।

১৬। অনির্বাণ বলেছেন, সমর্পণের সাধনার একটি কথা—কাকে সমর্পণ করছি, সেটি স্মরণে থাকা চাই। প্রতি পলে পলে স্মরণ, প্রতি শ্বাসে শ্বাসে জপ।

১৭। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, পুরুষকার ব্যতীত কৃপা সম্যক উপলব্ধি হয় না। চেষ্টা করছে দেখলে কৃপা হয়, তাই চেষ্টা করতে হয়। তাই কৃপা বুঝবার জন্যও পুরুষকার প্রয়োজন। পুরুষকারও তাঁর দান। কৃপার বাতাস তো বইছেই কিন্তু পাল তুলে দিতে হবে।

১৮। স্কন্দপুরাণে বলা হয়েছে, দৈবের শান্তির জন্য বা দৈবের পরাজয়ের জন্য তীব্র পুরুষকার অবলম্বন পূর্বক সর্বকারণ কারণ ঈশ্বরের শরণাগতিই মনুষ্যের পক্ষে সর্বতোভাবে সমীচীন।

১৯। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, সদুদ্দেশ্যে কর্ম অবশ্যই করতে হবে এবং অনুষ্ঠেয় কর্ম সুসম্পাদনের জন্যে যথোচিত পৌরুষ যথাশক্তি সততই করতে হবে। এরূপ কর্মের কর্তা সিদ্ধিতে হর্ষিত এবং অসিদ্ধিতে ব্যথিত হয় না অথবা কর্মের বিপর্যয়ে বিষাদ বা গ্লানিগ্রস্ত হয় না।

২০। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, যতটা পারিস তাঁতে মন লাগিয়ে থাক। তাহলেই এই জগত-ভেলকি আপনা আপনি ভেঙে যাবে। তবে লেগে থাকতে হবে। এইরূপে লেগে থাকার নামই পুরুষকার। এইরূপে পুরুষকার সহায়ে তাঁতে নির্ভর আসবে—সেটাই হ'ল পরম পুরুষার্থ।

২১। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, শরণাগতি মানে এই নয় যে কুঁড়েমি করে বসে থাকব আর ভগবানকে বলব, হে ভগবান, তুমি আমায় কৃপা করো। এটা তো মহা দুর্বলতা, স্বার্থপরতার চিহ্ন। আমরা সাধারণত যে কৃপা পাবার আশা করি, সে আশার ভেতর উদ্যম থাকে না, থাকে কেবল নিশ্চেষ্টতা ও চালাকী করে বাজীমাৎ করবার মতলব। এতে কিছু হয় না।

২২। ভক্তিধর্মে গুরুর ওপর শরণাগত হয়ে সাধনার কথা বলা হয়ে থাকে। গুরু-সেবা, গুরুর আদেশ নির্দেশ যথাযথ পালন করা, গুরুকে আশ্রয় করে কর্মজীবন পরিচালনা করা—বৈষ্ণব সাধনার একটি বিশেষ দিক। গুরুতে ঠিক ঠিক শরণাগত হতে পারলে ঈশ্বরে শরণাগত হওয়া সম্ভব।

২৩। আচার্য নিম্বার্ক বলেছেন, গুরুতে আত্মসমর্পণ করে তাঁর মাধ্যমেই ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করতে হয়। হবি-রূপ শিষ্য প্রথমে অর্পণ-রূপ (হাতা) গুরুতে নিজেকে সমর্পণ করলে তবে অর্পণ-গুরু অগ্নি-রূপ ব্রহ্মে শিষ্যকে সমর্পণ করতে পারেন।

(খ) ইচ্ছা-লয়

১। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, সংসার করা, সন্ন্যাস করা সবই রামের ইচ্ছা। তাই তাঁর উপর সব ফেলে দিয়ে সংসারে কাজ করো।

২। কোন্‌টা নিজের ইচ্ছা, কোন্‌টা ঈশ্বরেচ্ছা—বোঝবার উপায় কি?

জনৈক বৈষ্ণবভক্ত—যে কাজ করতে গিয়ে নানা বাধা-বিঘ্ন আসে, নানা সমস্যার উদ্ভব হয়, সে কাজ মানুষের ইচ্ছায় হচ্ছে বুঝতে হবে। যে কাজে বাধা-বিঘ্ন কম, সহজভাবে কাজটি সুসম্পন্ন হয়—সে কাজের পেছনে ঈশ্বরেচ্ছা রয়েছে।

জনৈক সন্ন্যাসী—যে কাজ করতে অনেক বাধা-বিপত্তি আসে বুঝতে হবে ভগবানের ইচ্ছা তাতে নেই। Initiative নিয়ে কোন কাজ না করাই উচিত। যা সামনে আসবে তাই করা হবে।

৩। সন্ন্যাসী বা শরণাগত ভক্ত, কারও পক্ষে সংকল্প করে কোনো কাজ করা উচিত নয়। গীতায় বলা হয়েছে, সর্বসংকল্প ত্যাগী হলেই সে যোগী হতে পারে। যোগী অর্থে জ্ঞানযোগী, কর্মযোগী উভয়কে বুঝায়।

৪। ভগবান যীশু বলেছেন, আমি আমার নিজ সংকল্পের খোঁজ করি না, যিনি আমায় পাঠিয়েছেন তাঁর সংকল্পই চাই। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, আমি মতলব করে কোনো কাজ করি নি। পরিকল্পনাকারীদের দ্বারা কখনও ধর্মপ্রচার হয় নি। স্বামী তুরীয়ানন্দ বলেছেন, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান—সব তাঁতে সমর্পণ কর। নিজে কিছু কল্পনা করো না। দেখবে, তিনিই তোমার জন্য সকল ব্যবস্থা করে দেবেন।

৫। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, আমার অগ্রসর হবার সাথে সাথে বিস্তৃত কর্মপন্থা এসে পড়বে। আমি কোনো পরিকল্পনা করি না। কর্মপ্রণালী আপনি গড়ে ওঠে ও কার্যসাধন করে। আমি শুধু বলি, জাগো, জাগো।

৬। স্বামী সারদানন্দ বলতেন, মেলা কিছু কাজ জুটাবে না, যা সামনে আসছে তাই করবে। আপনা থেকে যে কাজ আসে তাই করবে।

৭। পঞ্চদশীতে বলা হয়েছে—যখন অহংকার ও চিদাত্মাকে মিশাইয়া ফেলা হয়, তখনই ইচ্ছার উদয় হয়। বিবেক দ্বারা উভয়কে পৃথক করে

ফেললে আর ইচ্ছার উদয় হতে পারে না। জ্ঞানীর ব্যবহারে যে ইচ্ছা অনিচ্ছা দৃষ্ট হয়, তা বাহ্য লোকদৃষ্টির কথা, জ্ঞানীর নিজ দৃষ্টির কথা নয়।

৮। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, ভাগবত চেতনায় তোমাকে পূর্ণতর হয়ে উঠতে হবে যেন শেষে তোমার ইচ্ছায় ও তাঁর ইচ্ছায় কোনো পার্থক্য আর না থাকে। তাঁর প্রেরণা ব্যতীত আর কোনো সংকল্পই তোমার মধ্যে স্থান না পায়, তাঁরই সজ্ঞান কর্ম ছাড়া তোমার মধ্যে এবং তোমাকে আশ্রয় করে আর কোনো কর্মই যেন না হয়।

যে পর্যন্ত তুমি এই সম্পূর্ণ সক্রিয় একত্ব স্থাপন করতে না পেরেছ ততদিন মনে করবে তোমার দেহ ও আত্মা নিয়ে তুমি সৃষ্ট মায়েরই সেবার জন্যে, তোমার সব কর্ম তাঁরই প্রীত্যর্থে। পৃথক কর্তৃত্ববোধ যদি তোমার মধ্যে প্রবল থাকে, যদি তোমার অনুভব হয় তুমিই কর্ম করে চলেছ, তবুও সে কর্ম করবে তাঁরই উদ্দেশে।

৯। কোনো ইচ্ছা জাগলে মনে মনে তা ঈশ্বরকে নিবেদন করে প্রার্থনা করা হলো – পরে কোনো ইঙ্গিত বা প্রেরণা আসে কিনা দেখা যেতে পারে। যদি কাজের অনুকূল যোগাযোগ হয় বা ইঙ্গিত পাওয়া যায়, কাজে ব্রতী হয়ে আরো যোগাযোগ আরও ইঙ্গিতের প্রতীক্ষা করা যেতে পারে। যদি তা আসে, কাজে আনন্দ আসে, বাধা বিঘ্ন না আসে, তাঁর ইচ্ছায় কাজ হচ্ছে মনে করে আরো নির্ভরতা, আরো প্রার্থনা চলবে। এইভাবে নিজের ইচ্ছা বা সংকল্পকে তাঁর ইচ্ছায় রূপান্তরিত করা যেতে পারে। যদি তীব্র বাধা-বিপত্তি আসে তবে সে কাজে অগ্রসর না হওয়াই ভালো।

(গ) কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণ

সাধারণ কয়েকটি নিয়ম বা প্রণালীতে বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে থাকে, যথা—(১) আদর্শ নিরূপণ, (২) নিয়ম-নীতি নির্ধারণ, (৩) অভিজ্ঞতা ও সংস্কার, (৪) যৌগিক পন্থা, (৫) ঐশ্বরিক বা দৈব প্রেরণা, (৬) বিচার বিবেচনা।

এদের মধ্যে প্রথম ৫টির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ যেভাবে হয়ে থাকে তার

মধ্যে নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা বা বিচারবুদ্ধির প্রতিফলন বিশেষ নেই—তাই ঈশ্বরের শরণাগত হয়ে, তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রশ্ন তেমন আসে না। কিন্তু ষষ্ঠটির ক্ষেত্রে অর্থাৎ যেখানে নিজের বিচার বিবেচনা প্রয়োগ করে ইচ্ছা আগ্রহ দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে শরণাগত হয়ে সে কাজটি করা হচ্ছে কিনা তা-ই প্রধান কথা। তাই বিচার বিবেচনা দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি সম্বন্ধে নিম্নরূপ প্রণালী সমূহের কথা বলা হয়—

১। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, যদি বলো সব নারায়ণ তবে চুপ করে থাকলেই হয়, তা আমি মানুষ নারায়ণও মানি। শুদ্ধ মন ও শুদ্ধ আত্মা একই। শুদ্ধ মনে যা উঠবে সে তাঁরই কথা। তিনিই মানুষ নারায়ণ। তাঁর কথা শুনব না কেন? তিনি কর্তা। 'আমি' যতক্ষণ রেখেছেন, তাঁর আদেশ শুনে কাজ করব।

২। কোন্‌টা করা উচিত বা করা উচিত নয়, এই বিভ্রান্তির মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব কথিত 'হাতি-নারায়ণ, মানুষ-নারায়ণ' গল্পের মধ্যে মানুষ-রূপী ঈশ্বরের কথাতেই পথের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কেউ যেন এসে বলে দিচ্ছে, এই কর এই কর।

৩। শ্রীচৈতন্যদেব বনপথে বৃন্দাবন অভিমুখে চলার সময়ে একমাত্র সঙ্গী বলভদ্রকে বলেছিলেন যে, পূর্বে একবার বৃন্দাবন রওনা হবার কালে সনাতন লোকজনসহ যেতে নিষেধ করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব তখন অনুভব করেছিলেন যেন প্রভুই সনাতনের মুখে এ বার্তা পাঠিয়েছেন। তাই সেবার তাঁর বৃন্দাবন যাওয়া হয় নি।

৪। শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজেই বলেছেন যে, কোন একটা কাজ করতে হবে, বলে ফেলেছেন। অথচ সে কাজ করার আর প্রয়োজন নেই। তখন নিকটে উপস্থিত মানুষ-নারায়ণ বুদ্ধিতে অপরের মতামত নিয়ে সে কাজটি করা বা না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন।

৫। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, একীভূত সংঘ যে আদেশ করেন তাই প্রভুর আদেশ।

৬। কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হলে শান্ত হয়ে একটু ভেবেচিন্তে, ধ্যান করে পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া ভালো। তাৎক্ষণিক কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হলে ভগবানের নাম করে একটু বিবেচনা করে তা নেওয়া ভালো। অন্য যারা কাছে আছে তাদের সঙ্গেও পরামর্শ করা যেতে পারে।

৭। অধিকাংশের মত অনুযায়ী বা গণতান্ত্রিক পন্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ শরণাগতের পক্ষে উপযুক্ত পথ।

৮। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যৌগিক পন্থা বা দৈবপ্রেরণাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

উপসংহার

সকল পথের সাধকের—জ্ঞানযোগী, ভক্তিযোগী বা কর্মযোগী, সাধনার বিশেষ লক্ষ্য হলো কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ বা অহংকার নাশ। শরণাগতির সাধনের দ্বারা তা সহজে সম্ভব হয়। ঈশ্বরের অর্থাৎ সমষ্টি তত্ত্ব-সংস্কারের শরণ-গ্রহণ করলে তাঁর মায়া থেকে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, অর্থাৎ অজ্ঞানকে নাশ করা যায়। ঈশ্বরই প্রকৃত কর্তা এবং জীব তাঁর করণ বা যন্ত্র মাত্র—এরূপ স্থির বুদ্ধি হলে মানুষের দ্বারা কৃত কর্ম ঈশ্বরের কর্ম হয়। এইভাবে ঈশ্বরে কর্মার্পণ হলে তার কর্মফল আর মানুষে আসে না। ঈশ্বর সর্বত্র আছেন, সর্বভূতে আছেন—এই জেনে সকলকে বা সমষ্টিকে ভালবাসতে পারলে এই প্রগাঢ় প্রেমের ফলস্বরূপ আসে পূর্ণ আত্মনিবেদন। এইভাবে আসে ঈশ্বরের ইচ্ছার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা—নিজের ইচ্ছাকে ঈশ্বরের ইচ্ছায় রূপান্তরিত করা।

সব দিক বিচার করলে অর্থাৎ তাত্ত্বিক ও দার্শনিক বিচারে এই সিদ্ধান্ত আসে যে শরণাগতিকে অবলম্বন করে জ্ঞানের পথ, কর্মের পথ বা ভক্তির পথে যে কোনো মানুষ চরম ও পরম উপলব্ধি লাভ করতে পারে। ভৃত্যবৎ বা যন্ত্রবৎ কর্মদ্বারাও কোনো আনুষ্ঠানিক সাধনপথ ছাড়াই ঈশ্বর তত্ত্বে পৌঁছানো সম্ভব। তাই শরণাগতি সকল মানুষের, সকল মতের ও পথের সাধকের পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক পথ।